দেশ বিদেশের

ভুতুড়ে বাড়ি

শুভদেব চক্রবর্তী

দেশ বিদেশের

ভুতুড়ে বাড়ি

শুভদেব চক্রবর্তী

সান্যাল প্রকাশন ।। কলিকাতা-৯

প্রকাশক : গৌরাঙ্গ সান্যাল। সান্যাল প্রকাশন
১৬ নবীন কুণ্ডু লেন। কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৯৬৩।

মুদ্রক : জয়গুরু প্রিন্টার্স
৪এ, বৃন্দাবন বোস লেন। কলিকাতা-৬

ভাস্কর রাহা ও অশোক রায়
বন্ধুবরেষু

❑ প্রসঙ্গ ঃ ভূত ❑

পৃথিবীর সবদেশেই অপ্রাকৃতিক ও অতিলৌকিকে যারা ঘোর বিশ্বাসী তাদের অনেককে বলতে শোনা যায় বিশাল ব্যক্তিত্বের কোনও মানুষ মারা যাবার আগে প্রকৃতির প্রচণ্ড আলোড়ন শুরু হয়। এই ধারণার সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন দু'টি ঘটনা এই প্রসঙ্গে তুলে ধরছি। প্রথম ঘটনার নায়ক ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব অলিভার ক্রমওয়েল ১৬৫৮ সালে ইংল্যাণ্ডের হ্যাম্পটন কোর্ট প্রাসাদে তিনি মারা যান। শোনা যায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে প্রাসাদের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল এক অভাবিত ঝড়। অভাবিত, কারণ আকাশ সেদিন ছিল পরিষ্কার, মেঘমুক্ত। ঝড়ের কোনও লক্ষণ সেদিন কারও চোখে পড়েনি।

দ্বিতীয় ঘটনা ঃ সম্রাট ২য় জর্জের মৃত্যু। তারিখটা ছিল ১৭৬০ সালের ২৫ অক্টোবর। ভীষণ বদমেজাজী ঐ মানুষটির স্বাস্থ্য আগেই গিয়েছিল ভেঙ্গে, জীবনের শেষ দিনগুলো তাঁর কেটেছিল ইংল্যাণ্ডের কেনসিংটন প্রাসাদে। প্রাসাদের যে ঘরে তিনি থাকতেন তার সব দরজা জানালা দিন-রাত তাঁরই হুকুমে বন্ধ রাখা হত। ব্রিটিশ রাজবংশের ব্যক্তিগত রেকর্ডে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সম্রাট ২য় জর্জের মৃত্যুর আগে প্রকৃতি রুদ্র-রূপ ধারণ করেছিল। সে রাতে প্রচণ্ড বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইছিল তাই সমুদ্রে ভাসমান অনেক জাহাজ ইংল্যাণ্ডের উপকূলে পৌঁছোতে পারেনি। ঐসব জাহাজের মধ্যে একটি হ্যালোভার থেকে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি খবব ও দলিলপত্র নিয়ে আসছিল। সেই জাহাজের অপেক্ষায় সম্রাট সে বাতে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে বসেছিলেন। তাঁর হুকুমে ঘরের সব জানালা সে-রাতে খুলে দেওয়া হয়েছিল। বিছানায় বসে সম্রাট খোলা জানালা দিয়ে বাইবে বায়ুমান যন্ত্র আর বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিলেন। ঝড় থেকে বাতাসেব গতি স্বাভাবিক হবার আগেই সম্রাট ২য় জর্জ সে রাতে মাবা যান , কেনসিংটন প্রাসাদের বক্ষিদের মুখে শোনা যায ঝড় বৃষ্টির রাতে প্রাসাদে সম্রাট দ্বিতীয় জর্জের বিদেশী আত্মাব আবির্ভাব ঘটে—

বক্ষীদের অনেকেই দেখেছে যারা যাবার সময় প্রাসাদের যে ঘরে তিনি ছিলেন সেই ঘরের সব জানালা খোলা। সমুদ্রের দিকে মুখ কবে জানালার ওপাশে বসে এক বয়স্ক পুরুষ। তাঁর পরণে প্রাচীন আমলেব সম্রাটের পোষাক। অধীর আগ্রহে তিনি তাকিয়ে আছেন সমুদ্রের দিকে ; সে মুখ যে কোনও জীবন্ত মানুষের নয় তা একবার তাকালে বুঝতে বাকি থাকেনা। রক্ষিরা বলে, থেকে থেকে সেই মুখ জার্মান ঘেঁষা দুর্বোধ্য ইংরেজিতে বলে ওঠে। 'আমার জাহাজ এখনও এলনা ? কেন, আসবে না কেন ?'

পুরোনো বাড়ি হোক চাই পরিত্যক্ত প্রাসাদ হোক অপরাধীদের সঙ্গে তার নিবিড় অচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকতেই হবে। সত্যিই, পুরোনো বাড়ি বা প্রাসাদের আনাচে কানাচে ভৌতিক কুয়াশার জমাট বাঁধবার ধারা যে নিছক মনস্তাত্বিক কারণেই আবহমান কাল থেকে শিকড় গেড়ে বসেছে মানুষের মনে তাতে এতটুকু সন্দেহের অবকাশ নেই। ভূত আছে কি নেই এই সনাতন বিতর্কে না গিয়ে শুধু সবিণয়ে বলব ভূত মানে যদি অতীত হয় তাহলে সেই অতীতের অস্তিত্বকে তো অস্বীকার করা চলে না কোনমতেই, পুরোনো প্রাসাদের আনাচে-কানাচে মজুত অপ্রাকৃতিক ধোঁয়াসার যে ব্যাখ্যা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ক্ষুধিত পাষান' গল্পে শুনিয়েছেন প্রাসঙ্গিক কারণেই

তা এখানে তুলে ধরলাম কাহিনীর নায়ক কর্মসূত্রে আশ্রয় নিয়েছেন এক পরিত্যক্ত প্রাসাদে যেখানে অতৃপ্ত অশরীরীদের উপস্থিতি যখন তখন তিনি অনুভব করেন। বিদেশীরা দেখা না দিলেও তাদের হাসি, গানের কলি, ঘাটে স্নান করতে নেমে খেলার ছলে জল ছোঁড়াছুড়ি। এসব তাঁর কানে ধরা পরে, কখনও বা প্রাসাদে আয়নায় দেখতে পান সুন্দরী ইরানী যুবতীর মুখ। তাঁর দপ্তরের বৃদ্ধ কর্মচারী করিম খাঁ এসবই জানেন, তাঁর মতে, "এক সময় ঐ প্রাসাদে অনেক অতৃপ্ত বাসনা, অনেক উত্তপ্ত সম্ভোগের শিলা আলোড়িত হইত—সেই-সকল চিত্ত দাহে, সেই-সকল নিষ্ফল বাসনার অভিশাপে এই প্রাসাদের প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড ক্ষুধার্ত ও তৃষিত হইয়া আছে। সজীব মানুষ পাইলে তাহাকে লালায়িত পিশাচীর মতো খাইয়া ফেলিতে চায়....."

'ক্ষুধিত পাষাণ'-গল্পের মূলে যে ভিত্তিই থাক তা জানার দরকার নেই। কিন্তু সেই একই অপ্রাকৃতিক অনুশাসনে ইংল্যাণ্ডের এক ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাসাদ দুর্গের প্রত্যেক ইটপাথরে রাজা রানী আর রাজপরিবারের সদস্যদের উচ্চাশা পূরণের ব্যর্থতা, ব্যর্থপ্রেম, দ্বন্দ্ব, আর বিশ্বাস ভঙ্গের হাহাকার যখন প্রতিধ্বনিত হয়, যখন ভ্রমণপিপাসু দর্শকের কৌতূহলী চোখের সামনে ইতিহাসের মৃত কুশীলবের দল বিদেশী সত্ত্বা নিয়ে জীবন্ত মানুষের মত ঘুরে বেড়ায় শুধু তখনই যেন করিম খাঁর আঘাত যুক্তিগ্রাহ্য অপ্রাকৃতিকের ব্যাখ্যার সামনে নিষ্প্রাণ নাস্তিকতা ঝড়ের মুখে কুটোর মত উড়ে যায়। ব্রিটেনের রাজপরিবারের অনেক নারী পুরুষের হাহাকার মথিত সেই বিখ্যাত প্রাসাদ দুর্গ টাওয়ার অফ লণ্ডন-এর নামের সঙ্গে আমরা কম বেশি অনেকেই পরিচিত।

পৃথিবীর আনাচে-কানাচে সর্বধর্মের মধ্যে অল্প বিস্তর ভূতের অস্তিত্ব আছে। ভূতের ভয় যেমন আছে, আছে সেই সব বাড়ি যেখানে ভূতেরা আড্ডা বসায়। সেইসব ভুতুড়ে বাড়ি নিয়েই এই 'বইয়ের' উপস্থিতি। পড়ার আগে বেছে নিন শীতের সন্ধ্যা বা রাত্রি।

গাছের পাতায় শিরশিরানি
হিমেল হাওয়া বইছে ইতিউতি।
ভয়াল রাত আসছে ধীরে
মনের মাঝে ভয় জাগাবে ভূতে।

এবার জানলা দরজা বন্ধ করে আলো আঁধারিতে পড়া শুরু করুন।

সবিশেষে বলি এই বইয়ের পিছনে যারা আমাকে সাহায্য করেছেন সেই প্রকাশক বন্ধু অশোক রায় ও বন্ধুবর ভাস্কর রাহাকে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারছি না।

দ্য টাওয়ার অফ লণ্ডন

'হন্টেড' শব্দের আক্ষরিক তর্জমা প্রেততাড়িত, অর্থাৎ ভূতপ্রেতের দল যেখানে উৎপাত চালায়। 'ভুতুড়ে' শব্দটি সেদিক থেকে আমার মতে লাগসই হবে।

ইংল্যাণ্ডে ভুতুড়ে প্রাসাদের ছড়াছড়ি, তাদের মধ্যে এই টাওয়ার অফ লণ্ডনকেই নানা দিক বিচার করে সেরা বলা যায়। লণ্ডন শহরকে বিদেশী শত্রুর আক্রমণের হাত থেকে সুরক্ষিত করতে নরম্যান সম্রাট উইলিয়াম দ্য কংকারার ঐ প্রাসাদ দুর্গ গড়ার কাজে হাত দেন। পরে সেখানে রাজপ্রাসাদ, টাঁকশাল, কারাগার আর বধ্যভূমি স্থাপিত হয়।

খ্যাতি অখ্যাতির অনেক নায়ক-নায়িকা রাজরোষের শিকার হয়ে আমরা বন্দিজীবন কাটিয়েছি এই কারাদুর্গে ; এছাড়া টাওয়ার অফ লণ্ডনে সম্রাটের আদেশে ঘাতকের কুঠারে যাদের মাথা দেহচ্যুত হয়েছে তাদের তালিকায় আছে সম্রাট ৮ম হেনরির দ্বিতীয় পত্নী অ্যানি বোলিন-এর নাম। এর পরে আছে লেডি জেন গ্রে, স্যর ওয়াল্টার র‍্যালে, লর্ড গিলফোর্ড ডাডলি প্রমুখ। আজও নির্দিষ্ট দিনে এদের বিদেহী আত্মার আবির্ভাব ঘটে টাওয়ার অফ লণ্ডনে, রক্ষী আর পর্যটকদের কৌতূহলী চোখের সামনে বিষণ মুখে বধ্যভূমির আশেপাশে ঘুরে বেড়ায় তারা, অনেকে আবার তাদের মুণ্ডুচ্ছেদের দৃশ্য অভিনয় করে দেখায়। টাওয়ার অফ লণ্ডনে যারা বন্দিজীবন কাটিয়েছেন অথবা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন এমন প্রায় প্রত্যেক ইতিহাসখ্যাত নারী ও পুরুষ চরিত্রের জীবন কাহিনীতে রোমান্সের উপাদান প্রচুর আছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

ব্রিটেনের রাজা বা রানী বাকিংহ্যাম প্যালেস বা প্রাসাদে থাকেন ঠিকই, কিন্তু রাজবাড়ির প্রথা অনুযায়ী তাঁর রাজমুকুট থাকে টাওয়ার অফ লণ্ডনের জুয়েল হাউস'এ। দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টা ঐ রাজমুকুটের পাহারায় যারা থাকে তারা সবাই প্রাসাদের রক্ষীবাহিনীর অভিজ্ঞ সৈনিক। এডওয়ার্ড লেন্থল সুইফট ছিল এই রকমই এক সৈনিক, আজ থেকে ১৮৩ বছর আগে ১৮১৪-তে প্রাসাদ রক্ষীবাহিনীর অধ্যক্ষ টাওয়ার অফ লণ্ডনের জুয়েল হাউস-এ পাহারা দেবার দায়িত্ব তাকে দেন। ১৮৫২ সালে এডওয়ার্ড চাকরি থেকে অবসর নেয়। সেই-সময় পর্যন্ত সে সপরিবারে থাকত জুয়েল হাউস-এর লাগোয়া রক্ষী আবাসে। চাকরি থেকে অবসর নেবার আট বছর পরে ১৮৬০ সালে এডওয়ার্ড সুইফট টাওয়ার অফ লণ্ডনে অর্জিত তার এক ভৌতিক অভিজ্ঞতার বিবরণ খবরের কাগজে ছাপিয়েছিল তা বিস্তারিতভাবে এখানে তুলে ধরা হল তারই জবানিতে।

১৮১৭ সালের অক্টোবর মাস, এক শনিবারের রাতে পাহারা শেষ করে দিয়ে এসেছি কোয়ার্টারে। রাতের খাবার তৈরি ছিল, উর্দি ছেড়ে ঘরোয়া পোষাক পড়ে টেবলে বসলাম। আমার বৌ, শ্যালিকা, আর আমার ছেলে, এরাও বসল যে যার জায়গায়। এখানে বলে রাখা দরকার আমরা যেখানে খেতে বসেছি অতীতে জুয়েল হাউস-এর ঠিক সেখানেই বন্দিনী ছিলেন সম্রাট অষ্টম হেনরির দ্বিতীয় পত্নী অ্যানি বোলিন, মুণ্ডুচ্ছেদ হবার আগে পর্যন্ত ঐখানেই আটকে

রাখা হয়েছিল সেই হতভাগিনীকে। পরে অলিভার ক্রমওয়েলের আদেশে দশ জন বিশপকেও ঐ একই চত্বরে আমৃত্যু আটকে রাখা হয়। সেই ঘরে ছিল ৩টি দরজা আর ২টি জানালা। নয় ফিট দেয়াল কেটে সেগুলো বসানো হয়েছিল। দরজা আর জানালার মাঝখানে ছিল লম্বা একফালি চিমনি সামনে অনেক দূর পর্যন্ত তা ছড়ানো ছিল। আর ছিল দেয়ালের গায়ে টাঙ্গানো একখানা বড় তৈল চিত্র। খেতে বসাব আগে ঘরের তিনটি দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করেছিল আমার স্ত্রী আর শ্যালিকা। ঐ ঘরের দু'টি জানালাতেই ঝোলানো ছিল ভারি পুরু পর্দা। খেতে বসার আগে আমার স্ত্রী দুটো বড মোমবাতি জ্বালিয়ে টেবলে রাখা মোমদানিতে বসিয়ে দিয়েছিল।

কারও মুখে টুঁ শব্দটি নেই, সবাই চুপচাপ একমনে খেয়ে যাচ্ছি। খানিক বাদে হঠাৎ আমার স্ত্রী "ও মাগো, কি ওটা?" বলে উঠেই থেমে গেলেন। ঠোটে আঙ্গুল বেখে আমার ছেলে আর শ্যালিকাকে কথা বলতে নিষেধ করলেন। মুখ তুলে দেখি আমার স্ত্রী খাওয়া থামিয়ে মুখ উঁচু করে একদৃষ্টে কি যেন দেখছেন। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে ওপবেব দিকে তাকাতেই চমকে গেলাম। দেখি খাবার টেবল আর ঘরের ছাদের ঠিক মাঝখানে আমাদের মাথার ওপর খানিকটা জমাটবাঁধা কুয়াশা ভেসে আছে। যা দেখলে কারও হাত বলে মনে হয়। কাঁটা চামচ নামিয়ে রেখে ভাল করে চোখ মুছে আবাব মুখ তুলে তাকাতেই দারুণ চমক। স্পষ্ট দেখলাম কযেক মুহূর্ত আগে হাতের মত দেখতে সেই জিনিসটা কাঁচের টিউবেব মত দেখাচ্ছে, মনে হচ্ছে সেই টিউবের ভেতরে একরাশ ফ্যাকাশে হলদে জলীয় পদার্থ ভাসছে। খানিক বাদে আবার তার আকাব পাল্টে গেল। এবং আর কাচের টিউব নয়। মনে হতে লাগল বাইবে থেকে খানিকটা গ্রীষ্মেব মেঘ কোন ফাঁকে ঢুকে পড়েছে খাবার জায়গায, ছাদেব নীচে তা ভেসে বেড়াচ্ছে অবিকল মেঘের মত। মিনিট কয়েক ঐভাবে কাটল ; আমাদের কারও মুখে কথা নেই। খাওযা ফেলে দু'জনে হাঁ করে মুখ তুলে সেই কিম্ভুত জিনিসের দিকে তাকিয়ে আছি। এবার সেই একদলা মেঘ ভাসতে ভাসতে চলে এলে শ্যালিকার মাথার পেছনে, সেখান থেকে আমার স্ত্রীর কাঁধের ওপর। তিনি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। "ঐ রে, ঐ এল! ও যীশু, ও মা মেরি, ঐ আমায় ধরল! আমায় বাঁচাও! গির্জায় তোমাদের নামে ভাল করে পূজো দেব!" বলে ভয়ে কাঁপতে লাগলেন ঠকঠক করে।

স্ত্রীর সেই হাড়কাঁপানো চিৎকার শুনে আমিও ঘাবড়ে গেলাম। আতঙ্কে গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল। সেই অদ্ভুত জমাট বাঁধা কুয়াশা তখন আমার স্ত্রী আর ছেলের মাঝখানে ভাসছে। প্রচণ্ড রাগ আর উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালাম, যুতসই কিছু হাতের নাগালে না পেয়ে চেয়ারটাই তুলে ধরলাম দু'হাতে। কয়েক পা এগিয়ে তা দিয়ে আঘাত হানতেই সেটা মিলিয়ে গেল। আমি সেখানেই থামলাম না। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ছেলের ঘরে ছুটে গিয়ে দাইকে সব খুলে বললাম। শুনে সেও ভয়ে কাঁপতে লাগল। ততক্ষণে আশেপাশের যত বাসিন্দা আমার স্ত্রীর চিৎকার শুনে এসে জড়ো হয়েছে বাইরে বারান্দায়। মজার ব্যাপার হল, একসঙ্গে খেতে বসলেও একদলা জমাট বাঁধা কুয়াশার মত সেই অদ্ভুত জিনিসটা শুধু আমার আর আমার স্ত্রীর চোখেই ধরা পড়েছিল, আমার ছেলে বা শ্যালিকা দু'জনের কেউই এত কাছাকাছি বসা সত্ত্বেও তা দেখতে পায়নি।

পরদিন সকালে আমি জুয়েল হাউস-এর লাগোয়া গির্জায় গিয়ে সেখানকার পাদ্রিকে রাতের ঘটনা খুলে বললাম। আশ্চর্যের ব্যাপার ধৈর্য ধরে সব শুনে তিনি বললেন, 'তোমরা হয় ভুল দেখেছো, নয়ত বাইরে থেকে কেউ তোমাদের ভয় দেখানোর মতলবে কোনও কারসাজি করেছে।" তাঁর কথা শুনে ধাক্কা খেলাম। এতদিন পর্যন্ত ধৈর্যের ধ্বজাধারী এইসব পাদ্রিদের অলৌকিক আর অতিপ্রাকৃত যে কোন ঘটনাকে দৈব বলে ব্যাখ্যা করতে দেখেছি, কিন্তু এই প্রথম ঐ দলের এমন একজনের মুখোমুখি হলাম যিনি বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অলৌকিক আর ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা খোঁজেন।

"আমি আর আর আমার স্ত্রী দু'জনেই নিজের চোখে দেখলাম, তারপরেও আপনি একে চোখের ভুল বলছেন?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"এর উত্তর যে তোমার প্রশ্নের মধ্যেই আছে তা বুঝিয়ে দিচ্ছি", পাদ্রি বললেন। 'তুমি তোমার বক্তব্য অনুযায়ী খেতে বসেছিলে তোমরা চার জন, তাদের মধ্যে শুধু তুমি আর তোমার স্ত্রীর চোখে ঐ ভুতুড়ে কুয়াশা ধরা পড়ল। এখন আমার প্রশ্ন, বাকি দু'জন অর্থাৎ তোমার ছেলে আর শ্যালিকা এরা ঐ ব্যাপারটা আদৌ দেখতে পেল না কেন? যুক্তি দিয়ে আমায় বোঝাতে পাববে? আমি জানি, পারবেনা, কেউ পারেনা।' সত্যিই আমার মুখে আর কথা জোগাল না। পাদ্রিমশাই কিন্তু সেখানেই থামলেন না। যুক্তি দিয়ে প্রকৃতির যাবতীয় রহস্য ব্যাখ্যা করতে ভালবাসেন এমন একজন বন্ধুস্থানীয় লোককে এই ঘটনার অল্প কিছুদিন পরে নিয়ে এলেন আমার কোয়ার্টারে। পেশায় শিক্ষক ঐ ভদ্রলোক বিজ্ঞান নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন অবসর সময়ে। আমাদের খাবার জায়গায় তাঁকে নিয়ে এলাম। পাদ্রিমশাইও এলেন তাঁর সঙ্গে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভদ্রলোক সেই একফালি খাবার জায়গায় হরেক রকম পরীক্ষা করলেন। কতবার দরজা জানালা খুললেন আর বন্ধ করলেন মনে নেই। কিন্তু এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা কবেও তিনি সে রাতের সেই ভুতুড়ে কুয়াশার কোনও বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা করতে পারলেন না। আমরা হতাশ হয়েছি আঁচ করে ভদ্রলোক বললেন, "হ্যাঁ, বিজ্ঞানের যুক্তির বাইরে কিছুই নেই, থাকতে পারেনা। আমার যন্ত্রপাতি এনে এই ঘরের ভেতর এমন সব অলৌকিক মায়াজালে তৈরি করতে পারি যা না দেখলে আপনাদের বিশ্বাস হবে না।"

"তাহলে সেদিন আমরা এই ঘরের ভেতরে যা দেখেছি আপনি তাও যন্ত্রপাতি দিয়ে করে দেখাতে পারেন?" আমার স্ত্রী প্রশ্ন করলেন।

"না, এ সম্পর্কে আমি কোনও প্রতিশ্রুতি দিতে অক্ষম", জবাব দিলেন সেই যুক্তি খোঁজা ভদ্রলোক।

কিছুদিন বাদে আমার কোয়ার্টারের কাছেই ঘটে গেল আরেকটি ঘটনা। যা অবশ্যই ভয়াবহ। প্রাসাদের রক্ষীবাহিনীতে আমার পুরোনো রেজিমেন্টের এক স্বাস্থ্যবান তাগড়াই জোয়ান ছোকরা আমারই মত বদলি হয়েছিল টাওয়ার অফ লণ্ডনের জুয়েল হাউস-এ। রাত বারোটায় পাহারা বদল হল, আমি বেয়নেট আঁটা গুলি ভরা রাইফেল নিয়ে জুড়িদারের অপেক্ষায় পায়চারি করছি এমন সময় খোশমেজাজে শিস দিতে দিতে সে ছোকরা পাহারা দিতে এল, তাকে আমার জায়গায় বহাল করে নীচে নেমে এলাম। গার্ড রুমে রাইফেল আর কার্তুজের ব্যাগ জমা দিয়ে ফিরে গেলাম কোয়ার্টারে।

পরদিন সকালে খবর পেলাম রাতে জুয়েল হাউস-এ ভূত এসেছিল। তার সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে আমার জুড়িদার মারাত্মক চোট পেয়েছে। ব্রেকফাস্ট খেয়েই ছুটে গেলাম গার্ডরুমে। দেখি যে ছোকরা একটা ক্যাম্পখাটে শুয়ে ঘুমোচ্ছে, মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। শুনলাম পড়ে গিয়ে মাথা ফেটে গেছে। তারই বয়সী আরেকজন ছিল সেখানে, ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে সে বলল, বাড়তি লোক হিসেবে কাল রাতে আমি এখানে বসেছিলাম। রাত তিনটে নাগাদ হঠাৎ পাগলা ঘণ্টি বাজতে চমকে উঠলাম। গার্ড কম্যাণ্ডারের হুকুমে ছুটে গেলাম জুয়েল হাউস-এ ; গিয়ে দেখি ঐ ছোকরা বারান্দার মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। মাথায় অনেকটা জায়গা কেটে গেছে, চারপাশ রক্তে লাল। নাম ধরে ডাকতে ও চোখ মেলে তাকাল। যা বলল তার মানে দাঁড়ায় ও রাইফেলে বেয়নেট এঁটে রোজের মতই বারান্দায় পায়চারি করছিল। পৌনে তিনটের কিছু পরে হঠাৎ দেখে বিশাল চেহারার কালো ভালুকের মত দেখতে একটা জানোয়ার পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে যেখানে রাজমুকুট থাকে সেই জুয়েল-রুমের দরজার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ও রাইফেল উঁচিয়ে ছুটে যায়। বেয়নেট চার্জ সেই জানোয়ারের পিঠে। কিন্তু সেই ভয়ানক দেখতে ভালুক মিলিয়ে গিয়েছিল তার আগেই, তার রাইফেলে আঁটা বেয়নেট গেঁথে গিয়েছিল দরজার কাঠের পাল্লায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে পাগলা ঘণ্টি বাজিয়ে দেয় আর তারপরে স্পষ্ট অনুভব করে কে যেন পেছন থেকে ধাক্কা মেরে তাকে ফেলে দিল মেঝের ওপরে। এর পরের ঘটনা আর কিছুই তার মনে নেই। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে খোশমেজাজে শিস দিতে দিতে যে ছোকরা রাতের বেলা পাহারা দিতে এসেছিল ঐ ঘটনার পরে তাকে আর চেনাই যাচ্ছিল না। এমন যাচ্ছেতাই বুড়িয়ে গিয়েছিল তার চেহারা। ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে রিপোর্ট দিলেন ব্রেনে জোর চোট লেগেছে। চিকিৎসা করেও সেই ছোকরাকে ডাক্তার সুস্থ করে তুলতে পারলেন না। সেদিন রাতেই মারা গেল সে। পরদিন ভোরে সামরিক রেওয়াজ মেনে টাওয়ারের লাগোয়া পরিত্যক্ত সেন্ট ক্যাথারিনস গির্জার জমিতে কবর দেয়া হল তাকে পূর্ণ সামরিক মর্যাদায়।

পাহারাদার ছোকরাটি সে রাতে নিজের চোখে যা দেখেছিল তা কি সত্যি কোনও ভৌতিক অপচ্ছায়া। নাকি তাকে ভয় দেখানোর জন্য কেউ আড়ালে দাঁড়িয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া না গেলেও ঐ ঘটনার পরে কর্তৃপক্ষ জুয়েল রুমের পাহারা বাড়িয়ে দেন, এবং প্রত্যেক শিফ্‌টে সেখানে দু'জন সশস্ত্র রক্ষীর পাহারা দেবার ব্যবস্থা করেন। এরপরে আর কোনও ভৌতিক অপচ্ছায়া সেখানকার রক্ষীদের চোখে পড়েনি। এতে টাওয়ারের পুরনো ইতিহাস ঘাটতে গিয়ে দেখা গেছে ঐ ঘটনার প্রায় একশো বছর আগে স্যর জন রেরেসবি তাঁর আত্মজীবনীতে ইয়র্ক দুর্গে প্রায় একইরকম ভৌতিক অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর বক্তব্যের অর্থ দাঁড়ায় চোখের সামনে এক চিলতে কাগজ হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে প্রথমে বাঁদর, তারপর ভালুকের আকার ধারণ করল। তিনি কৌতূহলবশে তাড়া করতেই সেই ভালুক নিমেষে আগের মত এক চিলতে সাদা কাগজ হয়ে গেল। তারপর তাঁর সামনে সিঁড়ি দিয়ে লাফাতে লাফাতে নীচে নেমে একটি ভেজানো কামরার পাল্লার তলার ফাঁক দিয়ে দিব্যি গলে গেল ভেতরে। স্যর রেরেসবি নিজেও ততক্ষণে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছেন, সেই ভেজানো

দরজার পাল্লা ঠেলে তিনিও ঢুকলেন কামরার ভেতরে। কিন্তু সেই এক চিলতে ভৌতিক কাগজের হদিশ পেলেন না। তিনি ভেতরে ঢুকবেন টের পেয়েই যেন আগে ভাগে তা উধাও হয়েছে। ভেতরে যারা কাজ করছিল তারা তাঁর ভীত, উত্তেজিত চোখ মুখ দেখে আশ্চর্য হল। তাঁর প্রশ্নের জবাবে তারা জানাল ; ঐরকম কোনও কাগজের টুকরো দরজার পাল্লার তলার ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেখেনি তারা। স্যর রেরেসবি নিজেও পরীক্ষা করে দেখলেন ভেজানো পাল্লার তলায় যে সামান্য এক চুলের মত ফাঁক আছে তার ভেতর দিয়ে এক চিলতে কাগজের পক্ষে কোনমতেই বাইরে থেকে ভেতরে নিজের খুশিমতন গলে যাওয়া সম্ভব নয়। অতএব, নিজের চোখে দেখলেও ঐ ঘটনা সাধারণ বুদ্ধির অগম্য ও সেই কারণে ব্যাখ্যায় অসাধ্য মন্তব্য করে তিনি ঐ প্রসঙ্গে ছেদ টেনেছেন।

টাওয়ার অফ লণ্ডন

সেন্ট জেমস প্যালেস

সেন্ট জেমস প্যালেসের সঙ্গে ব্যাখ্যার অতীত যে ঘটনাটি জড়িয়ে আছে তা কম করে দু'শো বছর আগের। ইংল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস এবং তাঁর ভাইও সিংহাসনের উত্তরাধিকারী জেমস-এর আমলে সেন্ট জেমস প্যালেসের সুদৃশ্য অ্যাপার্টমেন্টের স্যুট সে আমলের দুই অভিজাত ফরাসি মহিলা আস্তানা গেড়েছিলেন। ডাচেস অফ ম্যাজারিণ ও মাদাম দ্য বোক্রেয়ার নামে ঐ দুই ফরাসি মহিলা একদিকে যেমন ছিলেন অতুলনীয়া রূপবতী, অন্যদিকে তেমনই এক নম্বরের স্বার্থপর ও ধড়িবাজ। মূলত ডিউকের নর্ম-সহচরী ঐ দুই পাপিষ্ঠা এক সময় নিজেদের রূপ ভাঙ্গিয়ে সেই সামন্ততান্ত্রিক ইওরোপের বহু রাজ্যের রাজা মন্ত্রী আর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মাথা চিবিয়ে খেয়েছেন। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির বিনিময়ে কত বা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের হোতা এঁরা দু'জনে হয়েছেন তার লেখাজোখা নেই। ডুমার 'থ্রি মাসকেটিয়াস' উপন্যাসের 'মিলেডি' চরিত্রের বাস্তব রূপ বলা যায় তাঁদের। আগেই বলেছি এঁরা একসময় ছিলেন ডিউকের নর্ম-সহচরী, তখন প্যালেস অফ হোয়াইট হলের বাসিন্দা ছিলেন তাঁরা। কিন্তু সে সুখ বেশী দিন তাঁদের সইল না। একদিন আগুন লেগে গোটা প্যালেস অফ হোয়াইট হল পুড়ে ছাই হয়ে গেল। সহচরী দু'জনেরই রূপের জোয়ারে তখন ভাঁটার টান লেগেছে। ডিউক তরতাজা কমবয়সী যুবতীদের নিয়ে অবসর সময় কাটান, পুরোনো দিনের ঐ দুই সঙ্গিনীর দিকে তাকানো দূরে থাক, তাদের ধারে কাছেই ঘেঁষেন না। তবু হাজার হোক, রাজার ছেলে বলেই ডিউক দয়ার অবতার তাই আগুন লেগে প্রাসাদ পুড়ে ছাই হয়ে যাবার পরেও সঙ্গিনীদের ভাল ভাবে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আর সেই সঙ্গে খেয়ে পরে ভদ্রভাবে বাঁচার ব্যবস্থাও। দিনে তিন বেলা রাজবাড়ির খাবার-দাবারের ভাগ যাচ্ছে তাদের মহলে।

যৌবনের জোয়ারের ভালবাসার অভিনয় আর নানা ছলাকলায় ডিউককে পটানোর লড়াইয়ে একসময় যারা ছিলেন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, যৌবনের মোক্ষভাগে রূপের ভাঁটার টানের প্রখর দুঃসময়ে 'না-পোঁছ' অবস্থায় তাঁরাই হয়ে দাঁড়ালেন পরস্পরের অন্তরঙ্গ বান্ধবী। একসঙ্গে গল্পগুজব, খাওয়া-দাওয়া, বেড়ানো আর গির্জায় যাবার পাশাপাশি দু'জনে মেতে উঠলেন পরলোকচর্চায়। পরলোকচর্চার ওপর লেখা অনেক বই পড়লেন দু'জনে সবার চোখের আড়ালে বেশ কয়েকবার বসালেন প্ল্যাঞ্চেট বা প্রেতচক্রের অনুষ্ঠানও। কিছুদিন এইভাবে কাটানোর পরে একদিন দু'জনে দু'জনের কাছে এই বলে শপথ নিলেন যে তাঁদের মধ্যে যিনি আগে মারা যাবেন তিনি অপরজনের মারা যাবার আগে দেখা দেবেন এবং আসন্ন মৃত্যু সম্পর্কে তাঁকে আগে থাকতে তৈরি হতে বলবেন। এই যৌগিক চুক্তি সম্পাদানের কিছুদিনের মধ্যে ডাচেস অফ ম্যাজারিণ প্রবল জ্বরে ভুগে মারা গেলেন। শেষ নিঃশ্বাস ফেলার মুহূর্তে মাদাম দ্য বোক্রেয়ার বারবার তাঁকে সেই চুক্তির কথা মনে করিয়ে দিলেন। একেই কারও কাছে পাত্তা না পেয়ে রাস্তায় কুকুরের মত অবহেলিত ঘৃন্য জীবন কাটাচ্ছিলেন দু'জনে। তার মধ্যে বান্ধবীর আকস্মিক মৃত্যুতে সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়লেন মাদাম দ্য বোক্রেয়ার। সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য দরকার যে মানসিকতা নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে বহুকাল আগে তা খুইয়েছেন তিনি। তার ওপর

সবার অবহেলার পাত্রী হওয়ায় আগের মত ভাল খাওয়া পরাও জুটছে না। ভাঙ্গা মন নিয়ে নিজের মহলে একা দিন কাটান তিনি, গির্জায় যাওয়া পর্যন্ত ছেড়েছেন।

ডাচেস অফ ম্যাজারিণ শপথ রক্ষা করতে শীগগিরই এসে দেখা দেবেন। তিনি কবে মারা যাবেন আগে থেকে তা জানিয়ে তাঁকে পরলোক যাবার জন্য মানসিক ভাবে তৈরি করবেন, এবং আশায় বসে থাকেন, মহলের বাইরে এক পাও বাড়ান না। কিন্তু তাঁর বসে থাকাই সার, ডাচেসেস্ আর স্থূলদেহে দেখা দেবার নামটি নেই। এইভাবে তাঁর মনে দেখা দিল অবিশ্বাস ; পরলোক ত বটেই সেই সঙ্গে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কেও সন্দেহ জাগল তাঁর মনে। এর মাঝে ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা।

পুরোনো দিনের এক বান্ধবী এসেছিলেন সেন্ট জেমস প্যালেসে মাদাম দ্য বোক্রেয়ারের সঙ্গে দেখা করতে ; কথা প্রসঙ্গে এসে গিয়েছিল মৃত্যুর পরে জীবন আবার শুরু হয় কিনা এই বিষয়। বান্ধবীটি পরলোক সম্পর্কে ঘোর বিশ্বাসী জেনে পাগলের মত রুখে উঠলেন মাদাম দ্য বোক্রেয়ার। বারবার জোর গলায় বলতে লাগলেন মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ঘটে জীবনের পরিসমাপ্তি, পরলোক শব্দটাই বাজে, ভুয়ো ; এসব হাত পা নেড়ে বোঝাতে লাগলেন। তাঁর কথা শুনে বান্ধবীটি হতবাক। ক'দিন আগেও পরলোক সম্পর্কে যিনি ছিলেন আশাবাদী, তাঁর এই দশা কেন ঘটল ভেবে পেলেন না তিনি। কিন্তু তিনি মাদাম দ্য বোক্রেয়ারের একটি কথারও প্রতিবাদ করলেন না। পরিস্থিতি গরম হয়ে ওঠার আগেই তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরে এলেন। বাড়ি ফিরে সেই মহিলা জামাকাপড় পাল্টাবার আগেই আরেক কাণ্ড, সেন্ট জেমস প্যালেসের এক রক্ষী এসে হাজির তাঁর বাড়িতে, কোনও ভূমিকা না করে সে বলল মাদাম দ্য বোক্রেয়ারের নির্দেশে সে তাঁর কাছে এসেছে। মাদাম বলে পাঠিয়েছেন যে তিনি শীগগিরিই মারা যাবেন তার আগে বান্ধবীকে শেষবারের মত একবার দেখতে চান। মাদাম দ্য বোক্রেয়ার তাঁর নিজের গয়নার বাক্সটি বান্ধবীকে মৃত্যুর আগে উপহার দিতে চান। রক্ষী তাও জানাল, তারপর জড়োয়ার গয়না ভর্তি একটি সুদৃশ্য কাঠের বাক্স তুলে দিল মহিলার হাতে। মহিলা বাক্সটি নিয়ে দেখেন সত্যিই তার গায়ে তাঁর বান্ধবী মাদাম দ্য বোক্রেয়ারের নাম খোদাই করা আছে। ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে তিনি তখনই স্বামীকে নিয়ে রক্ষীর সঙ্গে আবার এসে হাজির হলেন সেন্ট জেমস প্যালেসে। মাদাম তাঁর কামরায় শুয়েছিলেন। বান্ধবীকে ফিরে আসতে দেখে বললেন, "আমি আর বেশীক্ষণ বাঁচব না, আজ রাত বারোটা থেকে একটার মধ্যে আমার মৃত্যু ঘটবে।" বান্ধবীটি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু মাদাম হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে বললেন, "আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। এই প্রাসাদেরই অন্য এক মহলে থাকতেন ডাচেস অফ ম্যাজারিণ তা তুমি জানো। তিনি মারা যাবার আগে আমরা পরস্পরকে কথা দিয়েছিলাম যে আগে মারা যাবে সে অপরের মৃত্যুর আগে দেখা দিয়ে তাকে পরলোক সম্পর্কে মানসিক ভাবে তৈরি হতে বলবে। ডাচেস মারা যাবার পরে তিন বছর কেটে গেছে, এতদিনের মধ্যে ওঁর দেখা না পেয়ে আমিও পরলোক সম্পর্কে অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলাম। বিশ্বাস করো, তুমি চলে যাবার খানিক বাদে উনি মানে ডাচেস অফ ম্যাজারিনের আত্মা দেখা দিলেন, ঘরের ঐ কোণে। তাঁর হাবভাব, তাকানো, সবকিছু দেখলাম আগের মতই আছে। কিছুই পাল্টায়নি। ওঁর শরীর এত পাতলা দেখাচ্ছিল যে মনে হল ঘরের ভেতর হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছেন। ভাসতে ভাসতে আমার কাছে এসে বললেন, 'বোক্রেয়ার, তৈরি থেকো, আজ রাতে বারোটা থেকে

একটার মধ্যে আমি তোমায় নিতে আসবে। এতদিন অপেক্ষায় থাকার পরে আজ যখন উনি সত্যিই দেখা দিলেন তখন আমিও পরলোক সম্পর্কে আমার হারানো বিশ্বাস ফিরে পেলাম। তোমার সঙ্গে এ-জীবনে আর দেখা হবে না বলেই আবার তোমাকে ডাকিয়ে এনেছি। আমার গয়নাগাঁটি যা ছিল সব তোমাকেই দিয়ে গেলাম।"

বান্ধবী বারবার বোঝাতে চাইলেন যে মাদাম অসুস্থতা ও মানসিক উত্তেজনার বশে ভুল দেখেছেন, কিন্তু তিনি তা কানেই তুললেন না। বান্ধবীটির আর বাড়ি ফেরা হল না। মাদামের অনুরোধে সে রাতে স্বামীকে নিয়ে তাঁরই বিছানার পাশে জেগে বসে রইলেন। দেখতে দেখতে সময় বয়ে যেতে লাগল, প্রাসাদের ফটকে রাত বারোটার ঘণ্টা বাজাব খানিকক্ষণ বাদে মাদামের বুকের বাঁদিকে প্রচণ্ড ব্যথা বেদনা শুরু হল। প্রাসাদের ডাক্তার খবর পেয়ে ছুটে এলেন, কিন্তু ততক্ষণে অবস্থা আয়ত্বের বাইরে চলে গেছে। রাত একটার ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন মাদাম দ্য বোক্লেয়ার, পরদিন সকালে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সেই বান্ধবীই তাঁকে সমাধি দিলেন। তারপরে বহু বছর কেটে গেছে, ডাচেস অফ ম্যাজারিণ বা মাদাম দ্য বোক্লেয়ারের আত্মা সেন্ট জেমস প্যালেসে কাউকে দেখা দিয়েছে বলে শোনা যায়নি।

অ্যালগারনন ব্ল্যাকউড-এর 'কিপিং হিজ প্রমিজ' গল্পে এই কাহিনীর লক্ষণীয় প্রভাব পড়েছে।

সেন্ট জেমস প্যালেস

হ্যাম্পটন কোর্ট

ইংল্যাণ্ডে ইতিহাস প্রসিদ্ধ যে ক'টি স্থান ভূতপ্রেতের অবাধ বিচরণক্ষেত্র হিসেবে বিখ্যাত তাদের মধ্যে প্রধান হল হ্যাম্পটন কোর্ট। বিশ্বাস করুন চাই না করুন, দেশী-বিদেশী হাজার হাজার পর্যটক প্রতিবছর শুধু ইতিহাস-খ্যাত কিছু নারী পুরুষের ভূত দেখার বাসনা নিয়ে এখানে এসে জোটে, তবে ভূত দর্শনের মনস্কামনা যে তাদের সবার বেলায় একই ভাবে পূরণ হয় একথা জোরগলায় অবশ্যই দাবি করা যায় না।

হ্যাম্পটন কোর্ট-এর ভূত দর্শন প্রসঙ্গে তার 'ভূত' অর্থাৎ অতীতের দিকে ফিরে তাকানো অনিবার্য হয়ে পড়ে। ষোড়শ শতাব্দীতে ব্রিটেনের রাজা অষ্টম হেনরির শাসনকালে তৈরি হয়েছিল হ্যাম্পটন কোর্ট প্রাসাদ, তৈরি করিয়েছিলেন রাজার সবচেয়ে বিশ্বাসভাজন মানুষ কার্ডিন্যাল ওলসি। ধর্মযাজক হওয়া সত্ত্বেও ওলসি ছিলেন ক্ষমতা-প্রিয় ও উচ্চাভিলাষী, রাজশক্তির সাহায্যে পোপ হবার স্বপ্ন দেখতেন। তবে ষোড়শ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে ক্ষমতাবান এই রাজপুরুষ যে সূক্ষ্মরুচিসম্পন্ন মানুষ ছিলেন তার প্রমাণ ছড়ানো আছে হ্যাম্পটন কোর্টের সবখানে। ইওরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে লোক পাঠিয়ে হাজার হাজার পাউণ্ড খরচ করে প্রাসাদের মেঝেতে পাতবার সেরা মলমলের গালিচা আর সোনা রুপোর কাজ করা হরেকরকম বাসনপত্র আনিয়েছিলেন তিনি। ভ্যাটিকানের মহামান্য পোপ ওলসিকে খুশি করতে ইটালিতে তৈরি বাহান্নটি পশমের গালিচা পাঠিয়েছিলেন হ্যাম্পটন কোর্টে। শুধু গালিচাই নয়, সে যুগের ইটালি আর ফ্রান্সের সেরা শিল্পীদের দিয়ে কার্ডিন্যাল ওলসি হ্যাম্পটন কোর্ট প্রাসাদের বিভিন্ন মহলের দেয়ালে যেসব ছবি আঁকিয়েছিলেন পরবর্তীকালে শিল্প সমালোচকেরা মুগ্ধ হয়েছেন সেসব দেখে। কার্ডিন্যাল ওলসির শিল্পসত্ত্বার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন তাঁরা।

কার্ডিন্যাল ওলসির দুর্ভাগ্য। রাজা অষ্টম হেনরির সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক বেশিদিন বজায় রইল না। অন্যায় ভাবে রাজা হেনরি তাঁর প্রথম স্ত্রীকে ত্যাগ করতে চাইলে কার্ডিন্যাল ওলসি তাতে অসম্মত হন, ফলে তখন থেকেই তাঁর ওপর রাজা রুষ্ট হলেন। শেষকালে প্রথম স্ত্রীকে ত্যাগ করে অষ্টম হেনরি বিয়ে করলেন অ্যানি বোলিনকে। অ্যানি আগাগোড়াই ছিলেন উদ্ধত স্বভাবের নারী। তাছাড়া তাঁর স্বামীর যে চারিত্রিক দৃঢ়তা একেবারেই নেই বিয়ের পরে তা বুঝতে তাঁর দেরি হয়নি। রাজার স্বভাবের ঐ দুর্বলতম স্থানের হদিশ পেয়েই তিনি প্রেম ভালবাসার অভিনয় করে তাঁকে বধ করলেন। যেসব ক্ষমতাবান রাজপুরুষেরা তাঁকে আদৌ পাত্তা দেন না একে একে তাঁদের বিরুদ্ধে রাজার মন বিষিয়ে তোলার খেলায় মাতলেন তিনি। তখনকার ইংল্যাণ্ডে রাজার পরেই সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তি ছিলেন কার্ডিন্যাল ওলসি, যথাসময় রানী অ্যানি বোলিন তাঁর নামেও রাজার কান ভারি করতে লাগলেন। প্রথম স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার সময় কার্ডিন্যাল ওলসি সম্মত হননি বলে রাজা তাঁর ওপর চটেছিলেন সেকথা আগেই বলেছি। এবার অ্যানি বোলিনের মুখে তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা শুনে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। রানীকে খুশি করতে রাজা অষ্টম হেনরি কার্ডিন্যালের যাবতীয় শাসন ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তাঁর গ্রেপ্তারের আদেশ দিলেন। ওলসি জেমস ছিলেন প্রাসাদ থেকে বহু দূরে তাঁর গ্রামের

বাড়িতে, রাজার হুকুমে রক্ষীরা সেখান থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করল। রাজসভায় তাঁর বিচার হবে গ্রেপ্তার করার আগে রক্ষীদলের অধিনায়ক একথা শোনালেন তাঁকে। বিচারের নামে যা হবে তা নিছক প্রহসন, এবং প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে হটাতে রানি অ্যানি বোলিন তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করতে রাজাকে বাধ্য করবেন তা আঁচ করতে কার্ডিন্যাল ওলসির অসুবিধা হল না। তবু রক্ষী দলের সঙ্গে তিনি রওনা হলেন রাজধানীর দিকে। কিন্তু ওলসির কপাল ভাল আসামির কাঠগড়ায় তাঁকে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াতে হয়নি। রাজধানীতে এসে পৌঁছোবার আগে মাঝপথেই তিনি মারা যান। অনেকে বলে তিনি বিষপান করে আত্মহত্যা করেছিলেন। যাক্ সে কথা।

অ্যানি বোলিন নিজেও বাঁচলেন না। কার্ডিন্যাল ওলসি মারা যাবার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনিও স্বামীর বিরাগভাজন হলেন। বিয়ের পরে একটি পুত্র সন্তানেরও জন্ম দিতে পারেননি, অ্যানি বোলিনের বিরুদ্ধে এটাই ছিল রাজার প্রধান অভিযোগ। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর সীমাহীন উদ্ধত আচরণ। এইসব অপরাধে রাজা অষ্টম হেনরি প্রিয়তমা দ্বিতীয় স্ত্রী অ্যানি বোলিনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন।

অ্যানি বোলিনের মৃত্যুর পরে যাকে অষ্টম হেনরি বিয়ে করেন তাঁর নাম জেন সিমোর। স্বামীর মনোবাসনা পূরণ হয়েছিল তাঁরই মাধ্যমে। জেন একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। কিন্তু টিটেনাস বা ধনুষ্টংকার রোগে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মারা যান।

তৃতীয় পত্নীর শোক কাটিয়ে উঠতে না উঠতে বিয়ে করলেন রাজা অষ্টম হেনরি, কিন্তু সে বিয়ে সুখের হলনা। ফলে অনিবার্য ভাবে চতুর্থ স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ঘটল বিচ্ছেদ। তার কিছুদিন বাদে পাঁচবারের বার আবার বিয়ে করলেন তিনি। এবারের পাত্রীটির বয়স মাত্র আঠারো। রূপসী সদ্য যুবতীটির নাম ক্যাথরিন হাওয়ার্ড। রাজা অষ্টম হেনরি ততদিনে বৃদ্ধ হয়েছেন। তাঁর পাশে ক্যাথরিনকে তাঁর নাতনি বলে মনে হয়। রূপসী অ্যানি বোলিনের প্রেমে রাজা অষ্টম হেনরি বিভোর হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু অ্যানির প্রবল উচ্চাশা আর উদ্ধত আচরণ সেই প্রেমের পথে অন্তরায় হয়েছিল। বয়সের অনেকখানি ফারাক সত্ত্বেও পঞ্চম ক্যাথরিনের অঢেল রূপ আর শান্ত স্বভাব রাজার প্রেমের তৃষ্ণা আবার জাগিয়ে তুলল।

কিন্তু রাজপ্রাসাদের চার দেয়ালের খাঁজে খাঁজে যে হরেক প্রতিপক্ষের কান সবসময় খাড়া থাকে তা বেচারি ক্যাথরিনের জানা ছিলনা। অ্যানি বোলিনের মৃত্যুর পরে পঞ্চম রানী ক্যাথরিন বুড়ো রাজাকে হয়ত তারই মত বশ করে ফেলেছে এই আশঙ্কা জাগল তার প্রতিপক্ষের মনে। ক্যাথরিনকে সরাতে যথাসময় ফাঁদ পাতল তারা এবং বেচারি ক্যাথরিন সেই ফাঁদে পা দিয়ে তাদের হাতে ধরা পড়ল। আর যায় কোথায়। পঞ্চম রানী ক্যাথরিনের স্বভাব চরিত্র ভাল না এই বিশ্বাস রাজার মনে গড়ে উঠতে বেশি সময় লাগল না। ক্যাথরিনকে গ্রেপ্তার করে বিচারের জন্য প্রাসাদের এক নির্জন কক্ষে আটক রাখার আদেশ দিলেন রাজা অষ্টম হেনরি।

প্রাসাদ রক্ষী দল গ্রেপ্তার করতে এলে তাদের মুখ থেকে রাজার নির্দেশ শুনে আসল ব্যাপার কি ঘটেছে তা বুঝতে পারল ক্যাথরিন। বিচারে কি চরম পরিণতি তার ঘটতে চলেছে তাও অনুমান করল সে। ক্যাথরিন জানত রাজা খানিক আগে প্রাসাদের লাগোয়া গির্জার উপাসনা সভার যোগ দিতে গেছেন। কোনও প্রতিবাদ না করে রক্ষীদের সঙ্গে এগিয়ে চলল সে। খানিক দূর গিয়েই আচমকা দৌড়ে পালাল ক্যাথরিন, ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হল গির্জার কাছে,

'রাজা, তুমি কোথায়। আমায় বাঁচাও! যা জেনেছো সব মিথ্যা, সাজানো, আমার বিরুদ্ধে সাজানো ষড়যন্ত্র! আমায় এবারের মত বাঁচার সুযোগ দাও!' বলে আর্তনাদ করতে লাগল সে। তার সেই বুকফাটা আর্তনাদ গির্জার ভেতরে উপাসনারত রাজার কানে পৌঁছে ছিল তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তিনি তাতে কান না দিয়ে চুপ করে রইলেন। ততক্ষণে প্রাসাদ রক্ষীদল ক্যাথরিণকে তাড়া করে এসে পড়েছে গির্জার সামনে। দলপতির ইশারায় এবার তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল রানীর ওপর। হাতে পায়ে লোহার শেকল পরিয়ে তাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে প্রাসাদের এক নির্জন কক্ষে আটকে রাখল। তারপরে যা ঘটল তা সহজেই অনুমান করা যায়— দণ্ডাদেশ তৈরিই ছিল বিচারের নামে। এক প্রহসনের অনুষ্ঠান করে সেই দণ্ডাদেশ পড়ে শোনানো হল হতভাগিনীকে।

১৫৪২-এ টাওয়ার অফ লণ্ডনের মশান বা বধ্যভূমি টাওয়ার জিলে জল্লাদের কুঠারাঘাতে অষ্টম হেনরির পঞ্চম স্ত্রী অষ্টাদশী ক্যাথরিন হাওয়ার্ডের মাথা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

টাওয়ার অফ লণ্ডন ও হ্যাম্পটন কোর্ট, দু' জায়গাতেই অ্যানি বোলিনের বিদেহী আত্মার দেখা পাওয়া যায় ; হ্যাম্পটন কোর্টে তাকে দেখা যায় 'ট্রেটর্স গেট'-এর সামনে। হাতে পায়ে শেকল বাঁধা। বিচারাধীন বন্দিনীর বেশে। আর টাওয়ার অফ লণ্ডনে যারা ভূত দর্শন করতে যান ভাগ্য ভাল থাকলে আর সাহসের অভাব না ঘটলে তাঁদের মধ্যে অনেককে অ্যানি বোলিন দর্শন দিয়ে ধন্য করেছেন। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল এখানে সাধারণত তিনি কবন্ধের আকারেই দেখা দিয়ে ভালবাসেন।

স্বচক্ষে যারা তাঁর প্রেতমূর্তি দেখেছেন তাঁদের বক্তব্য থেকেই জানা গেছে টাওয়ার অফ লণ্ডনে অ্যানি বোলিনের প্রেতিনীর ঘাড়ের ওপর মাথা তাঁরা দেখেননি, কাটা মাথাখানা বসানো থাকে তার দু'হাতে ধরে থাকা একটি বড় থালার ওপর।

রাজা অষ্টম হেনরির পঞ্চম স্ত্রী অষ্টাদশী ক্যাথরিন হাওয়ার্ডের প্রাণদণ্ডের পরে হ্যাম্পটন কোর্ট প্রাসাদে শুরু হল তার অতৃপ্ত আত্মার আনাগোনা। রানীকে প্রাসাদ রক্ষীরা গ্রেপ্তার করার সময় বুড়ো রাজা অষ্টম হেনরি প্রাসাদের লাগোয়া গির্জায় প্রার্থনা করতে বসেছিলেন সেকথা আগেই বলেছি ; বহু বছর পরে গির্জার পাশে অতিথিদের জন্য একটি ঘর তৈরি করা হয়। ঐ ঘরে যাঁরা রাত কাটিয়েছেন তাঁরা সবাই এক অস্বস্তিকর অনুভূতির শিকার হয়েছেন যে অনুভূতির কথা তাঁরা অনেকের কাছে উল্লেখ করেছেন। সেই সঙ্গে নিশুতি রাতে মেয়ে মানুষের বুক ফাটা আর্তনাদও তাঁদের কানে এসেছে। সেই আর্তনাদ শুনে কৌতূহলের বশে দরজা খুলে অনেকেই দেখেছেন সর্বাঙ্গে জড়োয়া গয়না পরনে সেকেলে ঢিলে আলখাল্লার মত গাউন পরা এক সুন্দরী যুবতী রাজা আমায় বাঁচাও, বাঁচতে দাও, আমি আর তোমার কথার অবাধ্য হব না, বলে কাঁদতে কাঁদতে পাশের গির্জায় দরজার সামনে লুটিয়ে পড়ছে আর দু'হাতে ধাক্কা দিচ্ছে দরজার পাল্লায়। কিন্তু গির্জার দরজা খোলার আগেই জ্বলন্ত মশাল হাতে ছুটে আসে সশস্ত্র প্রাসাদের রক্ষীরা। ভীত অতিথিদের বিস্মিত চোখের সামনে তারা সেই যুবতীর হাতে পায়ে শেকল পরিয়ে টানতে টানতে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। মহারানী ভিকটোরিয়ার শাসনকালেও হ্যাম্পটন কোর্ট প্রাসাদে বহু অতিথি ও রাজদূত ঐ দৃশ্য দেখেছেন ; তারপর প্রাসাদ কর্তৃপক্ষ অতিথিদের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে দেখে প্রাসাদের অন্য প্রান্তে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করেন যে ব্যবস্থা আজও বজায় আছে।

দুর্নিবার উচ্চাশার তাড়নায় ভ্যাটিকানের পোপের যে প্রতিনিধি একসময় হয়ে উঠেছিলেন রাজা অষ্টম হেনরির ডান হাত, সেই কার্ডিন্যাল ওলসির আত্মাকেও তাঁর পরিকল্পনায় তৈরি হ্যাম্পটন কোর্টে অনেকে আবির্ভূত হতে দেখেছে ; মধ্যযুগীয় ধর্মযাজকদের পোষাকে দিনে দুপুরেই তিনি ঘুরে বেড়ান প্রাসাদের সর্বত্র। যেখানে একসময় তাঁর কার্যালয় ছিল তার আশেপাশে কি যেন খুঁজে বেড়ান তন্নতন্ন করে। প্রাসাদের রক্ষী আর গাইডেরা যারা চেনে তারা তাঁকে বাধা দেয় না। কোনও প্রশ্ন করে বিরক্ত করেনা। তাঁর প্রেতমূর্তি কাছাকাছি এলে সম্ভ্রম দেখিয়ে সরে দাঁড়ায় তাঁরা।

রাজা অষ্টম হেনরির আমলের আরও যে দু'জন নারীর প্রেতমূর্তি আজও হ্যাম্পটন কোর্ট প্রাসাদে আবির্ভূত হন জীবিত অবস্থায় তাঁরা ছিলেন সেখানকারই বাসিন্দা। এঁদের একজন হলেন অষ্টম হেনরির তৃতীয় স্ত্রী জেন সিমোর যিনি রাজাকে পুত্র সন্তান উপহার দিয়েছিলেন। রাজার সঙ্গে বিয়ের অনেক আগে থেকেই জেন কুমারী অবস্থায় ছিল সেখানকার বাসিন্দা। দ্বিতীয় স্ত্রী অ্যানি বোলিন বেঁচে থাকতেই জেন রাজার নজরে পড়েন। প্রথম দৃষ্টি বিনিময়েই তাঁরা একে অপরকে মন দিয়ে বসেন। অ্যানি বোলিনের মৃত্যুর পরে রাজা বিয়ে করেন জেন সিমোরকে। তার আগে কিছুদিন প্রণয়লীলাতেও মেতে ওঠেন দু'জনে। বিয়ের কিছুদিন পরে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়ে ধনুষ্টংকারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান রানী জেন সিমোর সেকথা আগেই উল্লেখ করেছি। আজও হ্যাম্পটন কোর্ট প্রাসাদে ভূত সন্ধানী আগ্রহী পর্যটক ও ভ্রমণার্থীদের অনেকের চোখের সামনে আবির্ভূত হন, জীবিত অবস্থায় প্রাসাদের যে অংশে তিনি থাকতেন তারই আঙ্গিনায় একটি বাচ্চাকে কোলে নিয়ে পায়চারি করতে দেখা যায় তাঁকে, অনেকে সেই বিদেশী রাণীর গলায় ঘুমপাড়ানি গানও শুনেছে। আপন মনে পায়চারি করতে করতে একসময় বাচ্চা কোলে নিয়ে বাতাসের বুকে মিলিয়ে যান রানী।

অন্য যে বিদেহী নারীকে হ্যাম্পটন কোর্ট প্রাসাদে দেখা যায় তাঁর নাম সিবেল পেন, বেঁচে থাকতে তিনি ছিলেন রানী জেন সিমোরের ছেলে এডওয়ার্ড-এর (ষষ্ঠ এডওয়ার্ড) ধাই মা। রানী জেন সিমোর মারা যাবার বছর খানেক বাদে ১৫৩৮-এর অক্টোবরে সিবেল পেন যুবরাজ এডওয়ার্ড-এর ধাইমার পদে নিযুক্ত হন। সাধারণ মাইনে করা ধাই হলেও শ্রীমতী পেনকে ভালবাসতেন নিজের পেটের ছেলের মত। যুবরাজ নিজেও তাঁকে এক মুহূর্ত না দেখলে অস্থির হতেন। মিসেস পেন-এর কাছে আন্তরিকতা রাজার নজর এড়াল না। তিনি তাঁকে পুরস্কৃত করলেন। যুবরাজ এডওয়ার্ড নিজেও তাঁর ধাই-মাকে ভোলেন নি। অষ্টম হেনরির মৃত্যুর পরে তিনি এডওয়ার্ড পরিচয়ে সিংহাসনে বসেই তিনি শ্রীমতী পেনকে রাজদরবারের অন্যতম প্রধান মহিলা সদস্যের সম্মানে ভূষিত করলেন। রাজা ততই এডওয়ার্ডের দুর্ভাগ্য খুব বেশি দিন তিনি রাজত্ব ভোগ করতে পারেননি।

১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে যক্ষ্মারোগে ভুগে যখন তিনি মারা যান তখন তাঁর বয়স মাত্র ষোল। মাতৃহারা রাজা ষষ্ঠ এডওয়ার্ডকে এক বছর বয়স থেকে বুকের দুধ খাইয়ে মিসেস সিবেল পেন মানুষ করেছেন কাজেই তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে তিনি কি প্রচণ্ড আঘাত পেলেন তা আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। খাওয়া ঘুম সব ভুলে দিন রাত তিনি শুধু রাজার সমাধির পাশে পড়ে থাকেন আর চোখের জলে বুক ভাসান। তাঁর এই অবস্থা দেখে রাজদরবারের কর্তাব্যক্তিরা বিচলিত হলেন কারণ তাঁরা জানতেন ঐ মহিলা খুবই অসহায়, তাঁকে দেখার মত

আপনজন কেউ নেই। তাঁরাই উদ্যোগী হয়ে মিসেস পেনকে হ্যাম্পটন কোর্ট রাজপ্রাসাদের এককোণে থাকার জায়গা করে দিলেন। খাওয়া-পরার আর নিয়মিত মাসোহারারও ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু ঐ প্রাসাদে ঠাঁই পাবার পরে তিনি বেশি দিন বাঁচেননি। রাজা ষষ্ঠ এডওয়ার্ড মারা যাবার মাত্র ন'বছর বাদে ১৫৬২ খৃষ্টাব্দের ৬ই নভেম্বর বসন্ত রোগে ভুগে মিসেস সিবেল পেন মারা যান। হ্যাম্পটন-অন-টেমস গির্জার সমাধিক্ষেত্রে প্রাসাদ কর্তৃপক্ষ তাঁকে কবর দেন, এবং তাঁর কর্তব্যের কথা মনে রেখে একটি স্মৃতিস্তম্ভও সেখানে গড়ে ওঠে রাজদরবারের প্রশাসকদের উদ্যোগে।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে পুরোনো গির্জাটি ভাঙ্গা হয়। একইসঙ্গে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ঠিকাদার মজুরেরা মিসেস সিবেল পেন্-এর কবরের স্মৃতিস্তম্ভও ভাঙ্গচুর হয়, লুঠ হয় স্মৃতিস্তম্ভের দামি শ্বেত পাথরের ফলক। হ্যাম্পটন কোর্ট প্রাসাদও ঐ সময় ভেঙ্গে চুড়ে নতুন করে গড়া হচ্ছিল। কবর ভেঙ্গে ফেলার পরেই মিসেস পেন্-এর আত্মাকে বিক্ষুব্ধ অবস্থায় প্রাসাদের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে যে ঘরে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল তার বাইরে বিক্ষুব্ধ অবস্থায় ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় রাতের বেলা। প্রাসাদ রক্ষীরা শুনতে পেত সেই ঘরের ভেতর থেকে চরকা ঘুরিয়ে সূতো কাটার আওয়াজ ভেসে আসছে। কখনও শুনতে পেত মেয়েদের গলায় কে যেন বিড়বিড় করে বলছে আপনমনে। আবার কখনও কখনও শোনা যেত শিশুর কান্না। দিনের বেলায় সেই ঘরে খানাতল্লাশি করে রক্ষীরা একটি সূতো কাটায় চরকা সত্যিই খুঁজে পায়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় চরকার পাশেই পড়েছিল ঝুড়িভর্তি পেঁজা সূতো আর তুলো। মিসেস পেন্-এর আত্মা ঐ-সময় প্রাসাদের অনেককে দেখাও দিয়েছেন। বেঁচে থাকতে তিনি লম্বা ঢোলা সাদা রং -এর আলখাল্লা পরতেন। মাথায় পরতেন নার্সদের মতন আঁটো টুপি। মিসেস পেন্ মারা গেলে তাঁর ঐ আলখাল্লা পরা একটি মূর্তি শ্বেতপাথর খোদাই করে শোয়ানো অবস্থায় তাঁর কবরের ওপর প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রাসাদের নতুন বাড়ি তৈরি হবার পরে প্রবেশপথের মুখে মিসেস পেন্-এর স্মৃতিস্তম্ভ নতুন করে বসানো হয়েছে। কিন্তু এই নতুন ব্যবস্থাকে মিসেস পেন্-এর বিক্ষুব্ধ আত্মা মেনে নিতে পারেননি। তাই আজও আগের মতই ঢিলে আলখাল্লা আর আঁটো টুপি পরা তাঁর বিদেহী আত্মাকে হ্যাম্পটন কোর্ট প্রাসাদের আনাচে-কানাচে অস্থির ভাবে পা ফেলে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। প্রাসাদ রক্ষীদের একাংশের বর্ণনা থেকে জানা গেছে পায়চারি করতে করতে মিসেস পেন্-এর বিদেহী আত্মা কখনও কখনও প্রাসাদের বারান্দার এক কোণে বসে পড়েন। কৌতূহলী রক্ষীরা দেখেছে ঐসময় তিনি কোলে শোয়ানো একটি শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ান। আবার এককে সময় সেই শিশুর কানের কাছে ঠোঁট এনে বিড়বিড় করে কিছু বলতেও লক্ষ্য করেছে তারা কিন্তু কাছাকাছি এসে কান পেতেও তাঁর বক্তব্য তারা শুনতে পায়নি। যারা তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখেছে তাদের কারও কারও মতে মিসেস পেন্-এর আত্মার কোলে শোয়ানো শিশুটি পরলোকগত রাজা এডওয়ার্ডের শৈশবের আত্মার রূপ। তিনি নিজে আর রাজা এডওয়ার্ড, দু'জনের কেউই যে বেঁচে নেই, মৃত্যুর পরে মিসেস পেন্-এর বিদেহী আত্মার সে বোধ হয়ত আজও হয়নি। হয়ত পুরোনো কবর আর স্মৃতিস্তম্ভ ভেঙ্গে ফেলার ক্ষোভ শিশু যুবরাজের কানের কাছে মুখ এনে প্রকাশ করছেন তিনি। নালিশের সুরে হয়ত বলছেন, 'ওগো ছোট্ট রাজা মানিক আমায় একবার চোখ মেলে দ্যাখো তোমার লোকেরা আমার কবর সরিয়ে ফেলেছে। ভেঙ্গে তছনছ করেছে স্মৃতিস্তম্ভ। আমার শান্তির ঘুম কেড়ে নিয়েছে

ওরা, তোমার লোকেরা। বড় হয়ে তুমি যখন রাজা হয়ে সিংহাসনে বসবে তখন এই দুঃখী ধাইমার কথা মনে করে ওদের ভাল করে ধমকে দিয়ো সোনা। তুমি ছাড়া এ দুঃখের কথা শোনাবার আর কেউ যে আমার নেই, সোনামণি!'

দেখাশোনা করার কেউ নেই এই শ্রেণীর অনেক অভিজ্ঞাত নারীপুরুষ একসময় আশ্রিত হিসেবে ঠাঁই পেয়েছে হ্যাম্পটন কোর্ট প্রাসাদে। সেখানকার পুরোনো কাগজপত্র ঘেঁটে দেখা গেছে গত শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ এমনই এক অভিজাত বংশের আশ্রিতা মহিলা প্রায়ই প্রাসাদ কর্তৃপক্ষের কাছে এই বলে অভিযোগ করতেন যে তাঁর কামরার দেয়ালের গায়ে ওপাশ থেকে যখন তখন টোকা পড়ে। দিনের বেলা দরজা খুলে কাউকে তাঁর চোখে পড়েনি। কিন্তু রাতের বেলা আচমকা দরজা খুলে মুখ বের করে তিনি যা দেখেছেন তাতে গায়ে কাঁটা দেয়—দু'টি ছায়ামূর্তি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ঘনঘন টোকা দিচ্ছে বাইরে থেকে কামরার দেয়ালে। আর তাতে আওয়াজ হচ্ছে ঠুকঠুক। ছায়ামূর্তি দু'টির চেহারা দেখতে না পেলেও তাদের পরনে পুরোনো আমলের সৈনিকের জোব্বা আর কোমরে ঝোলানো খাপে আঁটা বেঁটে তলোয়ার তাঁর চোখে পড়েছে। তাদের এই নিয়মিত ভৌতিক উপদ্রবের ফলে তাঁর দু'চোখ থেকে ঘুম বিদায় নিয়েছে লিখিত অভিযোগে মহিলা তাও উল্লেখ করলেন। কর্তৃপক্ষ সেই লিখিত অভিযোগ পাঠিয়ে দিলেন প্রাসাদের পূর্ত বিভাগে ; অনেক টেবল ঘুরে আসার পরে পূর্ত বিভাগের কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি সেই মহিলার সঙ্গে দেখা করে সরাসরি জানালেন প্রেতলোকের বাসিন্দাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তাঁদের নেই। মহিলা বরং প্রাসাদের গির্জার পাদ্রির সঙ্গে কথা বলে দেখুন ঝাড়ফুঁক করিয়ে ঐ ভৌতিক উপদ্রব বন্ধ করা যায় কিনা। ভদ্রমহিলা এরপর পাদ্রিকে দিয়ে সত্যিই ঝাড়ফুঁক করিয়েছিলেন কিনা তা জানা না গেলেও এনিয়ে আর কর্তৃপক্ষের হাতে পায়ে ধরেননি তাতে সন্দেহ নেই। কয়েক বছর পরে সংস্কারের কাজে হাত দেবার সময় প্রাসাদের পূর্ত বিভাগের মজুরেরা ঐ মহিলার কামরার মুখোমুখি ফাউন্টেন কোর্ট-এর জমি খুঁড়ে দু'টি পূর্ণ বয়স্কের পুরুষের কংকাল খুঁজে পায়। তাদের দু'জনেরই কোমরে আঁটা বেল্টে ছিল খাপে আঁটা বেঁটে তলোয়ার, প্রাসাদ কর্তৃপক্ষ অনুমান করলেন ঐ দু'টি কংকাল রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের আমলের। দু'জন সৈনিকের যারা হয় কোনও দুর্ঘটনার শিকার হয়ে ঐখানে মাটি চাপা পড়েছিল। অথবা গুরু অপরাধে তাদের দু'জনকেই একসঙ্গে জ্যান্ত পুঁতে ফেলা হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ ঐ কংকাল দু'টি তুলে নিয়ে গিয়ে প্রাসাদের বাইরে গির্জার সমাধিক্ষেত্রে কবর দেন। কিন্তু তারপর থেকে সেই মহিলার কামরার দেয়ালে রোজ টোকা পড়া বন্ধ হয়েছিল কিনা প্রাসাদের পুরোনো কাগজপত্রে তা উল্লেখ করা হয়নি যেমন উল্লেখ করা হয়নি সেই আশ্রিতা মহিলার নাম।

নিজের চোখে ভূত ধরাধামে অনেকেই দেখেছেন। কিন্তু রাতের বেলায় পাহাররত পুলিশ কনস্টেবলের ভূত দেখার সত্য কাহিনী নিতান্তই বিরল বলে এতদিন সবাই জেনে এসেছেন। কিন্তু হ্যাম্পটন কোর্ট প্রাসাদের বাইরে বিটের এক পাহারাদার কনস্টেবল নিজের চোখে সত্যিই ভূত দেখেছিল।

১৯০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকের কোনও এক রাত ; লণ্ডন মেট্রোপলিটান পুলিশের বয়স্ক কনস্টেবল (নম্বর ২৬৫টি) হ্যাম্পটন কোর্ট প্রাসাদের বাইরে বিটে পাহারা দিচ্ছে। মাথায় হেলমেট আঁটা, হাতে দুলছে বড় টর্চ, কান পর্যন্ত তোলা পুরু ওভারকোটের

কলারের ফাঁক দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া ছুঁচ ফোটাচ্ছে ঘাড়ে। ঘরমুখো মাতালের দল টলতে টলতে হাঁটছে ফুটপাত ধরে, পাহারাদার কনস্টেবলকে দেখে ঝামেলার আশংকায় বড় বড় পা ফেলে সরে পড়ছে ; প্রাসাদের দিক থেকে সন্দেহজনক কোনও আওয়াজ ভেসে এলেই কনস্টেবল সেদিকে টর্চ তাক করে জোরালো আলো ফেলছে, সেই আলোর সন্ধানী চাউনি মেলে দেখছে কোনও দাগি সিঁধেল চোর ছ্যাঁচোর ভেতরে ঢুকেছে কিনা। কাউকে দেখতে না পেয়ে টর্চ নেভানোর সঙ্গে সঙ্গে বিপুল আঁধার এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল চারপাশে আর সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদের রান্নাঘর বা ভাঁড়ারের দিক থেকে ভেসে এল বেড়ালের কান ফাটানো চিৎকার। বেড়ালের চিৎকার শুনে কনস্টেবলের বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল ; বারোটা অনেকক্ষণ হল বেজে গেছে, এমনই সময় সে দেখল প্রাসাদের সিংহদুয়ার আচমকা খুলে গেল। ভেতর থেকে রাজকীয় সাজে সজ্জিত কিছু নারী পুরুষ সার বেঁধে বেরিয়ে এল। ল্যাম্পপোস্টের আলোয় তারা হাঁটতে লাগল সেই কনস্টেবল যেখানে পাহারা দিচ্ছে সেদিকে। তার কাছাকাছি পৌঁছেই হাওয়ার বুকে মিলিয়ে গেল সবাই আর কাউকে দেখা গেল না। প্রাসাদের সিংহদুয়ার খোলাই রয়ে গেল।

কিন্তু নিজে চোখে দেখলেও পুলিশকে কখনও ভূত প্রেতে বিশ্বাস করতে নেই। তাই সেই কনস্টেবল তার ভূতদর্শনের ঘটনা শুধু একান্ত বিশ্বাসভাজন নিজের লোক ছাড়া আর কাউকে বলতে পারেনি। কিন্তু সে নিজে না বললেও তার বিশ্বস্ত-জনেরা এ-ব্যাপারে মুখ বুঁজে থাকেনি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ খবরটি সাতকাহন করে জানিয়েছিল বিভিন্ন স্থানীয় দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরে। ফলে সেই খবর অনেক খবরের কাগজে ছেপে বেরিয়েছিল যা পড়ে লণ্ডন মেট্রোপলিটান পুলিশের তৎকালীন কর্তারা সেই কনস্টেবলকে ডেকে ধমকাতে কসুর করেননি। ধমকানোব ফলে এই দাঁড়াল যে পরবর্তী কালে যে বা যারা যখনই খবরের কাগজে প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে সেই কনস্টেবলকে ভূত দেখার ঘটনা শোনানোর জন্য অনুরোধ করেছে, তার বা তাদের সে অনুরোধে কান না দিয়ে সেই কনস্টেবল এক কথায় সাফ বলেছে। "না মশাই। আপনার ভুল হচ্ছে, আমি সে লোক নই। আপনি হয়ত আর কারও সঙ্গে আমায় গুলিয়ে ফেলেছেন। তা এতে আমি কিছু মনে করিনি। এমন ত কতই হয়।"

ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের এক রানীর প্রসঙ্গ তুলে হ্যাম্পটন কোর্ট প্রাসাদ পর্বে ছেদ টানব। ১৬০৩ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ, ঐ দিন রাত তিনটেয় প্রাসাদের লাগোয়া রিচমণ্ড প্রাসাদে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন রাণি প্রথম এলিজাবেথ। মারা যাবার পরে জানা গিয়েছিল তাঁর মুখে দু'পাটি দাঁতই ছিল বাঁধানো। আর আস্ত বেলের মত মাথা-জোড়া বিশাল টাক ঢাকতে তিনি আজীবন পরচুলা পরে এসেছেন। যাক্ সে কথা। রাণি প্রথম এলিজাবেথ মারা যাবার আগে একনাগাড়ে অনেক দিন আচ্ছন্ন অবস্থায় কাটিয়েছিলেন। অনেকের মুখেই শোনা যায় রানি আচ্ছন্ন অবস্থায় যখন দিন কাটাচ্ছেন সেই সময় তাঁর প্রেতায়িত অবয়বকে ঐ প্রাসাদের অলিন্দে আপন মনে পায়চারি করতে দেখা যেত। এ কাহিনী কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তা নিয়ে পরে স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্নের ঝড় উঠেছিল। তাছাড়া মৃত মানুষের প্রেতমূর্তি পৃথিবীর বহু মানুষ নিজের চোখে দেখেছে কিন্তু আচ্ছন্ন অবস্থায় জীবিত মানুষের প্রেতমূর্তি তার জীবিত দেহের কাছাকাছি পায়চারি করে বেড়াচ্ছে এমন দৃষ্টান্ত পরামনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কৌতূহলপ্রদ মনে হলেও বাস্তবে কেউ কোথাও ঘটতে দেখেছে বলে শোনা যায়নি।

রিপলি ক্যাসল্

সব দেশেরই যেমন আছে আলাদা আলাদা ভূতবৃন্দ, তেমনই আছে অগুনতি ভৌতিক দুর্গ, প্রাসাদ, আর হানাবাড়ি যাদের কথা এক জীবনে লিখে শেষ করা যাবে না। বিশেষতঃ সূক্ষ্ম ভৌতিক দেহ বা ভৌতিক কলম দু'টোয় একটাও যেখানে আমার হাতের নাগালে নেই, আর নেই ভূতের রাজার দেয়া বর বা অলৌকিক ক্ষমতা, অতএব ইংল্যাণ্ডের বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলে খুবই বিটকেলে ভুতুড়ে বলে যেসব দুর্গ আর প্রাসাদ বহুদিন ধরে লোকের মুখে মুখে কুখ্যাতি অর্জন করে আসছে যতদূর সম্ভব শুধু তাদের প্রসঙ্গই তুলে ধরব। এমনই এক জায়গা হল রিপলি ক্যাসল। ইয়র্কশায়ারে অবস্থিত এই পুরোনো প্রাসাদ দুর্গের সঙ্গেও এক বিটকেল ভুতুড়ে কুখ্যাতি জড়িয়ে আছে। দুর্গের ভেতরে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে সোজা ওপরে উঠে এলে চোখে পড়বে সিঁড়ি যেখানে শুরু হয়েছে ঠিক সেখানে দেয়ালে টাঙ্গানো এক 'নান' বা খ্রীষ্টান সন্ন্যাসিনীর পেল্লায় ছবি। স্থানীয় লোকেরা বলে বেড়ায় পর্যটক বা স্থানীয় সরকারি দপ্তরের লোকেরা রাত কাটাতে এলে নিশুতি রাতে ঐ সন্ন্যাসিনী দেহধারা করে নেমে আসেন ছবি থেকে, তারপর প্রাসাদের সবকটি শোবার ঘরের ভেজানো দরজার বাইরে থেকে মৃদু টোকা দেন। এও শোনা যায় ভেতর থেকে কেউ জেনেই হোক বা না জেনেই হোক ভেতরে আসতে বললে সেই সন্ন্যাসিনী সত্যিই দরজা ঠেলে ঢুকে পড়েন ভেতরে। তারপরে কি কি হয় সে বিষয়ে স্থানীয় লোকেরা হয় জানেনা নয়ত ধর্মীয় অবমাননার কথা ভেবে মুখ বুঁজে থাকে। সন্ন্যাসিনীর প্রেতমূর্তি নিশুতি রাতে অচেনা মানুষের শোবার ঘরের দরজায় টোকা দিচ্ছে, এহেন কেচ্ছার ঘটনাকে বিটকেল ভুতুড়ে ছাড়া আর কোনও বিশেষণে ভূষিত করা যায় বলে আমার জানা নেই।

ওয়ারউইকসায়ার

এই জেলার বিভিন্ন জায়গায় যেসব পরিত্যক্ত প্রাসাদ দুর্গ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাদেরই একটির নাম ব্যাডেসলি ক্লিন্টন। শত্রু আক্রমণ করলে এই প্রসাদ দুর্গে লুকোনোয় এত জায়গা আর বহুদূরে পালিয়ে যাবার এত চোরা-পথ এখানে আছে যা চোখে পড়লে যে কোন বিদেশী পর্যটককে অবাক হতে হয়। এছাড়া আছে দুর্গের চারদিক ঘিরে পরিখা ইচ্ছেমতন বাইরের খালের জল চালিয়ে যা কানায় কানায় ভরে ফেলা যায়। সন্দেহজনক ও অবাঞ্ছিত বিদেশীদের জলে ডুবিয়ে খুন করার এক শয়তানি পরিকল্পনা এখানে আছে তা হল প্রসাদেরই ভেতরের এক চলন পথ বাইরে থেকে দেখলে যার চেহারায় সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়ে না। কিন্তু এই চলন পথটিই এখানে ওখানে বাঁক নিতে নিতে শেষ হয়েছে পরিখার প্রান্তে। অতীতে প্রসাদরক্ষীরা তাদের প্রভুর নির্দেশে নির্দিষ্ট বিদেশী পুরুষ বা নারীকে কৌশলে ঢুকিয়ে দিত সেই চলনপথে, তারপর তাকে পায়ে হেঁটে শেষ প্রান্তে আসতে বাধ্য করত ; সেখানে পৌঁছোনোর পরে দরকার হত পেছন থেকে শুধু একটু মৃদু ধাক্কা যা সামলাতে না পেরে সেই হতভাগ্য বিদেশী পড়ে যেত কানায় কানায় ভরা পরিখার জলে। শুধু ঐভাবে জলে ফেলে

দিয়েই প্রাসাদের অধিপতি নিশ্চিন্ত হতেন না। শিকার জলে পড়লে প্রাসাদের ছাদ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুটে গিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে ফেলার ঢালাও আদেশও আগে থেকেই দিয়ে রাখতেন তিনি।

রাজা ষষ্ঠ হেনরির আমলে ওয়ার উইকশায়ারের ক্যাটেসবি জমিদার বংশ বহু টাকাকড়ি খরচ করে গড়ে তোলে ব্যাডেসলি ক্লিন্টন প্রাসাদদুর্গ, পরে তাঁদেরই এক বংশধর চরম আর্থিক বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচতে জন ব্রম নামে এক প্রতিষ্ঠিত উকিলকে তা বিক্রি করতে বাধ্য হয়। জন ব্রম কিন্তু ঐ সম্পত্তি খুব বেশিদিন ভোগ করতে পারেননি—একসময় কিছু বন্ধকি সম্পত্তি কিনেছিলেন তিনি, সেই সম্পত্তি নিয়ে পরে হার্টহিল নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে লণ্ডনে তাঁর বিরোধ বাধে ; এই বিরোধের পরিণতিতে লণ্ডনে হার্টহিলের ভাড়াটে গুণ্ডার হাতে খুন হলেন জন ব্রম। কিন্তু তাঁর মৃত্যুতেই কিন্তু ঘটনার শেষ হলনা ; জন ব্রমের ছেলে নিকোলাস 'বদলা' নেবার কসম খেয়েছিল। তিন বছর অপেক্ষা করার পর একদিন তার সময় এল, তার পাতা ফাঁদে অজান্তে পা দিল জন ব্রমের ভাড়াটে খুনি। পড়ে আর পুরোনো ঐতিহাসিক দলিলপত্র ঘেঁটে জানা যায় অপরাধীকে আইন রক্ষকদের হাতে তুলে দেবার বদলে তাকে বেধড়ক পিটিয়ে মেরে ফেলার শোচনীয় ঘটনা খোদ ইংল্যাণ্ডেও ঘটেছে। নিকোলাস নিজেও এই ফলই বেছে নিয়েছিল। বাপের খুনিকে এতদিন বাদে হাতের মুঠোয় পেয়ে সে তাকে এমন মার মারে যে লোকটি ঘটনাস্থলেই মারা যায়। নিকোলাস ব্রমের তরুণী স্ত্রীর ব্যভিচারিণী হিসেবে দুর্নাম ছিল। পারিবারিক গির্জায় যুবক পাদ্রির সঙ্গে তার গোপন প্রণয়ে লিপ্ত থাকার কথা ঠাঁই পেয়েছে ওয়ারউইকশায়ারের ইতিহাসে। স্ত্রীর বেচালের কথা জানতে পেরে তক্কে তক্কে রইল নিকোলাস। একদিন দু'জনের গোপন অভিসার পালা চলার সময় নিকোলাস আড়ালে দাঁড়িয়ে নিজে চোখে দেখল পাদ্রি তার বৌকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করছে। ঐ দৃশ্য দেখেই আগুন জ্বলে উঠল তার মাথায়, আড়াল থেকে হিংস্র চিতা বাঘের মত পাদ্রির ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা টিপে তাকে খুন করল সে। কিন্তু পাদ্রি খুনের এই ঘটনায় স্থানীয় যাজক সমাজ তার ওপর ক্ষুব্ধ হল, গির্জার ঐ সংস্কার ও নতুন নির্মাণের কাজে প্রচুর টাকা দান না করলে ঐ খুনেব কথা রাজার কানে তুলবে বলে আকারে ইঙ্গিতে ভয়ও দেখাল তারা। পাদ্রির লাশ নিকোলাস আগেই সসম্মানে কবর দিয়েছিল পারিবারিক গির্জায় লাগোয়া সমাধিক্ষেত্রে। স্থানীয় পাদ্রিদের হুমকিতে সে ঘাবড়ে গেল। নিকোলাস ভেবে দেখল পাদ্রি খুনের কথা রাজার কানে ঘটনাচক্রে উঠলে তাঁর হুকুমে কবর খুঁড়ে পাদ্রির গলিত লাশ উদ্ধার করা হবে। তদন্তে সেই লাশের দেহে যদি এমন কিছু পাওয়া যায় যা খুনি হিসেবে তাকে ইঙ্গিত করছে তখন রাজা ছেড়ে কথা কইবেন না, তাঁর হুকুমে জল্লাদ কুড়োলের এক কোপে তার মুণ্ডুখানা নামিয়ে দেবে ধড় থেকে। এসব ভেবে যে এবার আপোসের পথ বেছে নিল, পাদ্রিদের চাহিদা অনুযায়ী গির্জা সংস্কারের জন্য প্রচুর টাকা খরচ করল সে। একটা ছোট গির্জা তৈরিও করিয়ে দিল। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে মারা যায় নিকোলাস ব্রম। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ব্যাডেস্‌লি ক্লিন্টন প্রাসাদ দুর্গে যাঁরা অতিথি হয়ে এসেছেন তাঁদের অনেকেই দু'জন প্রেতাত্মার দর্শন পেয়ে ধন্য হয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে রাখি এই দু'জন প্রেতাত্মার একজন হলেন নিকোলাস ব্রমের হাতে নিহত তার স্ত্রীর গোপন প্রণয়ী সেই পাদ্রি যুবক, আর অন্যজন নিঃসন্দেহে নিকোলাস ব্রম স্বয়ং।

লিটল কোট

ম্যানর হাউস। নামটা শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে শিল্পীর আঁকা ছবিতে দেখা পুরোনো আমলের ইংল্যাণ্ডের জমিদারদের খামার বাড়ি, আর মনে পড়ে স্যর আর্থার কন্যান ডয়েলের লেখা হাড়-হিম করা বিখ্যাত উপন্যাস 'দ্য ভ্যালি অফ ফিয়ার'-এর নাম। ঐ উপন্যাসে বার্তি বার্লস্টোনের ম্যানর হাউস ডয়েলের কল্পনার ফসল সন্দেহ নেই, কিন্তু ইংল্যাণ্ডের গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত লিটল কোটের ম্যানর হাউসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে শিশু হত্যার এক বীভৎস পৈশাচিক সত্যি কাহিনী।

হাঙ্গারফোর্ড আর র‍্যাম্‌সবেরির মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত উইল্‌ট্‌শায়ারের বৃক্ষহীন উঁচু জমি, তার ঠিক নীচ দিয়ে বয়ে গেছে কেনেট নদের এক স্রোতধারা। তারই গা ঘেঁষা খাস জমিটি একাধারে উর্বর ও নয়নাভিরাম। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ঐ ঘাসজমিতে কস্টন পরিবারের জনৈক বংশধরের গড়ে তোলা ধূসর রঙের বিশাল ভবনটিই হল লিটন কোটের ম্যানর হাউস। কস্টন পরিবাবের একমাত্র উত্তরাধিকারিণীর সঙ্গে ইয়র্কশায়ারের আদি বাসিন্দা উইলিয়াম ডারেলের বিয়ে হয়। এই উইলিযামেরই অন্যতম বংশধর উইল ডারেলকে নিয়ে এই কাহিনী। স্থানীয় এলাকায় পুরোনো বাসিন্দাদের অনেকের মতে, একদা লিটল কোটের একচ্ছত্র অধীশ্বর পাষণ্ড উইল ডারেলের নৃশংসতার কাহিনী সবরকম পাশবিকতাকে ছাড়িয়ে যায় ; স্থানীয় সরকারি গেজেটেও ঐ বক্তব্যের সমর্থন চোখে পড়ে।

অনেকদিন আগের কথা। লিটল কোটের কাছেই গ্রেট সোম্বোর্ড গ্রাম, সেখানে থাকেন মিসেস বার্ণেস নামে এক পেশাদার ধাত্রী বা দাই। নিঃসন্তান মিসেস বার্ণেসের স্বামী মারা গেছেন বহুদিন হল। বাড়িতে তিনি একাই থাকেন। আশপাশের এলাকায গর্ভিণী মেয়েদের প্রসব বেদনা উঠলে তাঁর ডাক পড়ে। দাইদের কাজ করেই পেট চালান তিনি। শীতের মুখে এক ঝড় বৃষ্টির রাতে তাঁর বাড়ির দরজায় ঘা পড়ল। মিসেস বার্ণেস তার কিছুক্ষণ আগে রাতের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়েছেন। দোর খুলে দেখেন উইল ডারেলের দু'জন পেয়াদা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে। তিনি কোনও প্রশ্ন করার আগেই তারা জানাল চার্লটনের লেডি নাইভেট লিটল কোটে অতিথি হয়েছেন। তিনি গর্ভবতী, সন্ধ্যের পর থেকেই প্রসব যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। তাদের প্রভু উইল ডারেলের ইচ্ছে মিসেস বার্ণেস গিয়ে তাঁর সন্তান প্রসবের ব্যবস্থা করেন তাই তারা গাড়ি নিয়ে এসেছে তাঁকে নিয়ে যেতে। পেয়াদারা এও বলল যে ঝড় জলের রাত তাই মিসেস বার্ণেস যে পারিশ্রমিক চাইবেন তাদের মনিব তাই দেবেন।

উইল ডারেলের নাম শুনে ভয়ে মিসেস বার্ণেসের বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। গর্ভবতী নারীর গর্ভযন্ত্রণার কথা শুনে তাকে প্রসব করানোর যে কর্তব্যবোধ খানিক আগে জেগেছিল ঐ নাম শুনেই তা পড়ল ঝিমিয়ে। মিসেস বার্ণেস একবার ভাবলেন যাবেন না। পরক্ষণেই বুঝতে পারলেন তিনি না গেলে উইল ডারেল তাঁকে শান্তিতে এ গাঁয়ে তিষ্টোতে দেবে না। হয়ত পাইক বরকন্দাজ পাঠিয়ে তাঁকে গ্রাম থেকে মেরে তাড়িয়ে তাঁর বাড়ি দখল করবে, নয়ত খাজনা বাকী পড়ার মিথ্যে মামলা রুজু করবে আদালতে। শয়তানের সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা যখন নেই

তখন তার নির্দেশ মেনে চলা ছাড়া উপায় কি? এসব কথা ভেবে তিনি মনকে শক্ত করলেন। প্রসব করানোর সরঞ্জাম নিয়ে বাইরে এসে দরজায় তালা আঁটিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পেয়াদাদের একজন রুমাল দিয়ে তাঁর দু'হাত পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল। দ্বিতীয় জন নিজের রুমাল বের করে বাঁধল তার দু'চোখ। কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তারা মিসেস বার্ণেসকে ধরে ধরে এনে বসিয়ে দিল গাড়িতে, প্রসবের সরঞ্জামের ঝোলা রাখল তাঁর কোলের ওপর। এরপর চাবুকের আওয়াজ হাতেই ঘোড়া ছুটতে শুরু করল। গাড়ি চলতেই মিসেস বার্ণেস তাঁর চোখ আর হাতের বাঁধন খুলে দিতে বললেন, সেকথা শুনে পেয়াদা দু'জন হেসে বলল তারা তাদের মনিবের হুকুম মত কাজ করেছে, যথাস্থানে পৌঁছোনার পড়ে তাঁর বাঁধন খুলে দেওয়া হবে। মিসেস বার্ণেস এরপর বললেন বাঁধন খুলে না দিলে তিনি চেঁচিয়ে লোক জড়ো করবেন। তাঁর হুমকিতে পেয়াদারা এতটুকু ভয় পেলনা, উল্টে তাঁর গলায় ছুরির ধারালো ফলা ঠেকিয়ে বলল ইচ্ছে করলে তিনি যতখুশি চেঁচাতে পারেন কিন্তু তাতে তাঁর কোনও লাভ হবে না ; লোকজন ছুটে এসে দেখবে পথের মাঝে পড়ে আছে তাঁর গলাকাটা লাশ। এবার মিসেস বার্ণেস সত্যিই ভয় পেলেন। আব কথা না বাড়িয়ে গোটা পথ নিজেকে ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়ে মুখ বুঁজে রইলেন। গাড়ি ছুটতে লাগল ঝড় জলের ভেতর। তুমুল ঝড়বৃষ্টির মাঝে থেকে চাবুকের সাঁই সাঁই আওয়াজ আর ঘোড়া দু'টোর হ্রেষাধ্বনি তাঁর কানে বিঁধতে লাগল। খানিক দূর যাবার পরে চোখ বাঁধা অবস্থাতেও মিসেস বার্ণেস টের পেলেন এ তাঁর চেনা পথ নয়। তাঁকে নিয়ে গাড়ি ছুটছে অন্য পথে। আর কিছুক্ষণ বাদে একসময় ঘণ্টা বাজিয়ে গাড়ি থেমে গেল। চোখ আর হাতের বাঁধন খুলে পেয়াদারা লণ্ঠন তুলে ধরল, সেই আলোয় তিনি নেমে এলেন। লণ্ঠনের ম্লান আলোয মিসেস বার্ণেস লক্ষ্য করলেন এক বিশাল অট্টালিকার গাড়ি বারান্দায় তিনি দাঁড়িয়ে, কিন্তু এ তাঁর চেনা লিটলকোটের জমিদারের পুরোনো খামার বাড়ি না। এ বাড়ি তিনি আগে দেখেন নি, এমন কি বাড়ির আশেপাশের জায়গাও তাঁর অচেনা ঠেকল। পেয়াদাদের একজন ততক্ষণে এগিয়ে এসে কলিংবেলের দড়ি টেনে ঘন্টা বাজিয়ে দিল। খানিক বাদে গম্ভীর থমথমে মুখ এক মাঝবয়সী কাজের মেয়ে নেমে এল ওপর থেকে। শুকনো অভিবাদন জানিয়ে মিসেস বার্ণেসকে তার পেছন পেছন যেতে বলল। সেই মাঝবয়সী কাজের মেয়ের পেছন পেছন মিসেস বার্ণেস সিঁড়ির অনেকগুলো ধাপ পেরিয়ে উঠে এলেন বাড়ির দোতলায়। এরপর মেয়েটি তাঁকে নিয়ে এল অন্দরমহলে। সেখানে পৌঁছে মিসেস বার্ণেস দেখলেন ঘরের এককোণে দামি পাথর বাঁধানো ফায়ারপ্লেসে কাঠের লকড়ির আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে, সেই আগুনের তাপে ঘরের ভেতরটা বেশ গরম হয়ে উঠেছে। তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে তার কাছেই সুসজ্জিত পেল্লায় জোড়া খাট। সেই খাটে নরম গদির ওপর শুয়ে আছে মুখে মুখোস আঁটা এক নারী। প্রসব বেদনায় ছটফট করছে সে। মুখে মুখোস আঁটা সত্ত্বেও মেয়েটি যে সদ্য যুবতী সে বিষয়ে তাঁর মনে কোনও সন্দেহ রইল না। মিসেস বার্ণেস দাঁড়িয়ে না থেকে কাজে হাত দিলেন। তাঁর নির্দেশে সেই মাঝবয়সী কাজের মেয়েটি এক গামলা গরম জল আর কিছু পরিষ্কার কাপড় এনে হাজির করল। মিসেস বার্ণেস অভিজ্ঞ দাই, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই নির্বিঘ্নে সেই মুখোসপরা মেয়েটির একটি সন্তান প্রসব করালেন তিনি। কিন্তু প্রসবের পরেই ঘটল বিঘ্ন—নাড়ি কেটে গামলার গরম জলে পরিষ্কার তোয়ালে ডুবিয়ে নবজাত শিশুর গা

মোছাচ্ছেন মিসেস বার্ণেস এমনই সময় চেঁচামেচি করতে করতে ঢুকল লিটল কোটের ত্রাস, জমিদার উইল ডারেল। পাতলা ছিপছিপে দেখতে ঐ যুবকের চোখের চাউনি আর হাবে ভাবে এমন নৃশংসতার ছাপ ফুটে বেরোচ্ছিল যা চোখে পড়তে মিসেস বার্ণেসের অন্তরাত্মা থরথর করে কেঁপে উঠল। ঘরে ঢুকেই বিছানার কাছে এসে দাঁড়াল উইল ডারেল। প্রসূতিকে একনজর দেখার পরেই তাঁর দিকে তাকাল সে। পরমুহূর্তে এগিয়ে এসে সে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। তিনি কিছু আঁচ করার আগেই সে তাঁর কোলে শোয়ানো সেই শিশুর একটি পা শক্ত মুঠোয় চেপে তুলে ফেলল, তারপর কোনও ভাবনা চিন্তা না করে তাকে ঢুকিয়ে ছিল ফায়ারপ্লেসের জ্বলন্ত আগুনের ভেতর, জুতো পরা পায়ে সেই শিশুকে সে চেপে ধরল জ্বলন্ত লকড়ির সঙ্গে। চামড়া আর মাংস পোড়া গন্ধ গোটা বাঁড়িতে ছড়িয়ে পড়ল। মিসেস বার্ণেসের চোখের সামনে নবজাত শিশুটি ধীরে ধীরে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। শিশুটির পোড়া ছাইয়ের দিকে তাকিয়ে উন্মাদের মত হাসতে হাসতে পাষণ্ড উইল ডারেল বেরিয়ে গেল ঘর থেকে ; বিছানার ওপর মুখে মুখোস আঁটা হতভাগিনী যুবতী জানতেও পারল না পাষণ্ড ডারেল কি নির্মম ভাবে তার নবজাত সন্তানকে ঘরের ভেতর পুড়িয়ে মারল।

উইল ডারেল যতই পাষণ্ড হোন, আসলে তিনি স্থানীয় জমিদার। তাঁদের রক্ষাকর্তা। তাঁর কাজ হাজার নিষ্ঠুর বা নিন্দনীয় হোক না কেন তা সয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। আর মিসেস বার্ণেস ত পেশাদার দাই। সন্তান প্রসব করানোর পরে তার বাঁচা মরার ব্যাপারে তাঁর মাথা ব্যথা হবার কথা নয়। কিন্তু চোখের সামনে ঘটে যাওয়া শিশু-মেধের ঐ নির্মম নজির কুরে কুরে খাচ্ছিল তাঁকে। এর বিরুদ্ধে কিছু একটা করার জন্য ছটফটিয়ে উঠছেন তিনি। কি মনে হতে ঝোলা থেকে একখানা ছোট কাঁচি বের করলেন তিনি। আশেপাশে কেউ দেখছে না দেখে তিনি ঐ কাঁচি বাগিয়ে এগিয়ে এলেন। গদির ওপর যে বাহারি চাদরে মুখোস আঁটা যুবতী শুয়েছিল তার একটি কোণ সেই কাঁচি দিয়ে কেটে ঝোলায় পুরলেন। খানিক বাদে সেই মাঝবয়সী কাজের মেয়েটি ভেতরে ঢুকে মোটা অংশের পারিশ্রমিক গুঁজে দিল তাঁর হাতে, তারপর তাঁকে নিয়ে এল নিচে। ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, মিসেস বার্ণেসকে তুলে দেবার সময় সেই কাজের মেয়েটি তাঁর কানের কাছে মুখ এনে চুপিচুপি এই বলে হুঁশিয়ার করল যে এখানকার ঘটনার সাক্ষি হবার জন্য জমিদার পারিশ্রমিক ছাড়াও বাড়তি কিছু দিয়েছেন। কাজেই এ-ঘটনা যেন দ্বিতীয় কারও কানে না ওঠে। এ-ব্যাপার পাঁচ কান হলে তার ধড়ের ওপর মাথাখানা আর থাকবে না।

এই নির্মম ঘটনা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু পরবর্তীকালে জানা গেছে মিসেস বার্ণেস মারা যাবার আগে মিঃ ব্রিজেস নামে গ্রেট সোফোর্ডের এক ম্যাজিসট্রেটের কাছে তাঁর নিজের চোখে দেখা ঐ পাশবিক ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিয়েছিলেন। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি তারিখে লংলিটের জমিদার ও সরকারি প্রশাসক স্যার জন থাইনকে লেখা চার্লটিনে, জমিদার স্যার এইচ নাইভেটের এক চিঠি পড়ে জানা যায় মিঃ বনহ্যাম নামে লংলিটের জনৈক বাসিন্দার আপন বোন ছিল লিটলকোটের জমিদার উইল ডারেলের রক্ষিতা, প্রচুর টাকাকড়ি খরচ করে সেই রক্ষিতায় থাকার জন্য আলাদা বাড়ি তৈরি করিয়ে দিয়েছিল উইল ডারেল। ঐ চিঠিতে স্যর নাইভেট মিঃ বনহ্যামের কাছে খোলাখুলিভাবে জানতে

চেয়েছিলেন উইল ডায়েলের সংসর্গে এসে তাঁর বোন মোট ক'টি সন্তানের জন্ম দিয়েছে এবং সেই সন্তানদের ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত কি ঘটেছে। মিসেস বার্ণেসের জবানবন্দি আর স্যর নাইভেটের লেখা ঐ চিঠির ভিত্তিতে মিঃ ব্রিজেস নামে এক ম্যাজিসট্রেট সরকারি শাসন পাঠিয়ে উইল ডারেলের বিরুদ্ধে তদন্তের আদেশ দেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার ঐ ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছেই মিসেস বর্ণেস তাঁর নিজের চোখে দেখা উইল ডায়েলের শিশুমেধের সেই পৈশাচিক ঘটনার বিবৃতি দিয়েছিলেন এবং সেই প্রসঙ্গে মুখে মুখোস আঁটা যুবতীর বিছানায় চাদরের কেটে নেয়া টুকরোটিও তিনি ঐ ঘটনার প্রমাণ হিসেবে তুলে দিয়েছিলেন তাঁর হাতে। গোয়েন্দারা তদন্ত করতে গিয়ে যে অট্টালিকায় ঐ পৈশাচিক ঘটনা ঘটেছিল সেখানে গিয়ে হাজির হন এবং দোতলার যে ঘরের বর্ণনা মিসেস বার্ণেস তাঁর জবানবন্দিতে দিয়েছিলেন যেখানে ঢুকে খানাতল্লাশি চালিয়ে একটি পুরোনো বিছানার চাদরের হদিশ পান যার একদিকের কোণ কাটা। চাদরটি তাঁরা আদালতে পেশ করার পরে আসামি উইল ডায়েলস তা তার রক্ষিতার ব্যবহৃত বিছানার চাদর বলে সনাক্ত করে এবং মিসেস বার্ণেসের কেটে নেওয়া টুকরোটি ঐ চাদরের সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খেয়ে যায়। এছাড়া বিচারকের আদেশে সেই অন্দরমহলের ফায়ারপ্লেসের পুরোনো ছাই ঘাঁটাঘাঁটি করার সময় কোনও এক শিশুর কোমরের এক টুকরো হাড়ও গোয়েন্দারা খুঁজে পান। এইসব প্রত্যক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে উইল ডারেল যে সত্যিই একটি নবজাত শিশুকে ফায়ারপ্লেসের আগুনে পুড়িয়ে মেরেছিল যে বিষয়ে বিচারক নিঃসন্দেহে হল এবং পরের দিন দণ্ড ঘোষণা করবেন বলে সেদিনের মত আদালতের কাজ মুলতুবি ঘোষণা করেন। উইল ডারেল তার সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি কাজে লাগিয়ে জামিনে যুক্ত ছিল। কিন্তু পরদিন বিচারক যে তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করবেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না তার মনে।

কিন্তু জল্লাদের হাতে ফাঁসির দড়ি উইল ডারেলকে শেষ পর্যন্ত গলায় পরতে হলনা। তার আগেই যে দন্ড অপ্রত্যাশিত ভাবে নিয়ে এল ওপরের দূত। বিচারের শেষ দিন আদালত থেকে বাড়ি ফিরতে উইলের অনেক হার হল। আদালতের আঙ্গিনা থেকে বেরোতে না বেরোতে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির মধ্যে পড়ল সে। পোষা ঘোড়ার পিঠে চেপে বাড়ি ফিরছিল উইল, মাঝপথে ঘটল এক অভাবিত ঘটনা। লিটল কোটের খামার বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছোতেই যেন জাদুবলে পথের পাশের এক গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ল একটি শিশু, এক নজর দেখলেই বোঝা যায় যে অল্প কিছুক্ষণ আগে ভুমিষ্ট হয়েছে। অবাক হয়ে উইল দেখল সেই শিশুর মাথা থেকে পা পর্যন্ত দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। সেই ভয়ানক দৃশ্য দেখে উইলের পোষা ঘোড়া ভয়ে পিছপা হল। টাল সামলাতে না পেরে উইল ডারেল তার পিঠ থেকে ছিটকে পড়ল মাটিতে, আর সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ভেঙ্গে মারা গেল সে। ফাঁসির দড়ি থেকে বাঁচলেও মহাকালের নির্মম বিচারের হাত থেকে রক্ষা পেল না নরপিশাচ উইল ডারেল। কিন্তু মরেও সে হতচ্ছাড়ার শান্তি হয়নি, আজও লিটল কোটের খামার বাড়ির আশেপাশে গভীর রাতে দেখা যায় ছুটন্ত ঘোড়ার পিট চাবুক হাতে বসে আছে উইল ডারেলের প্রেতাত্মা।

উইল ডারেলের পাশবিক শিশুহত্যা আর তার নিজের ভয়ানক পরিণতির পাশাপাশি এই দুটো ঘটনা তাকে এমন বিখ্যাত করল যা ভাবা যায় না। খবরের কাগজে আর পর্যটকদের লেখা ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিটল কোটের ইতিহাস পড়ে সাধারণ লোকের কৌতূহল দিনে দিনে বেড়েই

চলল। দেশ বিদেশ থেকে বেড়াতে আসা মানুষের ভিড় উপছে পড়তে লাগল লিটল কোটের খামার বাড়িতে। যে বিছানার চাদরের কোণ কেটে নিয়েছিলেন মিসেস বার্ণেস তাই হয়ে দাঁড়াল এক বিশেষ দ্রষ্টব্য। সবার আবদার মেটাতে গিয়ে লিটল কোটের পরবর্তীকালের মালিক জেনারেল লিবোর্ণ পপহ্যাম অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। রেগেমেগে তিনি একদিন যেই চাদরখানা আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে ছাই করে ফেললেন। ১৮৪৩-এ জেনারেল পপ হ্যামের মৃত্যুর পরে উইল ডারেল আর তার পরিবারের যাবতীয় ব্যবহৃত সামগ্রী সমেত লিটলকোট বিক্রি হয়ে যায়।

কিন্তু লিটলকোট বিক্রি হবার পরেও তার শেষ মালিকের বংশোদ্ভূতদের ওপর উইলি ডারেলের প্রেতাত্মার অশুভ প্রভাব নেমে এসেছিল। জেনারাল পপহ্যাম মারা যাবার আঠারো বছর পরের ঘটনা। লিটলকোট তখনও বিক্রি হয় নি। পপহ্যাম বংশের লোকেরা বহাল তবিয়তে সেখানে দিন কাটাচ্ছে। এমনই সময় জেনারেল পপহ্যামের এক নাতি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। এরই মাঝে ছেলেকে নার্সের হেপাজতে রেখে তার বাবা মা গেলেন বেড়াতে। ডাক্তারের চিকিৎসা বা নার্সের পরিচর্যার কোন কিছুরই ত্রুটি হচ্ছে না। তবু কেন কে জানে ছেলেটির অসুখ বাড়াবাড়ি পর্যায়ে গিয়ে ঠেকল। ঘাবড়ে গিয়ে নার্স রোগীর বাবা মাকে অবিলম্বে ফিরে আসার অনুরোধ করে টেলিগ্রাম পাঠালেন। পরদিন রাতের বেলায় হালকা কিছু খেয়ে ওষুধ খেয়ে ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়েছে, হালকা স্যুপ খেয়ে আর্মচেয়ারে ঠেস দিয়ে নার্স মন দিয়ে গল্পের বই পড়ছে এমন সময় কাছেই ঘোড়ার গাড়ির আওয়াজ কানে আসতে চমকে উঠল সে। বারান্দায় এসে সে দেখল একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে থামল নীচের গাড়ি বারান্দায়। নার্স ভাবল হয়ত তার পাঠানো টেলিগ্রাম পেয়ে রোগীর বাবা মা ফিরে এসেছেন। কথাটা ভেবেই নিজের ভুল বুঝতে পারল নার্স, রোগীর বাবা মা যেখানে বেড়াতে গেছেন জরুরি টেলিগ্রাম সেখানে পৌঁছোলেও এত তাড়াতাড়ি সেখান থেকে ফেরা যায় না বুঝতে পারল সে। বারান্দা থেকে রোগীর ঘরে ফিরে এসে চেয়ারে বসতেই গাড়ি বারান্দায় কলিংবেলের ঘন্টা সশব্দে বেজে উঠল। আবার নার্সের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হল, এত রাতে কে আসতে পারে এই প্রশ্ন দেখা দিল মনে। মিনিটের পর মিনিট কাটতে লাগল কিন্তু কেউ আর ওপরে উঠে আসে না। সিঁড়িতে কারও পায়ের আওয়াজও হল না। সে রাতেই নার্সের চোখের সামনে পপহ্যাম পরিবারের সেই বংশধর ছেলেটি মারা গেল। পরদিন সকালে নার্স লক্ষ্য করল মৃত ছেলেটির দু'চোখ যেন কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে ; যেন মারা যাবার আগে ভয়ানক কিছু দেখেছিল সে। ছেলেটির বাবা মাও কি সেদিনই ফিরে এলেন। কিন্তু ছেলেকে জীবন্ত অবস্থায় আর তাঁদের দেখা হল না। ছেলের সৎকার করার কিছুদিন পরে তার বাবা মিঃ ফ্রান্সিস পপহ্যাম পুরোনো আমলের সিন্দুক ঘাঁটতে ঘাঁটতে এক পুরোনো পাণ্ডুলিপি খুঁজে পান। কৌতূহলী হয়ে সেই পাণ্ডুলিপি তিনি খুঁটিয়ে পড়তে শুরু করেন। কিন্তু খানিক বাদে এক জায়গায় এসে থেমে যান। মিঃ পপহ্যাম দেখলেন তাঁর জনৈক পূর্বপুরুষের লেখা ঐ পাণ্ডুলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে ঐ বাড়ির যে কোন বাসিন্দার মারা যাবার আগে উইল ডারেলের আত্মা ঘোড়া গাড়ি চালিয়ে এসে হাজির হয়। মৃতের আত্মাকে ঘন্টা বাজিয়ে পরলোকে নিয়ে যায় সে। ঐটুকু পড়েই চমকে উঠলেন মিঃ ফ্রান্সিস পপহ্যাম। তাঁদের

অনুপস্থিতিতে ক'দিন আগে এক রাতে একটি রহস্যময় ঘোড়ার গাড়ি এসে নীচের গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। এ খবর নার্সের মুখ থেকেই শুনেছেন তিনি, একতলার ঘন্টা খুব জোরে বেজে ওঠার পরেও নার্স কাউকে ওপরে উঠে আসতে দেখেনি তাও শুনেছেন। তাহলে এই পাণ্ডুলিপির বিবরণ অনুযায়ী উইলি ডারেনের প্রেতাত্মাই কি সে রাতে ঘোড়ার গাড়ি চালিয়ে তাঁর বাড়িতে এসে জুটেছিল। ছেলেকে নিয়ে যাবার আগে সেই-কি ঘন্টা বাজিয়েছিল। এসব প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই জাগল তাঁর মনে।

পপহ্যাম পরিবার লিটলকোটের খামার বাড়ি বেশিদিন নিজেদের দখলে রাখতে পারেনি। মিঃ ফ্রান্সিস পপহ্যামেব কাছ থেকে ঐ বাড়ি কিনে নেন সিটি ইকুইটেবল অ্যাসিওরেন্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টার গেরার্ড লিবিভান। কিন্তু ঐ সম্পত্তি কেনার কিছুদিন পরেই পুলিশ আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে লিবিভানকে গ্রেপ্তার কবে, বিচারে তাঁর সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। উইল ডারেল অতৃপ্ত আত্মার কোপে পড়েই তাঁর এই পরিণতি ঘটেছে ভূতবিশ্বাসী যে কেউ এক কথায় এই সিদ্ধান্তে সায় দেবেন তাতে দ্বিমত নেই।

কতেসলি ক্রিন্টন

ওয়ারউইক ক্যাসল

অ্যাভন নদীর নাম শুনলেই কালজয়ী ইংরাজ নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের কথা মনে আসা খুব স্বাভাবিক। অ্যাভন নদীর তীরে তাঁর বাড়িটি দেখতে দেশ বিদেশ থেকে অসংখ্য মানুষ রোজ আসে সেখানে।

এই অ্যাভন নদীর ধারে মধ্যযুগে গড়ে উঠেছিল এক ইতিহাস বিখ্যাত প্রাসাদ দুর্গ ওয়ারউইক ক্যাসল। অ্যাংলো স্যাক্সনদের আমলে ডেনদের আক্রমণ রুখতে মহান নৃপতি অ্যালফ্রেড দ্য গ্রেটের এক মেয়ে আনুমানিক ৯১৬ খ্রীস্টাব্দে ঐ প্রাসাদ দুর্গ গড়ার কাজে হাত দেন, সেই কাজ তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে চতুর্দশ খ্রীস্টাব্দে শেষ হয়। ওয়ারউইক ক্যাসল পরে কারা-দুর্গ হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়। রাজদ্রোহী সন্দেহে সমাজের উঁচু নীচু স্তরের অনেক নারী ও পুরুষকে রাজার আদেশে গ্রেপ্তার করে এখানকার বিভিন্ন টাওয়ার বা বুরুজে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিনা বিচারে আটকে রাখা হত। ঐ সময় যে অকথ্য পাশবিক নির্যাতন তাদের ওপর চালানো হত তা সহ্য করতে না পেরে বন্দিদের অনেকেই মারা যেত। ওয়ারউইক ক্যাসলের রক্ষী আর কর্মচারিদের অনেকই দুর্গ দেখতে আসা পর্যটকদের বলেন অতীতে কর্তৃপক্ষের নির্যাতন সইতে না পেরে মারা গেছে এমন অনেক নির্দোষ মানুষের অশরীরী আত্মাকে শৃংখলিত অবস্থায় দুর্গের ভেতরে ঘুরে বেড়াতে তাঁরা দেখেছেন। ঐ সব বিদেহী আত্মা পায়চারি করতে করতে চাপা গলায় প্রতিশোধ নেবার জন্য গর্জন করছে তাও তাঁরা শুনেছেন বলে দাবি করেন।

ক্লারেন্স টাওয়ার

সম্রাট তৃতীয় রিচার্ড ওয়ারউইক ক্যাসলে ক্লারেন্স টাওয়ার নামে একটি বুরুজ তৈরি করিয়েছিলেন। তাঁর এবং তাঁর পরবর্তী নৃপতিদের আমলেও অনেক নিরপরাধ মানুষকে রাজশত্রু বদনাম দিয়ে ঐ টাওয়ারে এসে খুন করিয়েছেন ক্ষমতাবান আমলারা। আজও একেকদিন গভীর রাতে সেইসব হতভাগ্যের বিদেহী আত্মাদের ক্লারেন্স টাওয়ারের আশেপাশে একা একা ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ওয়ারউইক ক্যাসলের নানা অংশ ভেঙ্গেচুরে যায়। সম্রাট প্রথম জেমস স্যার গ্রোভিল নামে এক স্থানীয় জমিদারকে রাজভক্তির পুরস্কার হিসেবে উপহার দেন ওয়ারউইক ক্যাসল। স্যার গ্রোবিল পরে তাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্যের হাতে খুন হন। যে ঘরে তিনি খুন হয়েছিলেন সেই ঘর থেকে আজও গভীর রাতে পুরুষ কণ্ঠের আর্তনাদ ভেসে আসে। এর আগে প্রাসাদের নিরাপত্তা রক্ষীরা সেই আর্তনাদ শুনে একাধিকবার ছুটে গেছে কিন্তু নির্দিষ্ট ঘরটিতে ঢুকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আর্তনাদের উৎসের হদিশ পায় নি তারা। উৎস বের করতে পারে নি তারা।

বীয়ার টাওয়ার

অতীতে আমাদের দেশের রাজা আর জমিদারেরা অবাধ্য প্রজা আর শত্রুদের পোষা সাপ, বাঘ নয়ত মানুষখেকো কুমিরের সামনে ফেলে দিতেন একথা গল্প উপন্যাসে অনেক পড়েছি।

ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় ওয়ারউইক ক্যাসলেও একসময় এই রেওয়াজ চালু ছিল। সেখানে হিংস্র ভালুকের খাঁচায় বাছাই বন্দীদের ফেলে দেয়া হত। এই প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে দুর্গের একটি বুরুজে খাঁচা তৈরি করে সেখানে হিংস্র ভালুক পোষা হত। এই ভাবেই কালক্রমে সেন্ট বুরুজের নামই হয়ে গেল বীয়ার টাওয়ার। বীয়ার টাওয়ারের আশেপাশে যেসব নিরাপত্তা রক্ষী পাহারা দেয় তাদের অনেকের কানেই আজও গভীর রাতে হিংস্র ভালুকের শিকার ধরার উল্লাস মেশানো গর্জন আর অসহায় মানুষের বুকফাটা আর্তনাদ ভেসে আসে।

ক্লিন্টন চার্চ

বিশাম অ্যাবি

অ্যাবি শব্দের অর্থ হল মঠ। ইংল্যাণ্ডে টেমস নদীর তীরে বার্কশায়ারের বিশাম অ্যাবি তেমনই এক মঠ খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাসের সঙ্গে যার নাড়ির যোগ আছে আর সেই কারণেই বর্তমানে ভূত প্রেতের আশ্রয়স্থল হবার গুণাবলী তার আছে। অতীতে 'ক্রুসেড' বা ধর্মযুদ্ধে রওনা হবার আগে ধর্মযোদ্ধারা এখানে ধর্মীয় শিক্ষা নিতেন। এছাড়া সম্ভ্রান্ত ধর্মযোদ্ধাদের মৃত্যুর পরে তাঁদের মৃতদেহ এই বিশাম অ্যাবি-র লাগোয়া সমাধিক্ষেত্রে কবর দেওয়া হত। এমনই এক সম্ভ্রান্ত ধর্মযোদ্ধা ছিলেন ওয়ারউইকের নেভিল যিনি রাজদরবারে প্রচণ্ড প্রভাব প্রতিপত্তিকে নিজের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে কাজে লাগানোর দরুন 'কিং মেকার' দুর্নাম অর্জন করেছিলেন। ১৪৭১-এ বার্ণেটের যুদ্ধক্ষেত্রে অনিবার্য পরাজয়ের মুহূর্তে নেভিল প্রান দেন। নেভিলের মৃতদেহ বিশাম অ্যাবিতে নিয়ে আসে তাঁর অনুচরবর্গ এবং লাগোয়া সমাধিক্ষেত্রে তাঁর মৃতদেহ তারাই কবর দেয়। কবর দেবার পরে বহুদিন পর্যন্ত আত্মাকে আবির্ভূত হতে দেখা গেছে ; যোদ্ধার বর্ম পরে নেভিলের আত্মাকে ঘোড়ার পিঠে চেপে সমাধিক্ষেত্রের আশেপাশে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে অনেকেই।

পরবর্তীকালে বিশাম অ্যাবি-র যথেষ্ট সংস্কার সাধন করা হয়েছে। সন্ন্যাসীদের থাকার জায়গাটুকু বাদে পুরোনো মঠ ভেঙ্গেচুরে গড়া হয়েছে নতুন করে। এই সংস্কার সাধনের ফলে বিশাম অ্যাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে এক 'আউটিং স্পট' বা ধারে কাছে বেরিয়ে আসার জায়গা। ছুটির দিনে বার্কসায়ার আর কাছাকাছি এলাকার যেসব মানুষ সপরিবারে নৌকোয় চেপে এখানে বেড়াতে আসে যোদ্ধা নেভিলের অতৃপ্ত আত্মা তাদের কাউকে দর্শন দিয়ে ধন্য করেছে কিনা তা কিন্তু জানা যায় নি। বিশাম অ্যাবি বা মঠের ধারে সন্ন্যাসীদের পুরোনো বাসভবনের গা ঘেঁষে দাঁড়ানো সাবেক আমলের বিশাল বাড়িটির ভৌতিক সংসর্গে জড়িত থাকায় অপবাদ আছে বলে জানা যায়। অতীতে ইংল্যাণ্ডের প্রবল প্রতাপশালী নৃপতি রাজা অষ্টম হেনরি তাঁর অসংখ্য স্ত্রীর অন্যতম অ্যানি অফ ক্লিভসকে ঐ বাড়িটি উপহার দেন। উপহার দিলে কি হবে। পুত্রসন্তানের জন্ম দিতে না পারার অপরাধে তিনি পরে অ্যানিকে আরও কয়েকজন রাণির মতন পরিত্যাগ করেন। পতি পরিত্যক্তা রাণি অ্যানির হাত থেকে একসময় ঐ বাড়ির মালিকানা বর্তায় হবি পরিবারের হাতে। ঐ পরিবারের অন্যতম পুরুষ স্যার টমাস হবি খুব অল্প বয়সে কূটনৈতিক কাজে যোগ্যতা দেখিয়ে ফ্রান্সে ইংল্যাণ্ডের রাজদূতের পদে নিযুক্ত হন। ১৫৬৬-তে ফ্রান্সে রাজদূতের পদে কার্যরত অবস্থায় স্যার টমাস হবি মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে মারা যান। স্বামির অকালমৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রী লেডি এলিজাবেথ হবি ১৫৭৪-এ দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন লর্ড জন রাসেলকে। লেডি এলিজাবেথ হবি-কে বিয়ে করার ঠিক দশ বছর বাদে ১৫৮৪-তে মারা যান লর্ড জন রাসেল। দ্বিতীয়বার বিধবা হবার পঁচিশ বছর পরে ১৬০৯-এ বার্ধক্যের দ্বারে পৌঁছে এলিজাবেথ যখন মারা যান তখন তাঁর বয়স একাশি। তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর প্রথম স্বামি স্যার টমাস হবির সমাধির পাশেই তাঁর মৃতদেহ কবর দেয়া হয়।

বাড়ির মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর রেওয়াজ সে যুগে কোনও দেশেই ছিল না। কিন্তু তারই মধ্যে লেখাপড়া শেখার আগ্রহ যাঁদের থাকত তাঁরা নিজেরাই পারিবারিক ও সামাজিক

প্রতিকূলতাব পাশ কাটিযে নিজেবা উদ্যোগী হযে সাধ্যমতন বিদ্যার্জন কবতেন এবং ছবি আঁকা সমেত যাবতীয ললিতকলাব পাঠ নিতেন। লেডি হবি নিজেও ছিলেন ঐ জাতেব মেযে, গ্রিক আব ল্যাটিন, দুটো ভাষাই তিনি ভালভাবে আযত্ত কবেছিলেন। এমনকি ঐ দুটি ভাষায তিনি পদ্যও লিখতেন। পাশাপাশি ধর্মচর্চাতেও তাঁব অনুবাগ প্রবল ছিল। খৃষ্ট্রীয ধর্মশাস্ত্রেব অনেক দুরূহ ব্যাখ্যাও তিনি লিপিবদ্ধ কবেছেন। কিন্তু লেডি হবিব একমাত্র সন্তান উইলিযাম তাব বিদূষী মাযেব মেধা পাযনি। সম্ভবত স্বাস্থ্যেব কাবণেই তাব বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল স্থূল ও ভোঁতা। সেইসঙ্গে সে ছিল ভযানক অপবিচ্ছন্ন। তাব পডাব বইখাতায বেশিব ভাগ পাতাই ছিল ছেঁডাখোঁডা নযত কালি ধ্যাবডানো। লেডি হবি বিদূষী মহিলা হলেও অল্পেই ভযানক বেগে যেতেন। নিজেব ছেলে হলেও নির্বোধ উইলিযামকে তাব অপবিচ্ছন্ন স্বভাবেব জন্য তিনি দু'চক্ষে দেখতে পাবতেন না, হাতেব কাছে পেলেই তিনি তাকে পিটিযে তক্তা বানাতেন। কিন্তু এমনই বেপবোযা ভাবে শাসন কবতে গিযে হিতে বিপবীত হল। একদিন বাগেব মাথায হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হযে বিদূষী লেডি হবি ছেলে উইলিযামকে এমন মাব মাবলেন যে বেচাবা শেষ পর্যন্ত মবেই গেল। এই ঘটনা ঘটেছিল তাঁব দ্বিতীয বিযেব কযেক বছব পবে। লেডি হবিব দ্বিতীয স্বামী লর্ড জন বাসেল এই ঘটনা জানতে জানতে পেবে খুবই মর্মাহত হন। একই সঙ্গে তিনি এই ভেবে ভীত হন যে পুত্র হত্যাব খবব বেশি জানাজানি হলে মুশকিল। পুলিশ এসে তাঁব রূপবতী বিদূষী ভার্যাব হাতে হাতকডা পবিযে নিযে গিযে হাজতে পুববে, তাবপব খুনি আসামি হিসেবে হাজিব কববে আদালতে। বিচাবক যে প্রাণদণ্ড ছাডা আব কোনও সাজা তাঁকে দেবেন না এ সম্পর্কে লর্ড বাসেল যেন নিঃসন্দেহ হলেন। স্ত্রীকে আইনেব হাত থেকে বাঁচাতে তিনি তাডাতাডি প্রচুব টাকাকডি খবচ কবে বাডিব যেসব কাজেব লোক খুনেব প্রত্যক্ষদর্শী ছিল তাদেব মুখ বন্ধ কবলেন। তাবপব পাবিবাবিক চিকিৎসককে সবকথা জানিযে একখানা ডেথ সার্টিফিকেট জোগাড কবলেন। ডাক্তাব ঐ সার্টিফিকেটে লিখলেন যে ছোটবেলা থেকেই উইলিযাম হৃদযন্ত্রেব জটিল অসুখে ভুগছিল। ঘুমেব ভেতব আচমকা হৃদযন্ত্রেব ক্রিযা বন্ধ হওযায তাব মৃত্যু ঘটেছে। এবপব আব কোনও চিন্তা বইল না। ঐ ডেথ সার্টিফিকেট হাতে পেযে লর্ড বাসেল আব দেবি কবলেন না। অনাডম্বব ভাবে সাত তাডাতাডি উইলিযামসেব মৃতদেহ কবব দিলেন। এই ঘটনাব পবে লেডি হবি বহু বছব জীবিত ছিলেন। তিনি মাবা যাবাব পবে তাঁব অতৃপ্ত আত্মাব আবির্ভাব ঘটতে শুরু হয। বাজহত্যাব চক্রান্তকাবী লেডি ম্যাকবেথেব মত তাঁব আত্মাও এমন ভাবে বাববাব হাত ধোবাব ভঙ্গি কবত যে সে দৃশ্য দেখে বাডিব কাজেব লোকেদেব মনে হত যেন হাত ধুযে কোনও সাংঘাতিক পাপেব ক্লেদ তিনি ধুযে ফেলতে চাইছেন। বাডিব কাজেব লোকেদেব বর্ণনা থেকে জানা যায লেডি হবিব অতৃপ্ত আত্মাব পবনে ধপধপে সাদা পোষাক থাকলেও তাঁব মুখ আব হাত দু'খানা দেখায ফিল্মেব নেগেটিভেব মত কালো। এই কালো দেখানোব পেছনে সন্তান হত্যাব অনুতাপেব দহন জ্বালা থাকতে পাবে বলে অনেক প্রেত বিশাবদ মনে কবেন। উইণ্ডসব ক্যাসালে হাতে আঁকা লেডি হবিব একটি ছবি কিছুদিন আগে পাওয়া গেছে। ঐ ছবি আঁকতে গিযে ফিলিপ তাঁর চোখেমুখে অপাব নিষ্ঠুবতা ছাডা এতটুকু কমনীয়তা আব লালিত্য ফুটিযে তোলেন নি, তাঁব হাসিটিও জান্তব বলে মনে হয।

আরও জানা গেছে লেডি হবির মৃত্যুর পরে তাঁর বাসভবন মেরামত করতে গিয়ে রাজমিস্ত্রিরা তাঁর শোবার ঘরে দেয়ালের এক ফাটলের ভেতব থেকে উইলিয়ামসের ব্যবহার কবা কিছু বইখাতা বের করেছে। ঐ সব বইখাতার প্রত্যেকটির মলাটে অপরিচ্ছন্ন হাতে উইলিয়ামসের নাম লেখা, খাতার ভেতরের পাতায় কালি ধ্যাবড়ানো। অনেক পাতায় অর্দ্ধেক ছেঁড়া, নয়ত দোমড়ানো। লেডি এলিজাবেথ হবি মারা যাবার পরে বিশাম হ্যাবির লাগোয়া ঐ অভিশপ্ত বাড়ি কিনে নেন স্যর এইচ দে ভ্যানসিটার্ট নীল। ঐ বাড়ির মালিকানা আজও আছে তাঁর বংশধরদের হাতে।

লেডি হবি

উডক্রফ্‌ট ক্যাসল

ভুতুড়ে প্রাসাদের ক্রমপর্যায়ে এবার পিটারবরোর উডক্রফ্‌ট ক্যাসল্‌। এই প্রাসাদ দুর্গের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইংল্যাণ্ডের গৃহযুদ্ধের এক ঘটনা। তখন রাজা প্রথম চার্লসের জমানা ; যার অপশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে ইংল্যাণ্ডের সংসদ। সংসদ সদস্য আর নিপীড়িত মানুষদের নিয়ে গড়া 'রাউণ্ডহেড' বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন অলিভার ক্রমওয়েল।

এখানে বলে রাখা দরকার 'ক্রুসেড' বা ধর্মযুদ্ধের কাল পেরিয়ে আসায় বহুদিনের পরেও মঠবাসী অনেক খৃষ্টান সন্ন্যাসী ও পাদ্রি অস্ত্রচালনার অভ্যাস বজায় রেখেছিলেন ক্রমওয়েলকে রুখতে। এমনই কিছু লড়াকু পাদ্রি একজোট হয়ে গড়ে তোলেন এক প্রতিরোধ বাহিনী। ডঃ মাইকেল হাডসন নামে এক বয়স্ক পাদ্রি হন এই বাহিনীর অধিনায়ক।

ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে বিদ্রোহী 'রাউণ্ডহেড' বাহিনী ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল হান্টিংডনশায়ারে রাজার অধিকারে সেখানে যা কিছু ছিল সব তছনছ করে তারা কেড়ে নিল সরকারি ভবন, প্রাসাদ দুর্গ, রাজার প্রমোদ ভবন, শস্যগোলা। তাদের সঙ্গে রাজার যেসব বাহিনী লড়তে এল তাদের একজনও প্রাণে বাঁচল না। পরিস্থিতি দেখে রাজার অনুগত পাদ্রি বাহিনীর অধিনায়ক ডঃ হাডসন প্রমাদ গুণলেন। গ্রামগঞ্জের জমিদার, জোতদার আর তালুকদারদের কাছ থেকে কিছু পাইক বরকন্দাজ নিয়ে এক বিশেষ বাহিনী গড়লেন তিনি। 'গেরিলা' শব্দটির উৎপত্তি যতদূর জানি তখনও হয়নি। না হলেও কিছু আসে যায় না কারণ ডঃ হাডসন হুবহু সেই কৌশলে অর্থাৎ বিশেষ বাহিনীর সাহায্যে আচমকা পেছন থেকে হানা দিয়ে ক্রমওয়েলের বাহিনীকে পর্যুদস্ত করার মতলব আঁটলেন। তাঁর এই কৌশলে শহরের বাইরে ছোটখাটো দু'একটি ঘাঁটি হাতছাড়া হল বটে, কিন্তু বিদ্রোহীরা তাতে এতটুকু দমল না। উল্টে ডঃ হাডসন সমেত তাঁর বিশেষ বরকন্দাজ কাহিনীকে দু'পাশ থেকে ঘিরে তারা এমন নাজেহাল করল শেষ পর্যন্ত দলবল নিয়ে ডঃ হাডসন উডক্রফ্‌ট ক্যাসল্‌-এ ঢুকে কিছুক্ষণের জন্য প্রাণ বাঁচালেন। ওদিকে বিদ্রোহীরা বসে নেই, দুষমণদের দুর্গে ঢুকিয়ে দেবার পরে দলপতির নির্দেশে তারা দু'টি দলে ভাগ হল—একদল চারপাশ থেকে দুর্গ ঘিরে রইল, আরেকদল ডঃ হাডসনকে তাঁর দলবল সমেত কচুকাটা করতে দুর্গের ভেতরে ঢোকার পথ খুঁজতে লাগল।

শেষকালে পাদ্রি বাহিনী আর বিশেষ বরকন্দাজ বাহিনীর চোখ এড়িয়ে জনা দশ বারেক দুঃসাহসী রাউণ্ডহেড সৈনিক গোপন পথে ঢুকে পড়ল দুর্গের ভেতরে। ডঃ হাডসনকে দেখতে পেয়ে দূর থেকে বল্লম আর তলোয়ার উঁচিয়ে তেড়ে এল তারা। বিদ্রোহীদের মুখে বুলি একটাই 'আমরা যুদ্ধবন্দী নেব না, ডঃ হাডসন আর তাঁর ফৌজের সবার মাথা চাই!'

বিদ্রোহীদের সঙ্গে ডঃ হাডসনের দেহরক্ষীরা কেউ এঁটে উঠতে পারল না। তাঁর চোখের সামনে তারা সবাই একে একে প্রাণ দিল। রাউণ্ডহেডরা যে সত্যিই তাঁর মাথা না নিয়ে স্থান ত্যাগ করবে না এ-বিষয়ে ততক্ষণে নিশ্চিত হলেন ডঃ হাডসন। কিন্তু তাই বলে ত বিনা লড়াইয়ে জীবন দেয়া যায় না। যতক্ষণ প্রাণ আছে লড়ে যাব। এই ভেবে ডঃ হাডসন এবার একাই তলোয়ার নিয়ে দুষমণের মুখোমুখি হলেন। সেরা তলোয়ারবাজ হিসেবে সে আমলে ডঃ

হাডসনের নাম ছিল। কিন্তু তাই বলে একা আর কতজনের সঙ্গে এঁটে ওঠা যায়। তবু ডঃ হাডসন একা সকাল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিদ্রোহীদের আক্রমণ প্রতিহত করলেন। কিন্তু তারাও হার মানার পাত্র নয়। পেছন থেকে বর্শা আর বল্লমের খোঁচা মেরে অস্থির করে ডঃ হাডসনকে তারা একসময় নিয়ে এল দুর্গের ছাতে। সেখানে আসার পরে সবাই চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল তাঁকে। লড়তে লড়তে ডঃ হাডসন বেশ বুঝতে পারলেন বিদ্রোহীদের হাতে তাঁর পরাজয় অনিবার্য। লড়তে লড়তেই তিনি আত্মসমর্পণের সুযোগ চাইলেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা সে সুযোগ দিতে রাজী হল না। তাদের মুখে এক কথা। রাজার জান বাঁচাতে যে হাতিয়ার ধরেছে তার প্রাণ তারা কখনোই বাঁচাবেনা। তাদের কথা শুনে ডঃ হাডসন দেখলেন শেষ পর্যন্ত মরতে যখন তাঁকে হবেই তখন লড়াই করে মরাই ভাল। নতুন উদ্যমে তিনি লড়াই শুরু করলেন।

সূর্য ডোবার মুখে বিদ্রোহীরা ডঃ হাডসনকে কোণঠাসা করে নিয়ে এল ছাতের এককোণে। আচমকা লাফিয়ে পিছু হটতে যেতেই তাঁর শরীর ছিটকে চলে গেল ছাতের বাইরে। তলোয়ার ফেলে দু'হাতে ন্যাড়া ছাতের আলসে চেপে অসহায় ভাবে ঝুলতে লাগলেন তিনি। বিদ্রোহীরা ছুটে এল। ডঃ হাডসনের দু'হাতের আঙ্গুলগুলোর ওপর সজোরে তলোয়ারের কোপ মারল তারা ; সেই আঘাতে তাঁর দু'হাতের আটটি আঙ্গুল কেটে পড়ে গেল। সেই সঙ্গে তিনি নিজেও পড়লেন নিচের পরিখার জলে। ডঃ হাডসনকে জলের ভেতর হাবুডুবু খেতে দেখে দৌড়ে এসে জলে নামল তারা, বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে জলের ভেতর তাঁকে বধ করল তারা। এরপর তলোয়ারের এক কোপে তাঁর মাথা কেটে ফেলল তারা। কাটা মাথা বর্শার আগায় বসিয়ে বিজয়োল্লাসে মেতে উঠল সবাই।

উডক্রফ্‌ট ক্যাসল-এর আশেপাশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে অনেক পর্যটক আসে। সূর্যাস্তের পরেও যারা থেকেছে তাদের অনেকের কানে এসেছে তলোয়ার যুদ্ধের কর্কশ ধাতব শব্দ। সেই সঙ্গে সমবেত গলায় "ধরো! মারো! জান নাও! বল্লম চালাও!" বলে কান ফাটানো চিৎকার। ভূত বিশ্বাসী আর ভূত বিলাসী অনেকে আবার সন্ধ্যের আলো আঁধারে উডক্রফ্‌ট ক্যাসল্‌-এর কাদাগোলা জলে ক্রমওয়েলের রাউণ্ডহেড বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় ডঃ হাডসনের খুন হবার দৃশ্যের পুনরাভিনয় দেখেছেন বলে দাবি করেন।

ইস্টবেরি পার্ক

ব্ল্যাণ্ডফোর্ডের কাছেই ইস্টবেরি পার্ক। সেকেলে ভূতের পাশাপাশি প্রাকৃতিক শোভা দেখার নেশাও সমানভাবে উপভোগ করেন এমন অনেক পর্যটক দেশ বিদেশ থেকে আসেন এখানে। পুরোনো জমিদারি আমলের ঐতিহ্য বিজড়িত এক বিশাল প্রাসাদ একসময় এখানে ছিল যাকে দেখলে আজ ভগ্নস্তূপ ছাড়া আর কিছুই মনে হয়না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে গড়ে ওঠা এই প্রাসাদের মালিক পরে হন আর্ল অফ টেম্পল। কিন্তু প্রাসাদের রক্ষণাবেক্ষণের খরচ চালানো এক-সময় তাঁর পক্ষে অসাধ্য হয়ে পড়ে। হিতাকাঙ্খীদের অনেকেই তাঁকে প্রাসাদ বিক্রি করার সদুপদেশ দেন। কিন্তু প্রাসাদের প্রতিটি ইঁট পাথরের সঙ্গে আর্ল ততদিনে এমন একাত্ম হয়ে উঠেছেন যে তা বিক্রি করতে কোনমতেই রাজি করানো যায় না তাঁকে। শেষকালে দু'দিক রক্ষা করতে তিনি এক লোভনীয় প্রস্তাব দেন। আর্ল অফ টেম্পল ঘোষনা করেন তাঁর ঐ প্রিয় প্রাসাদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যে নিতে পারবে তাকে তিনি শুধু বিনা ভাড়ায় ওখানে থাকতে দেবেন তাই নয়। সেই সঙ্গে বছরে নগদ দু'শো পাউণ্ড হাত খরচও দেবেন। অতীব লোভনীয় শোনালেও শেষ পর্যন্ত তাঁর এই প্রস্তাবে সায় দিতে কেউ এগিয়ে আসে নি ফলে তাঁর প্রাণের প্রিয় ঐ বিশাল প্রাসাদও দিনে দিনে এগিয়ে যেতে থাকে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে।

ভূত নয়, তাদেরও যে বাবা সেই শনি চেপেছিল আর্ল অফ টেম্পলের ঘাড়ে। আর্লের ভাঁড়ারের দায়িত্ব ছিল যে নায়েবের হাতে তার নাম ডগেট। বেঁচে থাকতে দু'পয়সা কামানোর জন্য এই লোকটি যে কত রকম অসদাচরণ আর প্রতারণা করেছে তা বলে শেষ করা যাবে না। অন্যদিকে, ইস্টবেরি প্রাসাদ তৈরির দায়িত্ব যে ঠিকাদারের হাতে ছিল লোক ঠকানোর কারবারে সেও ছিল সরেস। এই ব্যাপারটা জানার পরে যেন ভূত চেপেছিল ডগটের ঘাড়ে—লোক ঠকানোর প্রতিযোগিতায় সেই ঠিকাদারকে ছাপিয়ে যাবার ভূত। আর্লের অসহায় প্রজাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে তাদের সর্বস্ব লুটেপুটে এনেছে ডগেট প্রভুর খাজনা আদায়ের নাম করে। কিন্তু পরে হিসেব কষে দেখা গেছে সেই খাজনা সে জমা দেয় নি মনিবের তহবিলে। নিজের আখের গোছাতে ডগেট একসময় তার মনিব স্বয়ং আর্ল অফ টেম্পলকেও প্রতারণার মাধ্যমে সর্বস্বান্ত করে ছেড়েছে। সৌন্দর্য বিলাসী অপদার্থ জমিদার আর তাঁর দুরাচারী নায়েবের চরিত্র যে সব দেশের সামন্ততন্ত্রের ইতিহাস হাতড়ালে পাওয়া যায় তার জীবন্ত নজির আর্ল অফ টেম্পল আর তাঁর পাপিষ্ঠ নায়েব ডগেট তবে সময়ের বিচারের হাত থেকে ডগেট নিজে পার পায় নি, শেষজীবনে কৃতকর্মের জন্য তীব্র অনুশোচনা উন্মাদ করে তোলে তাকে। বিবেকের মুখোমুখি হতে না পেরে সবশেষে ডগেট পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করে।

ডগেট আত্মহত্যা করে বাঁচলেও প্রতিবেশীদের নতুন করে জ্বালাতে শুরু করল। আশেপাশের বাসিন্দাদের মুখে আজও শোনা যায় রাত বারোটার শেষ ঘন্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইস্টবেরি পার্ক আর প্রাসাদের ভগ্নস্তূপে যাবার মাঝখানে পথের ওপর যেন মাটি ফুঁড়ে এসে হাজির হয় একটি চারঘোড়ার গাড়ি, যে গাড়ির চারটি ঘোড়া আর গাড়োয়াল কারও ধড়ে মাথা নেই। সবাই কবন্ধ। ঐ সময় জমিদারি আমলের নায়েবের জাঁকালো পোষাক পরা কেউ যদি সেই গাড়ির

সামনে এসে হাজির হয় ত জানবেন সে ডগেটির ভূত না হয়েই যায় না। কবন্ধ গাড়োয়ান সে এসেছে আঁচ করে জানতে চায়, "কোনদিকে যাবেন, কত্তা?" ডগেটির ভূত সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, "সোজা বাড়ি।" বলেই গাড়িতে চেপে বসে, আর গাড়োয়ানের চাবুক খেয়ে কবন্ধ ঘোড়াগুলোও ছুটতে শুরু করে প্রাসাদের ভাঙ্গা ফটকের দিকে। গাড়ি থামতে ডগটের ভূত গাড়ি থেকে নেমে নায়েবি মেজাজে পা ফেলে ঢোকে নিজের মহলে, তার খানিক বাদে মহল থেকে ভেসে আসে পিস্তলের গুলির আওয়াজ মাত্র একবার। সেই আওয়াজ কানে যেতে প্রতিবেশীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, "ডগেট হতভাগার ভূত আত্মহত্যার নাটক করছে?"

এও শোনা যায় ডগেট ছিল খুবই সৌখিন মেজাজের লোক, বেঁচে থাকতে সে যুগের ফ্যাসান মেনে ঘোড়ায় চড়ার ব্রিচেস পরত সে ; আর সেই ব্রিচেসে আঁটা থাকত ক্যাটকেটে হলদে রং-এর দামি রেশমি ফিতে। আত্মহত্যা করার পরে ইস্টবেরির কাছেই অবস্থিত ট্যারান্ট গানভিল গির্জার ভূগর্ভস্থ সমাধি ভল্টে তার মৃতদেহের কফিন রেখে দেয়া হয়। আত্মহত্যা সময় ডগেটের পরনে ছিল তার প্রিয় হলদে রেশমি ফিতে আঁটা বাহারি ব্রিচেস। ১৮৪৫-এ ঐ গির্জা ভেঙ্গে নতুন করে গড়ার সময় রাজমিস্ত্রিদের নামতে হয়েছিল মাটির নিচের সমাধি ভল্টে। সেখানে মেরামতি করার সময় কি ভাবে ডগেটের কফিনটি খুলে যায়। রাজমিস্ত্রিরা অবাক হয়ে দ্যাখে কফিনের ভেতরে ডগেটের মৃতদেহ এতদিন বাদেও নিখুঁত রয়েছে তাতে এতটুকু পচন ধরেনি। তার পরনের ব্রিচেসে আঁটা হলদে রেশমি ফিতের টুকরোটাও এত তাজা দেখাচ্ছিল যেন সবে তা কেনা হয়েছে। ব্যাস! আর যায় কোথায়। রাজমিস্ত্রিরা সঙ্গে সঙ্গে ওপরে উঠে এসে রটিয়ে দিল মৃত্যুর পরে পাপিষ্ঠ ডগেট নিশ্চয়ই রক্তচোষা প্রেত হয়েছে, রোজ রাতে বাদুড় হয়ে সে কফিন থেকে বেরিয়ে আশপাশের বাড়িতে ঢোকে। তারপর ঘুমন্ত মানুষের রক্ত আকণ্ঠ পান করে আবার কফিনে এসে ঢোকে সূর্য ওঠার আগেই। আজকের দিনেও আমরা বিজ্ঞান ও সভ্যতার বড়াই করার পাশাপাশি যেখানে জীবন্ত মানুষের ডাইনিতে রূপান্তরিত হওয়া বিশ্বাস করি। সেখানে দেড়শো বছর আগে মরা মানুষের রক্ত চোষা বাদুড়ে রূপান্তরিত হবার ব্যাপার স্যাপার যে সে যুগের মানুষ আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করত তা বিতর্কের অবকাশ রাখে না ; আর তাই রাজমিস্ত্রিদের মুখে ঐ বিবরণ শুনে গির্জার পাদ্রিবৃন্দ যে তখনই নিচে নেমে এসেছিলেন এবং কবর দেবার এতদিন পরেও পাপিষ্ঠ ডগেটের মৃতদেহে পচন না ধরার বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান না করে ঘোড়সোপচারে সেন্ট মৃতদেহের ওপর খ্রীষ্টীয় রীতি মেনে 'এক্সঅরসিজম্' অর্থাৎ ঝাড়ফুঁকের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন, সে দৃশ্য সন্দেহাতীতভাবে ভেসে ওঠে মনের পর্দায়।

স্‌পেড্‌লিন্‌স টাওয়ার

ডামফ্রিস ফায়ারের লকারবি এলাকায় যে বহুকালের পুরোনো প্রাসাদ দুটি আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে তারই নাম 'স্‌পেড্‌লিন্‌স টাওয়ার।' রাজা দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে ঐ প্রাসাদদুর্গ ছিল অ্যাপলগার্থের ব্যারনেট সার অ্যালেকজাণ্ডার জার্ডিনের অধিকারে। পোর্টিয়ুস নামে এক স্থানীয় ময়দা কলের মালিক ছিল তাঁর প্রজা। একবার স্যার জার্ডিনের কানে খবর এল পোর্টিয়ুস তার নিজের ময়দা কলে আগুন লাগিয়েছে। খবর আদৌ সত্যি কিনা অথবা আগুন লাগলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কি এসব খোঁজ না নিয়ে স্যার জার্ডিন পাইক পাঠিয়ে পোর্টিয়ুসকে বেঁধে এনে হাজির করালেন, তারপর প্রাসাদের মাটির নীচে মদের পিপে রাখার 'সেলার' বা ভাঁড়ারে তাকে আটকে রাখার হুকুম দিলেন।

যে পাইক পোর্টিয়ুসকে বেঁধে এনেছিল মালিকের হুকুম তামিল করতে সেই এবারে তার বাঁধন খুলে দিয়ে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গেল প্রাসাদের নীচে। মদের পিপে রাখার ভাঁড়ারে তাকে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজার পাল্লা টেনে বন্ধ করে চাবি এঁটে দিল। ঐ চাবি থাকে স্যার জার্ডিনের কাছে। তাঁর কাছ থেকে চাবি নিয়ে পাইকেরা দু'বেলা ভাঁড়ারের দরজা খুলে খাবার আর জল দিয়ে আসে পোর্টিয়ুসকে।

এদিকে স্যার জার্ডিন পড়েছেন মহা মুশকিলে, পোর্টিয়ুসকে নিয়ে তিনি কি করবেন তা কিছুতেই ভেবে বের করতে পারছেন না। ময়দার কল নিজের হলেও তাতে আগুন লাগানো দণ্ডনীয় অপরাধ ঠিকই। কিন্তু সেই অপরাধে পোর্টিয়ুসকে আইন মোতাবেক সাজা দেবার ভাবনা তাঁর মাথায় একবারও আসে নি। স্যার জার্ডিন ভেবেছিলেন দিনকয়েক মাটির নীচের গুদাম ঘরে আটকে রাখলেই পোর্টিয়ুসের সব চর্বি ঝড়ে যাবে। সে তখন ছাড়া পাবার জন্য নিশ্চয়ই যে ক'জন পাইক তাকে খাবার দিতে যায় তাদের সামনে খুব কান্নাকাটি জুড়বে। পোর্টিয়ুসের কান্নাকাটির খবর পেলে তাকে ওপরে নিয়ে এসে আচ্ছা করে চাবুক মেরে ছেড়ে দেবেন।

কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটা ঘটে গেল অন্য রকম। পোর্টিয়ুস গুদামে পচে মরছে এইসময় জমিদারি সংক্রান্ত কিছু জরুরি কাজ হাতে নিয়ে স্যার জার্ডিন পাড়ি দিলেন স্কটল্যাণ্ডে। এডিনবরায় পৌঁছে জরুরি কাজকর্ম শেষ করার কিছুদিন বাদে আচমকা পোর্টিয়ুসের কথা তাঁর মনে পড়ল। আর মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভয়ে শিউরে উঠলেন। ভয় পাবার কারণ প্রাসাদ থেকে বেরোনোর সময় সব ক'টা ঘরের এমনকি মাটির নিচের সেই গুদাম ঘরের চাবিও তিনি ভুল করে নিয়ে এসেছেন। গুদামঘরের চাবির জোড়া প্রাসাদে নেই। তার মানে দাঁড়াচ্ছে তিনি প্রাসাদ ছেড়ে রওনা হবার পর থেকে বেচারা পোর্টিয়ুসের দানাপানি কিছুই জুটছে না। রোজ খাবার তৈরি করার পরেও তিনি ভুল করে চাবি নিয়ে চলে এসেছেন বলে সে খাবার তার কাছে পৌঁছে দেয়া যাচ্ছে না। অবিবেচকের মত এমন কাজ করার খবর তাঁর কোনও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী যদি রাজার কানে তোলেন তা হলে আর রক্ষে নেই। এক কলমের খোঁচায় রাজা মশাই জমিদারি কেড়ে ত নেবেনই, সেইসঙ্গে না খেয়ে আটক থাকতে কেমন লাগে সেই

অভিজ্ঞতা অর্জন করতে তাঁকে লম্বা মেয়াদের সাজা দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন চ্যাথাম নয়ত টাওয়ার অফ লণ্ডনের কারাগারে। হাতের কাজ শেষ করতে তখনও বাকি তাই আর দেরি না করে স্যার জার্ডিন তাঁর এক বিশ্বাসী কাজের লোকের হাতে সেই গুদামঘরের চাবি তিনি ফেরত পাঠালেন ইংল্যাণ্ডে। কিন্তু স্যার জার্ডিনের দুর্ভাগ্য চাবি নিয়ে সেই লোকটি ফিরে আসার আগেই খাদ্য আর জলের অভাবে মাটির নিচের মদের ভাঁড়ারে পটল তুলল আটক পোর্টিয়ুস। প্রাসাদে ফিরে এসে সেই কাজের লোকটি পোর্টিয়ুস মারা গেছে দেখে নিজের কর্তব্য স্থির করে ফেলল। প্রাসাদের পাইক বরকন্দাজদের সঙ্গে হাতে হাত লাগিয়ে সেই শুঁটকি বাসি মড়া গুদামঘর থেকে বের করে রাতারাতি স্থানীয় গির্জার সমাধিক্ষেত্রে কবর দিল। সেই সঙ্গে গির্জার ছোট বড় পাদ্রিদের ঝুলিতে মোটা টাকা গুঁজে দিয়ে ব্যাপারটা পুরো চেপে যেতে বলল।

ওদিকে জমিদারির কাজকর্ম সেরে ক'দিন বাদে স্যার জার্ডিন ফিরে এলেন দেশে, প্রাসাদে ফিরে পোর্টিয়ুসের মৃত্যু সংবাদ শুনে গুম্ হয়ে বসে রইলেন। তারপর যখন বাটলার অর্থাৎ খাস আর্দালির মুখে শুনলেন কাজের লোকেরা ছাড়া আর কেউ পোর্টিয়ুসের মৃত্যুর আসল কারণ জানতে পারে নি তখন তিনি আহ্লাদে আটখানা হয়ে তাদের সবাইকে ডেকে আলাদা ভাবে বখশিস দিলেন। কিন্তু খবর জানাজানি না হলেও সংকট ঘনিয়ে এল অন্যদিক থেকে। দেশে ফিরে আসার ক'দিন বাদে স্যার জার্ডিন খবর পেলেন পোর্টিয়ুসের ভূত এসে আস্তানা গেড়েছে যেখানে তাকে আটকে রাখা হয়েছিল প্রাসাদের মাটির নিচে সেই মদের ভাঁড়ারে, সেখানে ঘুলঘুলির পাশে বসে সে দিন রাত চিল্লাচ্ছে 'খাওয়া জোটে না, জল জোটে না! তোরা মোরে খেতে দে, নইলে ছেড়ে দে!' বলে। আর ভূতের যে চিৎকার কি যেমন তেমন চিৎকার? সে বুকফাটা আর্তনাদ কানে জেনে বুকের ভেতর হিম হয়ে আসে, কলজে থেমে যেতে চায় আপনা থেকে। দেহের সব রক্ত নেমে আসে শিরদাঁড়া বেয়ে। প্রাসাদের আশপাশের কমবয়সী বজ্জাত ছোঁড়াদের ভয় ডর বলে কিছু নেই, গুদামঘরের পেছনে পোড়ো জমিতে রোজ দল বেঁধে খেলতে আসে তারা। ভূতের চিৎকার শুনে মজা পায় তারা। ভূত যত চেল্লায়, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তত হাসতে থাকে তারা, হাততালি দিয়ে। অনেকের মন আবার নরম, ভূত বেচারা খেতে পায় না শুনে তারা গাঁয়ের রুটির কারখানা থেকে শুকনো বাসি পাঁউরুটি চেয়ে চিন্তে নিয়ে আসে। পাঁউরুটির শুকনো টুকরো টাকরা ঘুলঘুলি দিয়ে ছুঁড়ে দেয় ভেতরে। ভেতর থেকে শুকনো পাঁউরুটি চিবোনোর আওয়াজ ভেসে আসে কুড়মুড় কুড়মুড়। ভূত পাঁউরুটি চিবোচ্ছে বুঝতে পেরে বজ্জাত ছোঁড়াদের মজা আর ধরে না। হাততালি দিয়ে, নানারকম আওয়াজ করে ভূতকে খ্যাপায় তারা। ভূত সেসব শুনে রেগে ওঠে। ধরে ধরে সব ক'টার ঘাড় মটকে দেবে বলে হুম্‌কি দেয়। কিন্তু ভূতের হুম্‌কিতে ছোঁড়ারা ভয় পায় না। যে যার বাড়ির রান্নাঘর থেকে শুকনো পাঁউরুটি এনে টুকরো করে বেশি করে ছুঁড়ে দেয় গুদামের ঘুলঘুলি দিয়ে। ভূত একই ভাবে সেগুলো চিবোয় কুড়মুড় করে।

দিনরাত পোর্টিয়ুসের ভূতের চিৎকার শুনতে শুনতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন জমিদার স্যার জার্ডিন। ছোট ছোট ছেলেদের ছুঁড়ে দেয়া পাঁউরুটির টুকরো। ভূত কুড়মুড় করে চিবোয় শুনে তিনি ভাবলেন ভূতকে তুষ্ট করার হয়ত ঐ একটাই পথ খোলা আছে তাঁর সামনে। যেই ভাবা সেই কাজ—তাঁর হুকুমে প্রসাদে যত কাজের লোক আর পাইক বরকন্দাজ ছিল সবাই একেক

থলে বোঝাই শুকনো পাঁউরুটি এনে গুদামের ঘুলঘুলি দিয়ে টুকরো টুকরো ছুঁড়ে দিতে লাগল ভেতরে, পোর্টিয়ুসের ভূত সেগুলো খেল ঠিকই। তার শুকনো পাঁউরুটি চিবোনোর কুড়মুড় আওয়াজ নিজের কানে ঘুলঘুলির ওপারে দাঁড়িয়ে শুনতে পেলেন স্যার জার্ডিন। কিন্তু এত খেয়ে শান্ত হওয়া দূরে থাক, পোর্টিয়ুসের ভূতের খিদে গেল বেড়ে, সেই সঙ্গে তার চিল্লানোও আগের চেয়ে কয়েকগুণ বেড়ে গেল। মাসখানেক এই ভাবে চলল, প্রাসাদের ওপরতলায় বসে স্যার জার্ডিন বারবার দু'কানে তুলো গোঁজেন আর মাথার ব্যথা কমাতে তাঁর গিন্নি থেকে থেকে কপালে জলপট্টি দেন। শেষকালে গাঁয়ের প্রজারা এসে ধর্না দিল, সবার মুখে এক কথা—'কিছু একটা বিধান করুন হুজুর! আপনার পোষা ভূতের চিৎকারে আমাদের সবার নাড়ি ছাড়বার দফা হয়ে এল! গির্জার পাদ্রিকে ডাকিয়ে এনে যাহোক কিছু স্বস্ত্যয়ন করুন এবার নয়ত আমরা যাই কোথায় বলুন হুজুর মা বাপ?'

স্যার জার্ডিন ভেবে দেখলেন ব্যাপার সত্যিই গুরুতর। পেটপুরে খাইয়েও যখন ভূতব্যাটাকে তুষ্ট করা যাচ্ছে না তখন পাদ্রিকে ডাকিয়ে ঝাড়ফুঁক করে ব্যাটাকে ঝেঁটিয়ে গুদামঘর থেকে বিদেয় না করলেই নয়। প্রজাদের বসিয়ে আর্দালি পাঠিয়ে তিনি গির্জার বড় পাদ্রিকে ডাকিয়ে আনালেন। গুদামঘর থেকে ভূত ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে হবে শুনে বড় পাদ্রি হেসে বললেন, 'এ আর এমন কি কাজ, হুজুর' আপনি বিদেশে থাকতে ও ব্যাটার শুকনো বাসি মড়ার সৎকারের মন্তরও আমিই পড়িয়েছি। কিন্তু আজ যখন ওর আস্পর্দা এত বেড়েছে তখন আমিও দেখে নেব হুজুর! মন্তর পড়ে আমি একাই ওকে লোহিত সাগরের ওপারে পাঠিয়ে দিতে পারব, হুজুর! তবে হ্যাঁ, এ কাজে খরচ আছে, হুজুর! শুধু মন্তর পড়ে ভূতকে এতদূর খেদিয়ে দেয়া ত যে সে লোকের কম্মো নয়। তবে আপনি এই এলাকার জমিদার, মানী লোক, আপনার জমিতেই আমাদের গির্জা। তাই আপনাকে বেশি খরচ খরচা করতে আমি দেব না হুজুর......।"

"লোহিত সাগর অনেকদূর', জমিদার স্যার জার্ডিন পাদ্রির কথা শুনে আঁতকে উঠে বললেন, 'আমার এখন বড্ড টাকার টানাটানি চলছে তাই বলছি ভূতকে লোহিত সাগরের ওপারে পাঠাতে এক কাঁড়ি টাকা এখন খরচ করতে পারব না। আর তার দরকারও নেই। আপনি বরং কম খরচে এখন কোনও ঝাড়ফুঁক করুন যাতে ও আমার প্রাসাদের গুদামঘর ছেড়ে বেরিয়ে নদীর ওপারে চলে যায়। এর চেয়ে বেশি দূরে ওকে আমি পাঠাতে চাইছিনা।'

"বেশ, যেমন চাইছেন তেমনই কাজ করব", বলে বড় পাদ্রি একটা ছোট চৌকো বাক্স বের করলেন তাঁর আলখাল্লার ভেতর থেকে। জমিদার তাঁর পোষা ভূতকে তাড়াতে বেশি খরচ করতে রাজি নন দেখে তাঁর মনটা খারাপ হল ঠিকই। কিন্তু এনিয়ে তিনি কোনও চাপ দিলেন না। বড় পাদ্রি যেই ছোট চৌকো বাক্সটা তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, "হুজুর, এর ভেতরে একখানা ছোট বাইবেল আছে, ১৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ওটি ছাপানো হয়েছিল। আপনার এই এত বড় প্রাসাদে খুঁজলে নিশ্চয়ই আরও দু'একখানা বাইবেল মিলবে। কিন্তু আমার দেয়া এই খুদে বাইবেলের এক বিশেষ ক্ষমতা আছে। এ বই যেখানে থাকে তার হাজার গজের ভেতর কোনং ভূতপ্রেত ঘেঁষতে পারবেনা।"

বড় পাদ্রির দেয়া সেই যুগে বাইবেলখানা চৌকো বাক্সে ভরে শোবার ঘরে রাখলেন স্য জার্ডিন। আর সেদিন থেকেই বন্ধ হল পোর্টিয়ুসের ভূতের মত চিৎকার চেঁচামেচি। হতচ্ছাড় ভূত সত্যিই বিদেয় হয়েছে দেখে স্বস্তি পেলেন স্যর জার্ডিন।

কিন্তু স্যর হার্ডিন ভূতকে না চাইলে হবে কি, ভূত ঘুরেফিরে এসে জোটে তাঁর কপালে। বড় পাদ্রির দেয়া রক্ষাকবচ—সেই বাইবেল নিয়েই ঘটল আরেক কাণ্ড। স্যর জার্ডিনের প্রজাকুলের বংশধরদের মুখ থেকে শোনা যায় খুদে বাইবেলখানা ছিঁড়ে গেছে দেখে স্যর জার্ডিন বছরখানেক বাদে সেটা বাঁধিয়ে দিতে পাঠিয়েছিলেন এডিনবরার এক নামকরা দপ্তরীর কাছে। পোর্টিয়ুসের ভূত এতদিন তক্কে তক্কে ছিল, পাদ্রির দেয়া ভূত তাড়ানি বাইবেল প্রাসাদে নেই টের পেয়ে সেদিন রাতেই সে আবার ফিরে এসে নতুন করে হানা দিল প্রাসাদে, ঘুমন্ত স্যর জার্ডিন আর তাঁর গিন্নিকে খাট উল্টে মেঝের কার্পেটে ফেলে দিল সে। বিপদ দেখে স্যর জার্ডিন পরদিনই বিশ্বাসী লোক পাঠিয়ে এডিনবরার চেনা দপ্তরীর কাছ থেকে সেই বাইবেলখানা ফেরত নিয়ে এলেন। বাইবেল বাড়িতে ফিরে এসেছে টের পেয়ে পোর্টিয়ুসের ভূত উর্দ্ধশ্বাসে প্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে গেল। যতদিন স্যর জার্ডিন বেঁচে ছিলেন ততদিন আর ফিরে আসেনি সে।

স্যর জার্ডিন মারা যাবার বহুবছর পরে ১৮৮৪-তে তাঁর বংশধরেরা স্পেডলিন্স টাওয়ার প্রাসাদ বিক্রি করে দেয়। বাইরের লোকের হাতে গেলেও গির্জার বড় পাদ্রির দেয়া রক্ষাকবচ সেই ভূততাড়ানি খুদে বাইবেল আজও সযত্নে আগের মতই বাক্সবন্দি অবস্থায় সযত্নে রাখা আছে সেখানে। শোনা যায় পোর্টিয়ুসের ভূতের উৎপাতের কাহিনী শোনার পরেই নাকি প্রাসাদের নতুন মালিক সেই ভূততাড়ানি খুদে বাইবেলখানা প্রায় ভিক্ষে করে আদায় করেছিলেন স্যর জার্ডিনের কাছ থেকে।

স্পেডলিনস্ টাওয়ার

কুম্বি ব্যাংক প্রাসাদ

কেন্ট-এর সানব্রিজ এলাকায় কুম্বি ব্যাংক প্রাসাদ আর তার লাগোয়া পার্কের মালিক মিঃ উইলিয়াম স্পটিসউড ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মারা যান। তিনি মারা যাবার একশো সাতাশ বছর আগে ১৭৫৬-তে ঐ প্রাসাদ ছিল কর্ণেল জন ক্যাম্পবেলের সম্পত্তি। রাজানুগ্রহের অতুলনীয় মহিমা এমনই অপার যে যাজক বা পাদ্রির শাসনাধীন এলাকায় একাধিক সম্পত্তির মালিক হওয়ার সুবাদে কর্ণেল সাহেবের বরাতে জুটল আর্গাইল-এর ডিউকের পদ। মারা যাবার আগে কর্ণেল ক্যাম্পবেল তাঁর সেজো ছেলে ফ্রেডরিককে কুম্বি ব্যাংক প্রাসাদ দান করেন।

এই ফ্রেডরিক ক্যাম্পবেলের মৃত্যুর পরে তাঁর বিধবা স্ত্রী বিয়ে করেন আর্ল অফ ফেরার্সকে। কিন্তু স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না হওয়ায় সে বিয়ে বেশিদিন টিকল না, একসময় আর্ল ফেরার্স তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করেন আদালতে। মামলা চলার সময় আর্লের নায়েবকেও বিচারক সাক্ষ্য দেবার জন্য আদালতে ডেকে পাঠান। নায়েব মশাই আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জেরার উত্তরে যা যা বলেন সে সবই দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর প্রভুর বিরুদ্ধে যায়। এই ঘটনায় আর্ল তাঁকে ভুল বোঝেন এবং আদালত থেকে প্রাসাদে ফেরার পরে বেইমান, নেমকহারাম বলে গালাগাল দেন এবং সবশেষে গুলি ছুঁড়ে সবার সামনে তাঁকে হত্যা করেন। প্রাসাদের কাজের লোকেরা নায়েবের লাশ পাচার করার সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায়। পুলিশ তাদের থানায় নিয়ে আসে, সেখানে ওপরওলার জেরার জবাবে আর্লের লোকেরা স্বীকার করে ঐ লাশ আর্লের জমিদারির নায়েবের এবং আর্লই তাঁকে নিজের হাতে খুন করেছেন। আর্লের নির্দেশেই যে তারা লাশ পাচার করতে যাচ্ছিল তাও স্বীকার করে তারা। তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে এরপরে পুলিশ আর্ল ফেরার্সকে গ্রেপ্তার করে আদালতে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করাল। নায়েবকে খুন করার অভিযোগে আর্ল অভিযুক্ত হলেন, বিচারক সব দিক বিচার করে তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। সে আমলে ইংল্যাণ্ডে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামিদের ফাঁসি হত টাইবার্ণে, বিচারক তাঁর রায়ে আর্ল ফেরার্সকেও টাইবার্ণেই ফাঁসিতে ঝোলানোর আদেশ দিলেন। রায় শেষ হবার পরে আর্ল ফেরার্স বিচারকের কাছে সবিনয়ে জানালেন ; 'ধর্মাবতার তাঁর যে দণ্ডবিধান করেছেন তা নিয়ে তাঁর এতটুকু আক্ষেপ নেই। তবে সেই প্রসঙ্গে তাঁর একটি ছোট নিবেদন আছে তাহল এই যে দুর্ভাগ্যবশত মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেও তিনি অভিজাত সমাজের প্রতিনিধি, তাই আর পাঁচজন সাধারণ খুনি আসামির মতই টাইবার্ণে তাঁর প্রাণদণ্ড কার্যকর হোক এটা তিনি মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না। মহামান্য বিচারক যদি টাইবার্ণের বদলে টাওয়ার হিলে তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আদেশ দেন তাহলে মৃত্যুর পরে তাঁর আত্মা শান্তি পাবে।' কিন্তু মাননীয় বিচারক তাঁর ঐ আবেদন তখনই খারিজ করলেন এবং আগের রায় বহাল রাখলেন। তবে আর্লের প্রতি সামান্য সহানুভূতি তিনি দেখালেন—মোম মাখানো সাধারণ পাটের দড়ির বদলে মজবুত রেশমি ফিতের ফাঁস গলায় এঁটে আর্ল ফেরার্সকে ফাঁসি গাছ থেকে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার বিধান রায়ে নতুন করে যোগ করলেন তিনি। ফাঁসির জায়গা না পাল্টালেও ফাঁসিতে লটকানোর

পদ্ধতির এই হেরফেরটুকুর জন্য আর্ল ফেরার্স বিচারককে তাঁর কৃতজ্ঞতা আর ধন্যবাদ জানালেন। এরপর পুলিশ তাঁকে নিয়ে এল জেল হাজতে। সেখানে নিজের উকিলকে ডাকিয়ে এনে কিছু নির্দেশ দিলেন। আর্লের উকিল মশাই মক্কেলের সেই নির্দেশ মেনে এক লিখিত আবেদন আদালতে পেশ করলেন। তাতে উল্লেখে করা হল মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবার আগে তাঁর মক্কেল মাননীয় আর্ল অফ ফেরার্সকে যেন বিচারক শেষবারেব মত তাঁর প্রাসাদে গিয়ে ভাল পোষাক পরার অনুমতি দেন। এছাড়া তাঁর পূর্বপুরুষেদেরই মৃতদেহ কবরে নিয়ে যাবার সময় যে বিশাল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হত তাঁর বেলাতেও যেন মহামান্য বিচারক সেই শোভাযাত্রার আয়োজনের ব্যবস্থা বহাল রাখার অনুমতি দেন।

মৃত্যুদণ্ড যাকে দেয়া হয়েছে তার এই শেষ ইচ্ছাটুকু অনুমোদন করতে বিচারক কোনও আপত্তি করলেন না। আসামী পক্ষের উকিলের পেশ করা সেই আবেদন তিনি মঞ্জুর করলেন।

নির্দিষ্ট দিনে জেল কর্তৃপক্ষ আর্ল ফেরার্সকে নিয়ে এলেন তাঁর কুম্বি ব্যাংক প্রাসাদে। স্নান সেরে শেষবার প্রার্থনা করলেন আর্ল, প্রাসাদের কাজের লোক আর পাইক বরকন্দাজদের সঙ্গে শেষবারের মত খাওয়া-দাওয়া করলেন। উকিলকে সামনে রেখে বিষয় সম্পত্তির দলিলে সইসাবুদ করলেন ; সবশেষে বিয়ের বরের জমকালো পোষাক পড়ে চাপলেন ছ'ঘোড়ায় ল্যাণ্ডো গাড়িতে। গ্রেনেডিয়ার বাহিনীর মার্চ করে চলল তাঁর গাড়ির আগে আগে আর্লের মৃতদেহ কফিনে পুরে কবর দেবার পরে তারা গুলি ছুঁড়ে অভিবাদন জানাবে। মহামান্য আর্ল ফেরার্সের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবার সময় হাজির থাকবেন বলে স্থানীয় শেরিফ মশাইও চললেন সরকারি ঘোড়ার গাড়িতে চেপে তাঁর সঙ্গি হয়ে। নানা রঙের রেশমি ফিতে দিয়ে সে গাড়ি সাজানোর ব্যবস্থা আর্ল আগেই করেছিলেন তাঁর জমিদারির খরচে। আর্লের পাইক বরকন্দাজ আর প্রাসাদের লোকেরাও বাহারি পোষাক পরে তাদের হুজুরের ফাঁসি দেখতে বেরোল মিছিল করে। মিছিলের শেষে কালো রং-এর ঘোড়ার গাড়িতে স্থানীয় গির্জায় পাদ্রিমশাই চললেন আর্লের কফিন বা শবাধার নিয়ে।

ফাঁসিতে মরতে ত নয়, শোভাযাত্রার বহর দেখে স্থানীয় বাসিন্দাদের মন হল তাদের জমিদার আবার বিয়ে করতে চলেছেন। কাতারে কাতারে মানুষ এই বিচিত্র শোভাযাত্রা দেখতে ভিড় করে দাঁড়াল পথের দু'ধারে, তাদের সবার চোখের সামনে বিয়ের বরটি সেজে আর্ল ফেরার্স শোভাযাত্রা নিয়ে বুক ফুলিয়ে এসে হাজির হলেন টাইবার্ণের ফাঁসিগাছের ধারে। খুনের মামলা শুরু হবার আগেই আর্লের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর আইনগত বিচ্ছেদ হয়েছিল তা আগেই বলেছি। কুম্বি ব্যাংক প্রাসাদের আদি অন্ত সম্পর্কে খোঁজখবর রাখেন এমন অনেকের মুখে শোনা যায় আর্লের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু হয়েছে শুনে তাঁর ভূতপূর্ব স্ত্রী আদালতে এসে ভূতপূর্ব স্বামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন। ফাঁসির কিছুক্ষণ আগে আর্ল দেখতে পান তাঁর ভূতপূর্ব স্ত্রীও খানিক তফাতে কৌতূহলী মানুষদের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে দেখেই আগুন জ্বলে উঠল আর্লের মাথায়, সবার সামনে মহিলাকে এই বলে তিনি শাপ শাপান্ত করলেন যে তাঁকে অর্থাৎ তাঁর ভূতপূর্ব স্ত্রীকেও শীগগিরই মরতে হবে, আর সে মৃত্যু আসবে আগুনের মধ্যে দিয়ে। আর্ল শাপ শাপান্ত করতে গিয়ে এও বললেন যেখান থেকে মহিলা বুক ফুলিয়ে একদিন চলে গিয়েছিলেন সেই কুম্বি ব্যাংক প্রাসাদেই আগুনে পুড়ে মরতে হবে তাঁকে।

যুক্তি খুঁজে না পেলেও আর্লের মৃত্যুকালীন সেই অভিসার অল্প সময়ের মধ্যেই সত্যি হল। তাঁর ভূতপূর্ব স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদের পরেও দ্বিতীয়বার বিয়ে করেননি জেনে আর্ল মারা যাবার আগে তাঁকে কুম্বি ব্যাংক প্রাসাদে আজীবন থাকার অনুমতি দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর উইলে। আর্লের মৃত্যুর পরে তাঁর উকিলের পাঠানো চিঠিতে সেকথা জানতে পেরে লেডি ফেরার্স তাঁর তল্পিতল্পা নিয়ে ফিরে এলেন কুম্বি ব্যাংক প্রাসাদে এবং কাজের লোকেদের অশ্রদ্ধা কুড়িয়েও দিন কাটাতে লাগলেন সেখানেই। আর্ল মারা যাবার সাতচল্লিশ বছর পরে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে কুম্বি ব্যাংক প্রাসাদের বুরুজে এক শীতের রাতে ড্রেসিংরুমে আগুন লেগে পুড়ে মরেন লেডি ফেরার্স। ফায়ার প্লেসের গা ঘেঁষে আর্ম চেয়ারে বসে গল্পের বই পড়া ছিল তাঁর বহুদিনের অভ্যেস। সবাই ধরে নিয়েছিল ঐভাবে বই পড়তে গিয়ে লেডি ফেরার্স একসময় ঘুমিয়ে পড়েন। আর ঘুমন্ত অবস্থায় আগুন ধরে যায় তাঁর পরনের গাউনে। যে মহলে লেডি ফেরার্স থাকতেন আগুন প্রায় তার পুরোটাই গ্রাস করেছিল। আগুন নেভানোর পবে প্রাসাদেব কাজের লোকেরা রাশিকৃত ছাই-এব ভেতর থেকে একটি মেয়েদের বুড়ো আঙ্গুল খুঁজে পায়। ঐ বুড়ো আঙ্গুল লেডি যেরার্সের অনুমান করে তারা স্থানীয় সমাধিক্ষেত্রে তা কবর দেয। কিন্তু এও শোনা যায় যে লেডি ফেরার্সের অতৃপ্ত আত্মাকে তাঁর হাবানো বুড়ো আঙ্গুলের খোঁজে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া মহলের আশেপাশে অনেক দিন পর্যন্ত গভীর রাতে পায়চারি করতে দেখেছে প্রাসাদের নৈশরক্ষীরা।

কুম্বি ব্যাংক প্রাসাদ

ক্র্যানফোর্ড পার্কের পুরোনো প্রাসাদ

মিডলসেক্সের ক্র্যানফোর্ড পার্কের পুরোনো প্রাসাদ একসময় ছিল ফিটজহার্ডিঞ্জ বার্কলে জমিদারদের সম্পত্তি। বর্ত্তমানে ঐ প্রাসাদের মালিক লর্ড ফিটজহার্ডিঞ্জ।

ধীরে বয়ে যাওয়া ক্রেণ নদী আর তার তীরে গাছপালার ঘন জঙ্গলের পটভূমিতে ঐ প্রাসাদ আর তার লাগোয়া গির্জার দিকে দিনের বেলা যে কোন সময় তাকালে বুক কেঁপে ওঠে। পুরোনো লাল ইঁটের দালানের ঝোলানো বারান্দা আর আধখোলা জানালাগুলো থমথমে মুখে আধবোঁজা চোখের মত ঠেকে, মনে হয় যেন অনেককালের পুরোনো একরাশ ভয় বরফের মত জমে আছে ওখানে। স্থানীয় লোকেদের মুখে শোনা যায় একসময় ঐ প্রাসাদে যেসব বয়স্ক কাজের লোক ছিল মৃত্যুর পরে তারা ভূত হয়ে এখনও সেখানে দিন কাটাচ্ছে। তবে ভূত হলে হবে কি, স্বভাব তাদের মানুষের মতই ভদ্র আর বিনীত। প্রাসাদে নতুন অতিথি বা পর্যটক কেউ এলে ভুলেও তারা পেছন থেকে তাদের ঘাড়ে ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস ফেলে না, বা কংকালের আঙ্গুল দিয়ে সুড়সুড়ি দেয়না। সাধারণ মানুষ ত বটেই, এমনকি ভূত গবেষকরা তাদের আচার ব্যবহার টের পান না যে তারা সবাই একেকজন আস্ত ভূত।

ডাকসাইটে ইংরেজ লেখক জনারেল গ্রান্টলি বার্কলে তাঁর 'রিকলেকসানস' বইয়ে সর্বপ্রথম ঐ প্রাসাদের ভৌতিক কাজের লোকেদের কথা উল্লেখ করেন। ভূত প্রেতে ঘোর অবিশ্বাসী গ্র্যান্টলি একবার তাঁর ভাইকে নিয়ে ঐ প্রাসাদে যান। সেখানে জীবনে প্রথমবার তাঁদের দু'জনের ভূতদর্শন ঘটে। ঘটনা ঘটেছিল এরকম। দু'ভাই বেড়াতে গিয়ে যখন ফিরে এলেন ডিনারের সময় তার অনেক আগে পেরিয়ে গেছে। কাজের লোকেরা খেয়েদেয়ে যে যার ঘরে শুয়ে পড়েছে। এদিকে খিদেয় তখন দু'জনেরই পেট জ্বলছে। শেষকালে দু'ভাই গিয়ে ঢুকলেন প্রাসাদের রান্নাঘরে, ভাবলে সেখান হয়ত খাবার-দাবার কিছু মিলতে পারে। কিন্তু রান্নাঘরের আনাচে-কানাচে হাতড়ে একটুকরো খাবারও খুঁজে পেলেন না তাঁরা। নিরাশ হয়ে বাইরে বেরোতে যাবেন এমন সময় এক বুড়ি কোথা থেকে একবাটি রান্না করা মাংস আর কিছু সেঁকা রুটি সামনের টেবলে রেখে ইশারায় তাদের ওসব খেতে বলল। পরমুহূর্তে দু'ভাই আর সেই বুড়িকে দেখতে পেলেন না। ভরসা করে দু'জনেই রুটি মাংস খেয়ে খিদে মেটালেন। তারপর প্রাসাদের সবখানে খুঁজে বেড়ালেন। কিন্তু খোঁজাই সার হল, খানিক আগে দেখা সেই বুড়ির হদিশ পেলেন না তাঁরা। খাবারটুকু এনে দিয়েই যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে সে।

এই ঘটনার লেখক গ্র্যান্টলি বার্কলের পিতৃদেবেরও ঐ প্রাসাদে ভূতদর্শন হয়েছিল। ঘোড়ায় চড়ার চাবুক হাতে তিনি বিকেলবেলা গিয়ে ঢুকেছিলেন প্রাসাদের ঘোড়ার আস্তাবলে। সেখানে ঘোড়ার দেখ্‌ভাল যারা করে তাদের ঘরে উঁকি দিয়ে অচেনা একটি লোককে ঘোরাঘুরি করতে দেখেন। লোকটিকে অবাঞ্ছিত ভেবে তিনি তার সামনে এসে চাবুক নাচিয়ে হেঁকে ওঠেন, "অ্যাই কে রে তুই, এখানে ঢুকেছিস কোন মতলবে?" তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী লোকটি একটি কথাও না বলে তাঁর হাতের চাবুকের দিকে একবার তাকিয়েই যেন মিলিয়ে গেল বাতাসে।

ক্রানফোর্ড পার্কের পুরোনো প্রাসাদের কাজের লোকেরা যারা আজীবন সেখানে কাটিয়েছে। মৃত্যুর পরে প্রাসাদের কর্তাদের পাশাপাশি একই সমাধিক্ষেত্রে তাদেরও কবর দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের কবরের ওপর স্মৃতিস্তম্ভে তারা যে বিশ্বাসী কাজের লোক হিসেবে নিজেদের কর্তব্য পালন করেছে তাও খোদাই করা হয়েছে। এসবের পরেও কেন তাদের অতৃপ্ত আত্মারা দল বেঁধে আবার প্রাসাদে আবির্ভূত হয়েছে এ প্রশ্নের সঙ্গত উত্তর ঐ এলাকা বা তার আশপাশের কোনও ভূত গবেষক দিতে পারেননি। হয়ত এমনও হতে পারে যে হালে যেসব ছেলে ছোকরা ঐ প্রাসাদে কাজের লোক হয়ে আছে তাদের ফাঁকিবাজি আর কর্তব্যনিষ্ঠার অভাবই কবরের নিচে তাদের শান্তির ঘুম ভাঙ্গিয়েছে। আর তারই ফলে আবার তারা ফিরে এসেছে কর্তব্যপালন কিভাবে করতে হয় তা ঘাড় ধরে শেখাতে। তবে প্রাসাদের কাজের লোকেদের মধ্যে যারা মানুষ তাদেব সঙ্গে ঐ ভূতদের কোনও বিরোধ ঘটেছে বলে শোনা যায়নি। এই বিদেহী বা ভৌতিক কাজের লোকেদের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় সুবিধে এটাই যে তাদের কাউকে খেতে পরতে বা মাইনে দিয়ে হয় না।

ক্রানফোর্ড পার্ক

হ্যাম হাউসের প্রেত

রিচমণ্ড ও কিংস্টনের মাঝামাঝি ঘাসে ছাওয়া বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ঘন গাছপালার মধ্যে যে প্রাসাদটি টেমস নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছে বহুকাল ধরে তার নাম হ্যাম হাউস। স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে অবস্থিত এই প্রাসাদ ১৬১০ খৃষ্টাব্দে স্যর টমাস ভাভাসর রাজা প্রথম জেমসের ছেলে প্রিন্স হেনরির (প্রিন্স অফ ওয়েলসের) বসবাসের জন্য গড়েছিলেন। কিন্তু শৌখিন ধাতের মানুষ প্রিন্স হেনরি বেশিদিন ঐ প্রাসাদ ভোগ করতে পারেননি। হ্যাম হাউস প্রাসাদ তৈরি হবার মাত্র দু'বছর বাদে ১৬১২ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর কারণ নিয়ে দ্বিমত আছে—কারও মতে তিনি টাইফয়েডে ভুগে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন টাইফয়েড নয়, সিংহাসনের ভাবি প্রতিদ্বন্দ্বী বিষপ্রয়োগে তাঁর মৃত্যু ঘটিয়েছিল। আসল কারণ যাইহোক, মারা যাবার পড়ে প্রিন্স হেনরির আত্মার ঘুম একবাবও ভাঙ্গেনি, হ্যাম হাউসে তাঁর প্রেতাত্মা আজ পর্যন্ত কাউকে দর্শন দেয়নি। তাসত্ত্বেও হ্যাম হাউস প্রাসাদের ভৌতিক অপবাদ ঘোচেনি। সবাই জানে সেখানে ভূত আছে।

হ্যাঁ, হ্যাম হাউস প্রাসাদে ভূত অবশ্যই আছে। এক জবরদস্ত ভূত, লজারডেলের ডাচেসের প্রেতিনী সাধারণভাবে যার পরিচয় পেত্নি। রাজা দ্বিতীয় চার্লসের আমলে ইংল্যাণ্ডের রাজদববাবে লডারডেলের ডাচেসের প্রভাব ছিল অপরিসীম। একাধিক কুকীর্তি তাঁকে বসিয়েছিল কুখ্যাতিব সম্রাজ্ঞীর আসনে। প্রিন্স হেনরির অকাল মৃত্যুর পরে তাঁর বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট হ্যাম হাউস প্রাসাদ ডাচেস তাঁর প্রভাব খাটিয়ে নিজে অধিকার করেন এবং সেখানে তিনিই থাকতে শুরু করেন। ভূতবিলাসী যেসব পর্যটক প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শনের আনাচে-কানাচে অশরীরীর আনাগোনা দেখতে ভালবাসেন, হ্যাম হাউস প্রাসাদ তাঁদের পক্ষে আদর্শ স্থান। সেই কবে ডাচেস মরে ভূত, থুড়ি প্রেতিনী হয়েছেন, কিন্তু তাঁর খাস কামরাটি আজও তখনকার আমলের চেহারা নিয়ে সুসজ্জিত অবস্থায় রয়ে গেছে, সেখানকার কিছুই এতটুকু নড়চড় হয়নি। আশ্চর্যের বিষয়, ডাচেসের ব্যবহার করা কতকাল আগের সেই প্রসাধন সামগ্রি আর সাজগোজের উপকরণগুলো আজও এমন তাজা অবস্থায় আছে যা দেখে অবাক হতে হয়। খাস কামরায় ঢুকতেই চোখে পড়ে ছোট টেবলের ওপর রাখা আবলুস কাঠের তৈরি একখানা সরু বাহারি ছড়ি। বেঁচে থাকতে ডাচেস সাজগোজ করে বেরোনোর সময় এই ছড়িখানা সঙ্গে নিতেন। হ্যাম হাউস প্রাসাদের নৈশ রক্ষীদের মুখ থেকে শোনা যায় আজও রাতের বেলা ডাচেসের খাস কামরার বাইরের বারান্দার মেঝেতে ছড়ি ঠুকে পায়চারি করার আওয়াজ ওঠে ঠুকঠুক, ঠুঁকঠুক। ঐ আওয়াজ শুনে তারা বুঝতে পারে ডাচেস অফ লডারডেলের তৃষিত আত্মা গভীর রাতে ছড়ি হাতে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে।

ডাচেসের প্রেতিনীকে কেন্দ্র করে যেসব কাহিনী হ্যাম হাউস এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে প্রচলিত আছে তার একটি এখানে তুলে ধরলাম। প্রাসাদের খাস আর্দালির পাঁচ ছয় বছরের একটি মেয়ে দেশের বাড়িতে তার মায়ের কাছে বড় হচ্ছিল। স্যর লায়োনেল টলেম্যাচের স্ত্রী ডাইসার্টের কাউন্টেস এলিজাবেথ একদিন খাস আর্দালিকে ডেকে বলেন মেয়েটিকে তাঁর

দেখার খুব ইচ্ছে হয়েছে। এ ঘটনা যখনকার তার অল্প কিছুকাল আগে ডাচেস অফ লডারডেল মারা গেছেন। হ্যাম হাউস প্রাসাদে তখন আছেন ডাইসার্টের কাউন্টেস এলিজাবেথ। মনিবের কথা শুনে এক শনিবার খাস আর্দালি ছুটি নিয়ে বাড়ি গেল, মেয়ে আর তার মা দু'জনকেই প্রাসাদে নিয়ে এল সে। কাউন্টেস এলিজাবেথ মা আর মেয়েকে নিজের মহলে রাখার ব্যবস্থা করলেন। কাউন্টেস এলিজাবেথ ছোট ছেলেমেয়েদের খুব ভালবাসতেন। রাতের বেলা আর্দালির মেয়েটিকে তার মায়ের কাছ থেকে নিয়ে নিজের বিছানায় শুইয়ে ঘুম পাড়িয়েছিলেন। পরদিন খুব ভোরে ঘরের ভেতর কিসব অদ্ভুত আওয়াজ শুনে বাচ্চা মেয়েটির ঘুম গেল ভেঙ্গে। চোখ মেলে বিছানায় উঠে বসতেই সে দেখল খুব জাঁকালো পোষাক পরা এক বুড়ি খাটের মুখোমুখি দেয়াল আঙ্গুলের নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছে। বাচ্চা মেয়েটি তা দেখে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল সেই বুড়ির দিকে। খানিক বাদে বুড়ি পেছন ফিরতেই বাচ্চা মেয়েটির চোখে চোখ পড়ল। একটি কথাও না বলে ধীরে ধীরে পা ফেলে সে এসে দাঁড়াল খাটের কাছে। পলক না ফেলে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল মেয়েটির মুখের দিকে। আর তখনই মেয়েটির চোখে পড়ল বুড়ির ডান হাতে একটা ছড়ি ধরে আছে শক্ত করে। বুড়ির চোখের চাউনিতে এমন কিছু ছিল যা দেখে মেয়েটি ভয় পেল। খানিক বাদে চিৎকার করে কেঁদে উঠল সে। কাউন্টেস এলিজাবেথ পাশেই বালিশে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছিলেন। মেয়েটির কান্নার আওয়াজ কানে যেতে তাঁর ঘুম গেল ভেঙ্গে, ধড়ফড় করে তিনি বিছানায় উঠে বসলেন। বাচ্চা মেয়েটি তখন কাঁদকে কাঁদতে খানিক আগে সে নিজের চোখে যা দেখেছে তা খুলে বলল তাঁকে। বুড়ি ততক্ষণে অদৃশ্য হলেও মেয়েটি যা দেখেছে তা যে স্বপ্নের ঘোরে দেখা ঘটনাবলি নয় এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন কাউন্টেস। তখনই কাজের লোকেদের ডাকিয়ে এনে তিনি খাটের মুখোমুখি দেয়াল পরীক্ষা করতে বললেন। দেয়ালের গায়ে সূক্ষ্ম নখের আঁচড় কাজের লোকেদের চোখ এড়াল না। তাদের মুখ থেকে শুনে কাউন্টেস নিজেও সে দাগ দেখলেন নিজের চোখে তারপর দেয়ালের সেই জায়গা তখনই ভাঙ্গার হুকুম দিলেন। কাজের লোকেরা শাবল এনে তখনই তাঁর হুকুম তামিল করতে সেই দেয়াল ভেঙ্গে ফেলল। ভাঙ্গা দেয়ালের ভেতর থেকে একটা ছোট চামড়ার বাহারি থলে বের করে এনে কাউন্টেসের হাতে দিল তারা। থলেটি দেখে কাউন্টেসের দু'চোখ উঠল কপালে, এ থলে স্বয়ং ডাচেস অফ লডারডেলের তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই। ডাচেস বেঁচে থাকতে এই থলে তাঁর হাতে অনেক পার্টিতে দেখেছেন তিনি। কৌতূহল বশে থলের মুখ খুলতেই ভেতর থেকে বেরোল একটি চিঠি। ডাচেসকে লিখেছেন তাঁরই এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবী যিনি তাঁর অনেক কুকর্মে সহায়তা করেছেন। কাজের লোকেদের ঘর থেকে বিদেয় করে দরজা জানালা ভাল করে এঁটে কাউন্টেস সে চিঠি পড়লেন। চিঠির বয়ান পড়ে কাউন্টেস অবাক হলেন। কারণ তা ছিল অতীতের এক ষড়যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত খসড়া। নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ডাচেস অফ লডারডেল যে বিষ প্রয়োগ করে তাঁর স্বামীকে খুন করেছিলেন। তাঁর বান্ধবীর লেখা ঐ চিঠির ভাষায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ডঃ জেমসের কাহিনী ঃ ম্যানিংটন হল

তারিখটা ছিল ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর। ইংল্যাণ্ডের নরফো অঞ্চলের পাদ্রি রেভারেণ্ড ডঃ জেমস এলেন ম্যানিংটন প্রাসাদে। প্রাসাদের অধিপতি লর্ড অরফোর্ড সাদরে অর্ভ্যর্থনা জানালেন তাঁকে এবং ডিনার খাবার অভ্যর্থনা জানালেন। লর্ড অরফোর্ডের প্রাসাদে ছিল তখনকার দিনে ভূত প্রেত, ডাইনি ও তন্ত্রমন্ত্র সংক্রান্ত দুর্লভ বইয়ের একটি লাইব্রেরি। 'অকাল্ট' বা গুপ্ত সাধনবিদ্যার ওপর কিছু পড়াশুনো করছিলেন ডঃ জেমস। লাইব্রেরি ছিল প্রাসাদের এক তলায়। ডঃ জেমস এসেছেন বিকেল চারটেয়, লর্ড মশাইয়ের সঙ্গে চা খেয়ে লাইব্রেরিতে গিয়ে বই নিয়ে বসেছেন। সন্ধ্যে সাতটায় লর্ড অরফোর্ডের সঙ্গে ডিনার খেয়ে আবার তিনি ফিরে গেলেন লাইব্রেরিতে। রাত বাড়তে লাগল, পেটা ঘড়িতে এগারোটার ঘন্টা বাজার পরে কয়েকজন নৈশরক্ষি আর ডঃ জেমস ছাড়া প্রাসাদের বাকি সবাই একে একে ঘুমিয়ে পড়ল।

লাইব্রেরির ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে ধিক ধিক করে। বেছে বেছে আগুনের কাছাকাছি একটি টেবলে বসেছেন ডঃ জেমস, সামনে মোমদানিতে জ্বলছে চারটে বড় মোমবাতি। ডানপাশে একগাদা বাঁধানো বই স্তূপাকারে রাখা। দরকার মত হাত বাড়িয়ে তাদের ভেতর থেকে একেকটা বই টেনে নিচ্ছেন ডঃ জেমস। রেফারেন্স দেখে আবার রেখে দিচ্ছেন।

প্রাসাদের পেটা ঘড়িতে একটা বাজতে বই থেকে মুখ তুললেন তিনি, আর ঘন্টাখানেকের ভেতর কাজ শেষ করতে পারবেন ভেবে ট্যাকঘড়ি বের করে সময় মেলালেন। অল্প কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বাঁ পাশ থেকে বোতল খুলে জল খেলেন। জল খেয়ে আবার কাজে হাত দিলেন ডঃ জেমস, পাতার দিকে চোখ পড়তে দেখেন শেষ অধ্যায়ে হাত দিয়েছেন। আরও প্রায় আধঘন্টা একটানা লিখলেন তিনি। খানিকবাদে কেমন অস্বস্তি বোধ করলেন। ডঃ জেমস স্পষ্ট অনুভব করলেন ঘরের ভেতর তিনি ছাড়া আরও কেউ আছে। আড়চোখে তাকাতে কনুই-এর কাছে কার সাদা হাত দেখতে পেলেন তিনি। চমকে মুখ ফেরাতে দেখেন ফায়ারপ্লেসের দিকে পেছন ফিরে বসে একজন অচেনা লোক ঝুঁকে পড়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে ডানপাশে রাখা বইগুলোর দিকে।

আড়চোখে তাকালেও লোকটিকে মোমবাতির আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলেন ডঃ জেমস—পরিষ্কার কামানো মুখ, লালচে বাদামি চুল, প্রশস্ত ললাট, উঁচু চোয়াল। লোকটির পরনে ছিল গলা পর্যন্ত আঁটা সার্টিন অথবা মখমলের পোষাক। ডান হাত দিয়ে নিজের বাঁ হাত চেপে ধরে থাকার ফলে তার বাঁ হাতের নীল শিরাগুলো স্পষ্ট ফুটে উঠেছিল। ন্যাশন্যাল গ্যালারিতে রাখা শিল্পী ভ্যালামকোয়েজের আঁকা বিখ্যাত মাস্টারপিস 'ডেড লাইট' দেখেছেন ডঃ জেমস, অচেনা লোকটির বাঁ হাত অবিকল সেই ছবির বাঁ হাত বলে তাঁর মনে হল। আড়চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখার পরে ডঃ জেমস এ বিষয়ে নিশ্চিত হলেন যে লোকটি অশরীরী। হাজারও ভাবনা মাথায় ভিড় করে এলেও একটিবারের জন্যও ভয় পেলেন না তিনি। বিদেহীটি যেই হোক, তার সম্পর্কে প্রচণ্ড কৌতূহল অনুভব করলেন ডঃ জেমস। একসময় তার মুখখানা ধরে

রাখতে স্কেচ করার কথাও ভাবলেন। পেনসিল ছিল হাতের পাশেই। কিন্তু স্কেচ কই? সেত রেখে এসেছেন ওপরতলার ঝোলার ভেতর। পাছে সে অদৃশ্য হয় এই ভেবে ডঃ জেমস ওপরে যেতে পারলেন না।

খানিক বাদে লেখা থামিয়ে বাঁ হাত বাড়িয়ে ডানপাশ থেকে একখানা বই তুলতে গেলেন ডঃ জেমস। স্পষ্ট অনুভব করলেন তাঁর বাঁ হাত সেই অশরীরীর ভেতর দিয়ে গলে বেরিয়ে এল। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মূর্তিটি গেল মিলিয়ে। ডঃ জেমস একটু নিরাশ হলেন। তারপর আবার মন দিলেন লেখায়। বড় জোর মিনিট পাঁচেক লিখেছেন তারপরেই সেই মূর্তি আবার দেখা দিল খানিক আগে যেখানে সে মিলিয়ে গিয়েছিল ঠিক সেখানে। এবার তার হাত দু'খানা তাঁর নিজের হাতের আরও কাছাকাছি এসেছে বলে তাঁর মনে হল। মাথা ঘুরিয়ে মূর্তিটি ভাল করে দেখলেন ডঃ জেমস। কি বলে ডাকবেন। তাও মনে মনে ভেবে ফেললেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। মুখ ফুটে কিছু বলার মত সাহস পেলেন না তিনি। অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও এতটুকু আওয়াজ বেবোলনা তাঁর গলা দিয়ে। পাশাপাশি ঐভাবে বসে রইলেন দু'জনে। ভূতের পাশে মানুষ। খানিকক্ষণ ঐভাবে কাটানোর পরে আবার লেখায় মন দিলেন তিনি। লেখা শেষ হতে বইটি বন্ধ করে টেবলে ছুঁড়ে রাখলেন তিনি। অল্প আওয়াজ হবার সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল সে মূর্তি।

এবার ডঃ জেমসের মনে ভয় হল তাঁর স্নায়ু কমজোরি হয়ে পড়ছে। হাই তুলে উঠে দাঁড়িয়ে তিনটে মোমবাতি নেভালেন। চতুর্থটি হাতে নিয়ে লাইব্রেরির ভেতরে আরেকটি ঘরে এলেন। বইগুলো সাজিয়ে রেখে আবার লেখা শুরু করলেন। অশরীরীর কথা পলকে মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার দেখা দিল সে। কিন্তু এবার তার সম্পর্কে আর কোনও আগ্রহ বা কৌতূহল তাঁর মনে জাগল না। লেখা শেষ করে আলো নিভিয়ে ডঃ জেমস শুয়ে পড়লেন বিছানায়। সে রাতে তাঁর খুব ভাল ঘুম হয়েছিল।

পাদ্রীর বিদেহী মা

ফিলিপ ইনার্টনের বয়স তখন মাত্র দশ সেই সময় তাঁর মা একটি ছেলের জন্ম দিতে গিয়ে মারা যান। ফিলিপ আর তাঁর নবজাত ভাইকে তাঁদের বড় বোন মায়ের স্নেহ মমতা দিয়ে বড় করে তোলেন। ফিলিপ ইনার্টনের ছোট ভাই বড় হয়ে পাদ্রি হন। গির্জায় যোগ দেবার পরে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে তাঁর জীবনে। একদিন প্রচণ্ড বৃষ্টিতে ভিজে সপসপে হয়ে গির্জায় ফিরে এলেন পাদ্রি, ভাবলেন স্টাডিতে ফায়ারপ্লেসের ধারে বসে হাত পা সেঁকে নেবেন আগুনে। স্টাডিতে এসে দেখেন ফায়ারপ্লেসের সামনে তাঁর আর্মচেয়ারে এক অচেনা যুবতীর ছায়ামূর্তি বসে আছে। পাদ্রি প্রথমে ভাবলেন মনের ভুল। কিন্তু কয়েকবার চোখ মোছার পরেও সেই ছায়ামূর্তিকে একই ভাবে স্পষ্ট দেখতে পেলেন তিনি। অবাক হয়ে পাদ্রি এও লক্ষ করলেন ঐ ছায়ামূর্তির প্রতি এক তীব্র আকর্ষণ বোধ করছেন তিনি। কিন্তু তখনও ভুল দেখছেন কিনা এই সন্দেহ যায়নি তাঁর মন থেকে। শেষকালে সব সন্দেহ নিরসন করতে পাদ্রি এগিয়ে এসে বসে পড়লেন সেই আর্মচেয়ারে ছায়ামূর্তির কোলের ওপর। যেন কোনও যুবতীর কোলে বসেছেন এমন অনুভূতি বোধ করলেন পাদ্রি, ঘাড়ের পেছনে নিঃশ্বাসের ছোঁয়াও পেলেন। পাদ্রি কিন্তু একবারও ভয় বা অস্বস্তি বোধ করলেন না, বরং দেখলেন এক পরমানন্দ আর শান্তিতে ভরে

উঠছে তাঁর মন প্রাণ। পরে এই ঘটনা তিনি তাঁর দিদি আর ভাই দু'জনকেই বলেন। দিদি শুনে যা বললেন তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে সেদিন তাঁর গর্ভধারিণী মায়ের আত্মাই দেখা দিযেছিল। জন্ম দিয়েই মারা যাবার ফলে সেই সন্তানের ওপর তাঁর মায়েব নিশ্চয়ই তীব্র আকর্ষণ থেকে গিয়েছিল। সেই আকর্ষনেই এত বছর বাদে আবার নিয়ে এসেছিল তাঁর আত্মাকে পাদ্রি ছেলেব কাছে, তাকে কোলে বসিয়ে শান্তি অনুভব করেছিলেন তাঁর মায়ের আত্মা। ঐ ঘটনার পরে পাদ্রি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁর মায়ের বিদেহী আত্মা আর তাঁকে দেখা দিতে আসেনি। আগের কাহিনীতে ডঃ জেমস নামে যে ভূত-গবেষক পাদ্রির উল্লেখ করেছি তাঁর লেখাতেই এই ঘটনা পাওয়া গেছে।

জমিদারের ভূত ঃ ডঃ জেসপের তৃতীয় কাহিনী

ভূত বিশেষজ্ঞ পাদ্রি ডঃ জেসপের তৃতীয় কাহিনীর ঘটনাস্থল ফেলব্রিগ, তাঁর নিজের ভূতদর্শন যেখানে হয়েছিল সেই ম্যানিংটন হল থেকে জায়গাটির দূরত্ব প্রায় দশ মাইল। জমিদারদের পদবী ছিল উইণ্ডহ্যাম। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ঐ বংশের শেষ পুরুষ নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। এরপরে জন কিটন নামে নরউইচের এক পয়সাওয়ালা মুদি ঐ জমিদারি কিনে নেয়। কথায় বলে, 'আদেখলায় ঘাট হল। জল খেতে খেতে প্রাণ গেল।' জমিদারি কিনে জন কিটনের হল সেই অবস্থা। মুদি যতদিন ছিল ততদিন কেউ তাকে পুঁছত না। এখন জমিদারি কেনার ফলে তারও জমিদারি চালে জীবন কাটানোর সাধ হল। মনের সাধ মেটাতে গিয়ে দেদার পয়সাকড়ি খরচ করতে লাগল সে। ফল যা হবার তাই হল। জমিদারি চাল বজায় রাখতে গিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে বাজারে তার বেশ কিছু দেনা হয়ে গেল।

জন কিটন পড়ল মুশকিলে। জমিদারি কেনার পরে মুদিখানায় কারবার তুলে দিয়েছে সে। পুরোনো পাইকারি মহাজন যারা ছিল তাদের সঙ্গেও সব সম্পর্ক দিয়েছে চুকিয়ে, নয়ত এই সংকটে তাদের দু'একজনকে হয়ত বন্ধুর মত পাশে পেত ভুঁইফোঁড় জমিদার জন কিটন। অথচ সে জমিদারি কিনতে যাচ্ছে শুনে এরা একসময় বাধা দিয়েছিল। জমিদারি কিনলে তার ঠাটবাট বজায় রাখতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হতে হবে তাকে। এমন আভাস আগেই দিয়েছিল তারা ; কিন্তু তখন তাদের সেকথা কানে তোলেনি জন কিটন। সে জমিদারি কিনতে চলেছে শুনে হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরছে সবাই।' এটাই ধরে নিয়েছিল সে। মুদিখানা তুলে দেবার ফলে এখন তাদের সঙ্গেও তার সম্পর্ক নেই।

পাওনাদারেরা অন্যদিকে ছেড়ে কথা কইছেনা। কয়েকজন ত খোলাখুলি ভাবে বলেই গেল মাসখানেকের ভেতর দেনা শোধ করতে না পারলে আদালতে তারা সম্পত্তি ক্রোক করার মামলা দায়ের করবে। জন কিটন শুনল সবই। কিছু না বলে শুধু চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। হুমকি দিয়ে পাওনাদারেরা চলে যাবার পড়ে নিজের মনেই জন কিটন আক্ষেপ করে বলল এ-ভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে আত্মহত্যা করা ঢের ভাল। ঘটনাক্রমে সে আক্ষেপ শুনে ফেলল তার বৌ। বেচারি সাধারণ চাষি ঘরের যুবতী মেয়ে। পেটে বিদ্যে না থাকলেও সংসারের হাল ধরতে জানে। জমিদারি কিনতে সেও নিষেধ করেছিল কিন্তু বৌয়ের নিষেধ কানে তোলেনি জন। দেনা শুধতে না পেরে স্বামী আত্মহত্যা করতে চাইছে শুনে তার মন ভারি খারাপ হয়ে গেল, খেয়েদেয়ে জন শুয়ে পড়তে তার বৌ নেমে এল একতলায় বসার ঘরে। এখানে রকিং চেয়ারে বসে দোল খেত সে। কিন্তু আজ আর দোল খেতে তার মন চাইল না। দেয়ালে টাঙ্গানো উইণ্ডহ্যাম জমিদারদের শেষ বংশধরের হাতে আঁকা রঙিন ছবির দিকে তাকিয়ে চোখের জল ফেলতে লাগল আপন মনে। কতক্ষণ ঐ-ভাবে কেটেছিল কেউ জানেনা। আচমকা বৌটি দেখল ছবির ভেতর থেকে জমিদারের প্রেতাত্মা বেরিয়ে এসে দাঁড়াল তার সামনে। সেই এক চেহারা, একরকম নাক, চোখ, চাউনি, এমনকি পরনেও একই পোষাক। সঙ্গে সঙ্গে থতমত খেয়ে বৌটি উঠে দাঁড়াল। জমিদারের প্রেতাত্মা তাকে তার সঙ্গে আসতে ইশারা করে এগিয়ে

চলল স্টাডির দিকে, বৌটি মন্ত্রমুগ্ধের মত তার পেছন পেছন যেতে লাগল। স্টাডিতে ঢুকে বইয়ে ঠাসা একটা বড় আলমারির সামনে এসে থমকে দাঁড়াল জমিদারের প্রেতাত্মা। বৌটির দিকে তাকিয়ে আলমারির দ্বিতীয় তাকের দিকে আঙ্গুল তুলে একবার দেখাল, তারপব হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। সাহসে ভর করে দ্বিতীয় তাকের সবকটা বই নামাতেই বৌটির হাতে নরম কাপড়ের মত কিছু ঠেকল, হাতড়ে দেখল একটা মুখবাঁধা কাপড়ের থলে সেখানে রাখা। সেই থলে টেনে বের করতে বৌটি অবাক। দেখল ভেতবে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা। সেই থলে ভর্তি স্বর্মমুদ্রা এনে বৌটি দিল তার স্বামীর হাতে। তার মুখ থেকে ঘটনার বিবরণ শুনে অবাক হল জন কিটন। বুঝল তাদের সংকটের মুহূর্তে শেষ জমিদারের প্রেতাত্মা বন্ধুর মত এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। প্রেতাত্মার দেয়া সেই থলে ভর্তি স্বর্ণমুদ্রা ভাঙ্গিয়ে শুধু পাওনাদারদেব বকেয়া ধাব দেনাই শোধ করল না জন কিটন, আবার নতুন কবে মুদি দোকান খুলল সে।

ক্রুগলিন গ্রেন্‌জের রক্তচোষা

ভূতের গল্প তা সে দেশী বা বিদেশী সত্যি কি বানানো, যাই হোক না কেন তার মধ্যে ভয়ানক আতংকের মিশেল না থাকলে কেমন জলো জলো ঠেকে। গোড়া থেকে এ-পর্যন্ত যেসব ভূতকথা শুনিয়েছি তারা সবাই নিরামিষাশী। তাই এবার অন্তত মুখ বদলানার জন্য এক হিংস্র রক্তচোষার কথা লিখছি। তবে এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যার কথা বলতে যাচ্ছি সে আদৌ প্রাণহীন সত্তা ছিল কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিয়েছে আমার নিজেরই মনে, তবু সত্যি ঘটনা যখন তখন বলতে বাধা কোথায়।

কাম্বারল্যাণ্ডের ক্রুগলিন গ্রেন্‌জ প্রাসাদের অধিপতি ছিল ফিশার পরিবার। বহুকালের পুরোনো ঐ একতলা দালানটি যে কিভাবে লোকের মুখে মুখে প্রাসাদ হয়ে উঠেছিল তা এক রহস্য। একতলা এই দালানের চারদিক ঘেরা গোল বারান্দাটি অবসর সময় কাটানোর পক্ষে আদর্শ। বারান্দার পরেই শুরু হয়েছে বিশাল উঠোন যা বিস্তৃত হতে হতে কাছের গির্জার পাঁচিলে গিয়ে ঠেকেছে। বারান্দায় বসে চারপাশের চোখ জুড়োনো প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে তাকালে মন আপনিই ভরে ওঠে।

বহুবছর নিশ্চিন্তে জমিদারি ভোগ করার পরে ফিশার পরিবারের জনবল এত বেড়ে গেল যে ঐ একতলা দালানে আর তাদের স্থান সঙ্কুলান হল না। বহুকালের ঐতিহ্য ভেঙ্গে একতলা দালানকে দোতলা না বানিয়ে তারা গিল্ডফোর্ডের কাছে থর্ণকোম্বে নতুন বাড়ি কিনে উঠে গেল আর পৈতৃক একতলা দালানটি ভাড়া দিল।

ভাড়াটে হয়ে যারা এল তাদের নিয়েই এ-কাহিনী। সংখ্যায় তারা মাত্র তিনজন। দুই ভাই ও এক বোন, বোনটি সবার ছোট। অবস্থাপন্ন ঐ পরিবারে কাজের লোক কেউ নেই। রান্না থেকে শুরু করে ঘরে গেরোস্থালির সব কাজ বোনটি একাই করে। বাড়ি তার পরিবেশ, আর প্রতিবেশীবৃন্দ সবই হল তাদের মনের মত। প্রতিবেশীরা তাদের পেয়ে খুব খুশি হল।

হেমন্তের শেষ নাগাদ ভাড়াটেরা এসেছিল নতুন বাড়িতে, পরের বছর গ্রীষ্মে বাড়িতে তাদের টেঁকা দায় হয়ে উঠল। ভাইয়েরা দিনের বেলা তাড়াতাড়ি কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরে আসে। খেয়ে গল্পের বই নিয়ে চলে আসে বাইরে। গাছের নিচে চাদর পেতে বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ে। অসহ্য গরমের মধ্যে তাদের বোনটি একা হাতে ঘরের কাজকর্ম সেরে চেয়ারে খেতে বসে বাইরে ঘেরা বারান্দায়। কেবল সন্ধ্যের পরেই আবহাওয়া সহনীয় হয়ে ওঠে। চারদিক আঁধার হয়ে আসার আগেই তিন ভাই বোন ডিনার খেয়ে এসে ঘেরা বারান্দায় বসে মেতে ওঠে গল্পগুজবে নয়ত তাস খেলায়। গায়ে হাওয়া লাগাতে লাগাতে দেখে পশ্চিমাকাশে ডুবে যাওয়া সূর্যের রক্তিমাভার রেশ তখনও রয়ে গেছে। গাছগাছালির ফাঁকফোকরের দিকে চোখ পড়তে দেখে চাঁদ উঠছে আকাশে। চারপাশ আঁধারে ঢাকা পড়ার আগেই সেই চাঁদ উঠে যায় অনেক ওপরে। তার রূপোলি আলোয় ভেসে যায় ঘেরা বারান্দা। চাঁদের আলোয় ঝোপঝাড়ের ছায়া স্পষ্ট পড়ে লনে।

গল্পগুজব তাস খেলা শেষ হবার পরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওরা তিন জন বসে থাকে ঐ ভাবে। রাত বাড়লে উঠে পড়ে একসঙ্গে। বাড়ির ভেতরে যে যার ঘরে শুতে যায়।

একদিন রাতে বোনটির চোখে কিছুতেই ঘুম আসছে না। জানালার খড়খড়ি খুলে কাঁচের বন্ধ সার্সির ওপারে ফিনিক ফোটানো চাঁদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সে। খানিক বাদে চোখ নামাতে গিয়ে মেয়েটি চমকে উঠল। স্পষ্ট দেখতে পেল বাইরে গাছ গাছালির ফাঁকে একজোড়া অদ্ভুত আলো পাশাপাশি দপ্‌দপ্ করে জ্বলতে জ্বলতে ক্রমেই এগিয়ে আসছে তার জানালার দিকে। অবাক হয়ে আরও খানিকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইল সে। কিন্তু ঐ আলোর উৎসের হদিশ পেলনা। ওদিকে সেই আলো দুটো ততক্ষণে আরও কাছে এসে পড়েছে। সেদিকে চোখ পড়তে মেয়েটি দেখল আলো দুটো দেখতে দেখতে জুড়ে এক হয়ে এক বীভৎস অপ্রাকৃতিক আকার ধারণ করল। কাছে এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সেই আকার আয়তনে বাড়ছে তাও লক্ষ্য করল সে। এবার সত্যিই ভয় পেল বেচারি। ভাবল দরজা খুলে বাইরে ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়বে দাদাদের ঘরে। জানালার গা ঘেঁষেই দরজা কিন্তু তাতে ভেতর থেকে গা তালা আঁটা। খাট থেকে নেমে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল বোনটি। চোখ তখনও জানালার পাশে—ঐখানে দাঁড়িয়েই দেখল বাইরে সেই বীভৎস অস্তিত্বটা তাদের ঘেরা বারান্দা ঘেঁষে বাড়ির পাশের দিকে এগিয়ে চলেছে। খানিক বাদে জানালার গায়ে বাইরে থেকে ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ হতে চমকে উঠল সে। তার মনে হল বাইবে দাঁড়িয়ে কেউ জানালার গায়ে কিছু ঘষলে যেমন আওয়াজ ওঠে ও আওয়াজ ঠিক তেমনই বলেই তার মনে হল। ভীষণ ভয়ের মধ্যেও কৌতূহল চাপতে না পেয়ে খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে জানালার বাইরে তাকাল সে। দেখল শুকনো মড়ার মুখের মত বীভৎস এক বাদামি মুখ বাইরে দাঁড়িয়ে জানালার সার্সি খোলাব চেষ্টা করছে। এক মুহূর্তের জন্য সেই বীভৎস মুখেব অধিকারী জ্বলন্ত চোখ তুলে তাকাতেই দেখতে পেল মেয়েটিকে। ভীষণ ভয় পেয়ে সে আবার এসে শুয়ে পড়ল বিছানায়। জানালার সার্সি বন্ধ আছে ভেবে মেয়েটি গোড়ায় নিজেকে নিরাপদ মনে করছিল। কিন্তু খানিক বাদেই বাইরের একটানা ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ গেল থেমে। আর সঙ্গে সঙ্গে ঝনঝন আওয়াজ করে সার্সির একটি কাঁচ খসে ঘরের মেঝেতে পড়ে ভেঙ্গে খানখান হয়ে গেল। ঘরের আলো নেভানো ছিল। মেয়েটি আঁধারের মধ্যে দেখতে পেল বাইরে থেকে লম্বা বাঁকানো আঙ্গুলের মত কিছু একটা সেই ভাঙ্গা সার্সির ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকে ছিটকিনি খুলে ফেলল। পরমুহূর্তে জানালার পাল্লা গেল খুলে আর সেই খোলা জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকল খানিক আগে দেখা সেই বীভৎস অপ্রাকৃত জীবটি। মেয়েটি ততক্ষণে ভয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়েছে। খাটের ওপরে উঠে সেই নিশাচর কিছুক্ষণ হাত বোলাল মেয়েটির মাথায়। তার চুলে আঙ্গুল চালিয়ে বিলি কাটল আপন মনে, তারপর আচমকা তার হাল্‌কা শরীরটা টেনে খাটের ধারে নিয়ে এসে হিংস্র কামড় বসালো গলায়।

প্রচণ্ড ভয়ে এতক্ষণ চিৎকার করার ক্ষমতাটুকুও হারিয়ে ফেলেছিল মেয়েটি। এবার গলায় ক্ষত অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল সে ভাইদের নাম ধরে। বোনের চিৎকার শুনে দু'ভাই ছুটে এল বাড়ির অন্য ঘর থেকে। কিন্তু দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থাকায় ভেতরে ঢুকতে পারল না। ভাইদের একজন দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল অন্যজন নিজের ঘর থেকে ফায়ারপ্লেসের আগুন খোঁচানো শিক নিয়ে ফিরে এল। সেই শিক দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরে গলিয়ে চাড় মারতেই খুলে গেল দরজার পাল্লা। এদিকে যে ভাইটি বাইরে দাঁড়িয়েছিল ঘরের

ভেতর অন্য কারও উপস্থিতি টের পেয়েছিল সে। অন্য ভাইটি দরজা খুলে ফেলতেই তার হাত থেকে লোহার শিকখানা নিজের হাতে নিল সে। এদিকে বাইরের লোক ভেতরে ঢুকে পড়েছে টের পেয়ে সেই মূর্তিমান বিভীষিকা মেয়েটিকে ছেড়ে খোলা জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ল বাইরে ঘেরা বারান্দায়। শিক উঁচিয়ে ভাইদের একজন তাকে তাড়া করতেই টেনে দৌড়োল সে। ভাইটি শিক হাতে তার পিছু নিল। ছুটতে ছুটতে গির্জার কাছাকাছি এসে পাঁচিল বেয়ে ওপরে উঠল সেই অপার্থিব জীব। তারপর নিমেষে লাফিয়ে পড়ল ওধারে। হাতের নাগালে পেয়েও তাকে ধরতে না পেয়ে ভাইটি ফিরে এল বাড়িতে। বোনের ঘরে ঢুকে দেখল বোন বেহুঁশ। তার গলায় একটি ক্ষত হয়েছে। সেখান থেকে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। ভাইদের শুশ্রূষায় খানিকক্ষণ বাদে মেয়েটির হুঁশ ফিরে এল। চোখ মেলে ভাইদের দেখতে পেয়ে লজ্জাবোধ করল সে। কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠার পরে ভাইদের প্রশ্নের উত্তরে যা যা ঘটেছে সব খুলে বলল মেয়েটি। পাছে ভাইয়েরা ভুল বোঝে এই ভেবে সে গোড়াতেই বলল, "মনে রেখো, আমি এখনও কারও প্রেমে পড়িনি। কাজেই যে এসে আমার ওপর চড়াও হয়েছিল তাকে আর প্রেমিক ভেবে ভুল কোর না।"

"তোমার কি মনে হয়, যে এসেছিল সে কে?"

"আমার ধারণা লোকটা আসলে উন্মাদ", মেয়েটি একটু ভেবে বলল, "হয়ত ধারে কাছে কোনও পাগলা গারদ আছে। সেখান থেকে কোন ফাঁকে পালিয়ে এসেছে।"

"কিন্তু তুমি তার চেহারায় যে ভয়ানক বর্ণনা দিচ্ছ তাতে উন্মাদ বলে মনে হচ্ছে না।" বড় ভাই বলল, "উন্মাদ হলে গির্জার পাঁচিল টপকে ভেতরে নামতে যাবে কেন। আমার সন্দেহ হচ্ছে ওটা ভ্যাম্পায়ার রক্তচোষা অশরীরী।"

"ভ্যাম্পায়ার হলে সেই বা গির্জার দিকে যাবে কেন?" বোন পাল্টা প্রশ্ন করল, "ওসব কুসংস্কারে আমি বিশ্বাস করিনা।" স্থানীয় ডাক্তার খবর পেয়ে যথাসময় এলেন। মেয়েটির ক্ষত পরিষ্কার করে বীজানুনাশক ওষুধ দিলেন তিনি। কে ঘরে ঢুকেছিল না ঢুকেছিল এসব শুনেও আগ্রহী হলেন না। মেয়েটিকে সাধারণভাবে পরীক্ষা করে দু' ভাইকে আলাদা ডেকে বললেন, "বয়স্কা কুমারী মেয়ে। মনে হচ্ছে স্নায়বিক দুর্বলতায় ভুগছে। ওর কিছু দিনের জন্য বায়ু পরিবর্তন দরকার।" ডাক্তারের রায় ভাইদের মনে ধরল, লম্বা মেয়াদে বাড়ি ইজারা নেয়া হয়েছিল তাই দরজায় তালা এঁটে তিন ভাই বোন নিশ্চিন্তে পাড়ি জমাল সুইজারল্যাণ্ডে।

সুইজারল্যাণ্ডের অন্য নাম ইওরোপের নন্দন কানন। সেই অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে এসে মেয়েটি যেন হারিয়ে ফেলল নিজেকে। দাদাদের সঙ্গে আল্পস পর্বত মালার গায়ে জমা তুষারে স্কি করে, ছবি এঁকে, গাছের চারা পুঁতে সময় কাটিয়ে সত্যিই সেরে উঠল সে। টানা একটি বছর সেখানে কাটানোর পরে একদিন সে বাড়ি ফিরতে চাইল। ভাইয়েদেরও ততদিনে বাড়ি ফেরার দরকার পড়েছে। তাই তারা বোনের ইচ্ছেতে আপত্তি করল না। আবার তারা তিন জনে ফিরে এলে কাম্বারল্যাণ্ডের সেই একতলা বাড়িতে। এবার বোনের ঘরের ঠিক লাগোয়া দু'টি ঘরে ভাইরা রাত কাটানোর ব্যবস্থা করল। দু'জনেই সঙ্গে নিল গুলি ভরা পিস্তল। শীত গেল। এল বসন্ত। তারপর এল গ্রীষ্ম। মার্চ মাসের এক রাতে মেয়েটির ঘুম আচমকা গেল ভেঙ্গে, কানে এল বাইরে জানালার গায়ে সেই নারকীয় ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ। পাশ দিয়ে

জানালার দিকে তাকাতেই সার্সির বাইরে যেই ভয়ানক বীভৎস মুখ বহুদিন পরে আবার দেখতে পেল মেয়েটি। একই বিকৃত জৈবিক কামনা মেশানো চাউনি হেনে জীবটি তাকিয়ে দেখছে তাকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটি ; বোনের চিৎকার শুনে দু'ভাই পিস্তল হাতে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তাদের আসতে দেখেই সেই মূর্তিমান বিভীষিকা ছুটে পালাতে গেল। কিন্তু ভাইদের একজন সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুঁড়ল পেছন থেকে। গুলি এসে লাগল হাঁটুতে। জীবটা কিন্তু চোট খেয়েও কাবু হলনা। খোঁড়াতে খোঁড়াতে দৌড়োল গির্জার দিকে। পাঁচিলের কাছে পৌঁছে অদ্ভুত কায়দায় খোঁড়া পা নিয়ে ওপরে উঠে লাফিয়ে পড়ল উল্টোদিকে।

পরদিন এলাকার জোয়ানদের নিয়ে মেয়েটির দুই ভাই এল গির্জায়। ভেতরের পুরোনো দালান ভেঙ্গে পড়ায় গির্জাটি পরিত্যক্ত হয়েছে বহুদিন আগে। দারোয়ান গোছের একজন লোক ছাড়া কোনও পাদ্রি থাকে না সেখানে। তাকে নিযে সেই ভাইয়েরা এল বাইরে পাঁচিলের ধারে যেখানে উঠে সেই বীভৎস অপ্রাকৃত জীবটি লাফিয়ে পড়েছিল ভেতরে। দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করে তারা জানতে পারল পাঁচিলের ওপাশের মাটির নীচে পুরোনো আমলের এক সমাধি আগার আছে, ক্রালিন গ্রেন্‌গেজর পুবোনো জমিদারদের পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুর পরে তাদের মৃতদেহ কফিনে পুরে ঐ সমাধি আগারের তাকে রেখে দেবার রেওয়াজ ছিল। দারোয়ানকে নিয়ে দুই ভাই তখনই সিঁড়ি বেয়ে এসে ঢুকল মাটির নিচের সেই পারিবারিক সমাধি আগারে। পাড়ার লোকেরাও এল তাদের সঙ্গে। সেখানে এসে এক ভয়ানক দৃশ্য তাদেব চোখে পড়ল—অসংখ্য ক'ফিন তাক থেকে পড়ে গেছে মেঝেতে. ডালা ভেঙ্গে ভেতরের পচা গলা বিকৃত অঙ্গহীন একগাদা মড়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। সেই নরককুণ্ডের ভেতর দিয়ে পা ফেলে এগোতে এগোতে দু'ভাই এসে দাঁড়াল ঘরের এককোণে। দেখল সেখানে একটি কফিন অটুট অবস্থায় মেঝেতে পড়ে আছে। ডালা খুলে ফেলতেই ভাইযেরা চমকে উঠল। দেখল ভেতরে শুযে সেই বীভৎস মুখেব শুকনো বাসি মড়া, সব মাংস খসে গিয়ে তার হাতের আঙ্গুলগুলো দেখাচ্ছে পাখির ধারালো নখের মত। নিচের দিকে তাকাতে আবার চমক। এক ভাই আরেক ভাইকে দেখাল বাঁ হাঁটুতে পিস্তলেব গুলির ক্ষত। এরপর আর চিন্তা ভাবনার অবকাশ রইল না। সেই পুরোনো শবদেহ যারই হোক সে যে কোনও অজ্ঞাত কারণে রক্তচোষা হয়ে উঠেছে এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হল সবাই। মড়া সমেত গোটা ক'ফিনটি ওপরে নিয়ে এল সবাই। গভীর জঙ্গলে নিযে গিয়ে কেরোসিন ঢেলে মড়া সমেত কফিনটি জ্বালিয়ে ছাই করে ফেলল তারা। কফিনের ছাই মাটিতে পুঁতে গাছের ডাল কেটে ক্রস চিহ্নের আকারে তার ওপর পুঁতে বাইবেলের পবিত্র মন্ত্র পাঠ করে যে যার বাড়িতে ফিরে এল। এই ঘটনার পরে ক্রগলিন গ্রেনজে আর কোনও ভৌতিক উৎপাত ঘটেনি।

বিদেহী পাদ্রি

পাদ্রি উইলবারফোর্স ভূত দেখেছেন কি দেখেননি, তা জেনে আমাদের দরকার নেই। ভূতপ্রেতের অস্তিত্বে তাঁর আদৌ বিশ্বাস ছিল না তাঁর সম্পর্কে এটুকু মনে রাখলেই যথেষ্ট হবে। যে সময়কার ঘটনা সেই সময় ইংল্যাণ্ডের হ্যাম্পশায়ার জেলার এক গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ক্যাথলিক খ্রীষ্টান বাড়িতে তিনি কিছুদিনের জন্য অতিথি হয়েছিলেন।

ডিসেম্বর মাস। সন্ধের পড়াশুনা সেরে পাদ্রি উইলবারফোর্স পোষাক পাল্টালেন। শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছেন এমন সময় স্পষ্ট দেখলেন একজন প্রৌঢ় পাদ্রি তাঁর পাশ কাটিয়ে নেমে গেলেন লাইব্রেরির দিকে। পাদ্রি ধরে নিলেন ইনিও তাঁর মতই হয়ত একই পরিবারের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। একতলায় খাবার টেবলে বাড়ির গিন্নির পাশের চেয়ারে বসলেন উইলবারফোর্স, ডিনার খেতে খেতে হালকা গলায় খানিক আগে দেখা ঐ প্রৌঢ় পাদ্রির প্রসঙ্গ তুলে জানতে চাইলেন, তিনি কোন গির্জা থেকে এসেছেন।

"আপনি যাঁকে দেখেছেন বলছেন", বাড়ির গিন্নি জানালেন, "তিনি বহুদিন হল দেহত্যাগ করেছেন। বেঁচে থাকতে উনি ছিলেন আমাদের পারিবারিক বন্ধু। এদিকে এলে আমাদের বাড়িতে অতিথি হতেন। নানারকম সাংসারিক জটিলতায় উনি সাধ্যমত উপদেশ দিয়ে আমাদের সাহায্য করতেন। দেহ ত্যাগ করার পরে আজও উনি আমাদের মায়া কাটাতে পারেননি। প্রায়ই তাঁকে দেখা যায় বাড়ির লাইব্রেরিতে। বইয়ের তাকে কি যেন হাতড়ে বেড়ায় ওঁর আত্মা। বাড়ির কারও দিকে চোখ তুলে তাকাননা পর্যন্ত। নতুন লোক এলেও মুখ তোলেন না। উনি বড্ড একা, দয়া করে ওঁকে ভয় পাবেন না। উনি বেঁচে থাকতে ছিলেন এ বাড়ির ফাদার কনফেসর—বাড়ির লোকেরা মারা যাবার আগে কোনও কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করতে চাইলে ওঁকেই খবর দিয়ে ডাকিয়ে আনা হত। ওঁর কাছে স্বীকারোক্তি করার পরে মৃত্যুপথযাত্রী শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ফেলত।

যাকে এসব শোনানো, সেই পাদ্রি উইলবারফোর্স নিজে যে ভূতে ঘোর অবিশ্বাসী ছিলেন সে কথা গোড়াতেই উল্লেখ করেছি। খেয়েদেয়ে তিনি ঢুকলেন সেই পরিবারের লাইব্রেরিতে, অনেক রাত পর্যন্ত সেখানে বসে বহু সময় কাটালেন। বাড়ির সবাই যে যার ঘরে শুতে যাবার পরে লাইব্রেরিতে পাদ্রি উইলবারফোর্সের সামনে আচমকা আবির্ভূত হল সেই প্রৌঢ় পাদ্রির প্রেতাত্মা। উইলবাবফোর্স ভূত বিশ্বাস না করলেও চোখের সামনে পাদ্রির প্রেতাত্মাকে দেখে নিজের চোখকে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারলেন না। বলতে কি, প্রেতমূর্তি দেখে তিনি বেশ ঘাবড়ে গেলেন। জোর করে মন অন্যদিকে ঘোরাতে গিয়ে একসময় ঘুমিয়ে পড়লেন।

সকালের রোদ জানালা দিয়ে চোখে এসে পড়তে পাদ্রি উইলবারফোর্সের ঘুম ভাঙ্গল। চোখ মেলে দেখেন সকাল হয়েছে। আশপাশে তাকিয়ে দেখেন তিনি লাইব্রেরিতেই বসে আছেন। খানিক বাদে গত রাতের কথা তাঁর মনে পড়ল, মনে পড়ল বয়স্ক পাদ্রির অশরীরী প্রেতাত্মার আবির্ভাবের কথা। গত রাতে ঐ প্রেতাত্মার দিক থেকে মন অন্য দিকে ঘোরাতে গিয়ে কখন একসময় নিজের অজান্তে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন তিনি। টেবিলে মাথা রেখে সেই যে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন সারারাত সে ঘুম একটি বারের জন্যও ভাঙ্গেনি।

পাদ্রি উইলবারফোর্স এ-বিষয়ে নিশ্চিত হলেন যে তিনি বিশ্বাস করুন চাই না করুন তাতে ভূতেদের কিছুই আসে যায় না, তারা তাদের নিজেদের নিয়মে চরে বেড়ায় তাঁর আশেপাশে। গতরাতের দেখা বয়স্ক পাদ্রির ভূত তিনি মন থেকে সরিয়ে দিতে বহু চেষ্টা করেও পারলেন না। মজবুত থামের মতই সে তাঁর বিশ্বাসের ভিতের ওপর খাড়া হয়ে রইল। বেলা যত গড়াতে লাগল ততই সেই ভূত সম্পর্কে কৌতূহল দানা বাঁধতে লাগল তার মনে। পাদ্রিটি জীবিত থাকতে ছিলেন এই পরিবারের ফাদার কনফেসর। গৃহকর্ত্রির মুখ থেকে শোনা এই বিবৃতিটুকুই তাঁর যে কৌতূহল উসকে দিয়েছে।

দিন গেল, সূর্য ডুবল। সন্ধ্যের পরে অন্য দিনের চেয়ে কিছু আগে ডিনার খেয়ে নিলেন পাদ্রি উইলবারফোর্স। খেয়ে দেয়ে লাইব্রেরিতে এসে বই নিয়ে বসলেন। দু'চোখ বইয়ের পাতার দিকে নিবদ্ধ রাখলেও কান দুটি খোলা রাখলেন তিনি। খানিক বাদে সিঁড়িতে আওয়াজ হতেই কান খাড়া করলেন, কয়েক মুহূর্ত বাদে দরজার পাল্লা আপনিই গেল খুলে। চোখ তুলে উইলবারফোর্স দেখেন সেই বয়স্ক পাদ্রির বিদেহী আত্মা আবার আবির্ভূত হয়েছেন। গত রাতের মতই একেকটা তাকের কাছে গিয়ে তিনি দাঁড়াচ্ছেন আব বই নামিয়ে এক মনে সেগুলো উল্টে পাল্টে ঘাঁটছেন।

নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন উইলবারফোর্স, পা টিপে টিপে সেই বিদেহীর কাছে এসে সব ভয় ভুলে যেন জীবন্ত মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন এমনই স্বাভাবিক গলায় জানতে চাইলেন, "ভাই, জানতে পারি আপনি কি খুঁজছেন?"

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল সেই বিদেহী, মৃদু হেসে বলল, "যাক, এতদিন বাদে অন্তত একজন নিজে থেকে কথা বলল দেখে ভাল লাগছে। আগে এত আসা যাওয়া করেছি এ বাড়িতে, অথচ এখন কেউ কথা বলা দূরে থাক, আমার ধারে কাছে আসেনা। দূর থেকে ভয়ে ভয়ে তাকিযে সরে যায়। আমি কাছে গেলে ভয় পেয়ে বুকে ক্রস আঁকে। এখন দেখছি বেঁচে থাকার মত মৃত্যুর পরেও বিড়ম্বনার কমতি নেই। আমি কি খুঁজে বেড়াচ্ছি জানতে চাইছিলেন। তাই না? তবে শুনুন, জানেন দেহ ত্যাগ কবার আগে আমি ছিলাম এই পরিবারের ফাদার কনফেসার। এই পরিবারের কিছু লোক মারা যাবার আগে তাদের নানারকম পাপের স্বীকারোক্তি লিখিত ভাবে তুলে দিয়েছিলেন আমার হাতে। ঐসব স্বীকারোক্তিতে এমন কিছু পুরুষ ও নারীকে দোষারোপ করা হয়েছে যাবা শুধু এই পরিবারের সদস্যই নয়। আমার স্নেহের পাত্র পাত্রী। ঐসব লিখিত কনফেশন কোনও দিন তাদের বা এই পরিবারের আর কারও হাতে পড়লে অনেক গোপন বিষয় জানাজানি হবে। ফলে সংসারে মারাত্মক অশান্তি দেখা দিতে পারে। যতদূর মনে পড়ছে বেঁচে থাকতে এই বুককেসের মাথায় আমি ঐ কাগজগুলো একটা বড় কাপড়ের টুকরোয় জড়িয়ে রেখেছিলাম, কিন্তু ওগুলো পুড়িয়ে ফেলার আগেই আমার মৃত্যু হয়। এই একটি কারণেই আমি শান্তিতে ঘুমোতে পারছি না।"

"ব্রাদার, আপনি অনুগ্রহ করে একটু অপেক্ষা করুন।" পাদ্রি উইলবারফোর্স বললেন, "দেখছি আমি কোনভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি কিনা।" বলে একটি বড় কাঠের সিঁড়ি জোগাড় করে নিয়ে এলেন তিনি লাইব্রেরির অন্য প্রান্ত থেকে। তারপর নিজেই সিঁড়িতে চেপে ধাপের পর ধাপ পেরিয়ে পৌঁছ গেলেন সেই বুককেসের মাথায়। একটু খুঁজতেই একটা বড় কাপড়ের পুঁটলি তাঁর চোখে পড়ল। সেই পুঁটলি নিয়ে নিচে নেমে এলেন তিনি। বয়স্ক পাদ্রির আত্মা সেই কাপড়ের পুঁটলি দেখে হেসে বললেন, "হ্যাঁ। এর মধ্যেই সেগুলো আছে। "পুঁটলি খুলতে ভেতর থেকে বেরোল হাতে লেখা এক তাড়া কাগজ। পাদ্রি উইলবারফোর্স লাইব্রেরির দরজার ছিটকিনি ভেতর থেকে এঁটে মোমবাতির আগুনে সেসব কাগজ পুড়িয়ে ছাই করলেন। বয়স্ক পাদ্রির বিদেহী আত্মার মুখে এবার ফুটল পরিতৃপ্তির স্মিত হাসি। পাদ্রি উইলবারফোর্সকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন আর কখনও তিনি দেখা দেবেন না।

পাওইস ক্যাসল

ওয়েলশপুলের কাছাকাছি পাওইস ক্যাসল প্রাসাদ ছিল আর্ল অফ পাওইস-এর সম্পত্তি। লাল বেলে পাথরে গড়া এই প্রাসাদের উঁচু দুর্ভেদ্য পাঁচিল দেখলে মধ্যযুগের নিষ্ঠুর সামন্ততান্ত্রিক দুর্গ বলে মনে হলেও ভেতরে সে-সবের লেশমাত্র নেই। যে সময়ের কথা বলছি সেই ১৭৮০ খৃষ্টাব্দেও সে যুগের বিলাসবহুল জীবন যাত্রার যাবতীয় উপাদান ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল পাওইস ক্যাসল প্রাসাদের আনাচে-কানাচে। সেই সঙ্গে অবশ্যই ছিল এমন একটি ঘর যেখানে ভূতেরা নিয়মিত যাওয়া আসা করত। নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে তাদের কেউ ঐ ঘরে বসে কখনও জুড়ে দিত গিটকিরি গান। সেই গান থামতে না থামতেই শুরু হত পিয়ানোর বাজনা যদিও ঐ ঘরে পিয়ানো বা অর্গান কিছুই ছিল না। আবার বাজনা থামতে না থামতে সেই ঘরের ভেতর শুরু হত উদাত্ত গলায় আবৃত্তি। পাওইস ক্যাসল প্রাসাদের ভূতেরা ছিল রুচিশীল ও সাংস্কৃতিক চেতনা সম্পন্ন। তবে তাদের সবচেয়ে বড় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এটাই ছিল যে তারা যা কিছু করত সব ঐ একটি কামরায় বসে ভয় দেখানোর মতলবে, ঐ ঘরের বাইরে ভুলেও পা রাখত না তারা।

প্রাসাদের কাছেই থাকত এক গরীব বিধবা যুবতী। ভরা যৌবন যখন ছিল তখন অনেককে ভালবাসার ফাঁদে ফেলে শুয়ে খেয়েদেয়ে তারপর ছিবড়ে হয়ে গেলে আঁটির মত ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। কথায় বলে, পাপের পয়সা বেশিদিন থাকে না। মেয়েটির বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হলনা—বোকাবুদ্ধু ধনী পুরুষদের সঙ্গে প্রেম ভালবাসার অভিনয় করে তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে রোজগার যেটুকু করেছিল ফুটানি করতে গিয়েই সেসব ওড়াল সে। যৌবন নিঃশব্দে চলে যাবার পরে মেয়েটির সত্যিই সঙ্কটের দিন ঘনিয়ে এল। আর কোনও পথ না পেয়ে তখন চরকার সুতো বুনে সেই সুতো বাজারে বিক্রি করে পেট চালাতে লাগল সে। কিন্তু হাটে সুতো বিক্রি করে যে টাকা তাতে আসে তাতে কোনমতে পেট চালানো গেলেও মোটামুটি খাওয়ার পরার ব্যবস্থা হয় না। বাঁচার আর কোনও পথ নেই দেখে সে একদিন সোজা এসে হাজির হল পাওইস ক্যাসল প্রাসাদে, খাস আর্দালির সঙ্গে দেখা করে বলল বিশেষ দরকারে সে জমিদারের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

জমিদার ক'দিন আগে পরিবারের সবাইকে নিয়ে বিদেশে গেছেন, যাবার আগে প্রাসাদে দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে গেছেন নায়েব আর কাজের লোকেদের হাতে। জমিদারতন্ত্রের জমানায় নায়েব নিজেই যে জমিদারি মেজাজে ওঠাবসা করে,....একথা আলাদা করে বোঝানোর দরকার নেই। প্রাসাদের এক মহলে একটি ঘর তাকে দিয়েছেন জমিদারমশাই, বৌকে নিয়ে নায়েব সেখানেই থাকে। তাদের কর্তাগিন্নির হুকুম তামিল করতে করতে প্রাসাদের পুঁচকে চাকর আর কাজের মেয়েগুলোর নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়।

নায়েবের জেরায় সেই বিধবা যুবতী বলেই ফেলল যে স্বামী মারা যাবার পর সুতো কেটে কোনরকমে সে টিকে আছে। প্রাসাদের ঘরদোর মোছা কি বাসন মাজার কাজও যদি নায়েবমশাই তাকে জুটিয়ে দেন ত সে মোটামুটি খেয়ে পরে বাকি জীবন কাটাতে পারে।

মেয়েটির আর্জি শুনে নায়েবের প্রাণে দয়া আর দুষ্টুবুদ্ধি একসঙ্গে দুটোই দেখা দিল। তখনই গিন্নিকে ডাকিয়ে এনে মেয়েটিকে তাদের নিজেদের পুরো সময়ের কাজের মেয়ে হিসেবে রাখতে বলল সে। তারপর বৌকে আলাদা করে ডেকে প্রাসাদের একটি বিশেষ ঘরে মেয়েটির থাকার ব্যবস্থা করতেও বলে দিল। নায়েবকে প্রাণ ভরে ধন্যবাদ জানিয়ে মেয়েটি কাজকর্ম বুঝে নিতে নায়েবে বৌ-এর পেছন পেছন তাদের ঘরে গেল।

তখন বিকেল। শীতের বেলা পড়ে এসেছে, সন্ধ্যে হতে দেরি নেই। ভারি কাজকর্ম কিছু হাতে ছিল না। তাই মেয়েটিকে তাড়াতাড়ি ডিনার খাইয়ে কাজের লোকেদের দিয়ে তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে পাঠিয়ে দিল নায়েব গিন্নি। মেয়েটি জানতেও পারল না যে ঘরে নায়েব তাকে দয়া করে থাকতে দিয়েছেন ভৌতিক বলে সেই ঘরের যথেষ্ট দুর্ণাম আছে—দামি পোষাক পরা খুব সুন্দর চেহারার এক অচেনা লোককে প্রাসাদের কাজের লোকেরা প্রায়ই ঢুকতে দেখে ঐ ঘরে। কিন্তু অচেনা লোকটিকে ঐ ঘর থেকে তারা কখনও বেরোতে দেখেনি। নিজের ইচ্ছেমতন সে সেখানে যখন তখন ঢোকে। কাজের লোক বা মেয়েরা কেউ গেলে তাদের চোখের সামনে উধাও হয় সে নিমেষের মধ্যে।

নায়েব গিন্নির হুকুমে কাজের লোকেরা তাড়াহুড়ো করে সে ঘর সাফ করল। একটা রাতের মত প্রচুর শুকনো কাঠে আগুন দিয়ে গুঁজে দিল ফায়ারপ্লেসে। খাটে বিছানা পাতল। হাতের কাছে টুলে রাখল জগ ভর্তি জল। একখানা পুরোনো চেয়ার এনে ফায়ারপ্লেসের সামনে রাখল। সবশেষে মেয়েটিকে সেই ঘবে ঢুকিয়ে একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়ে চাপা হাসি হাসতে হাসতে বিদায় হল তারা।

কাজের লোকেরা চলে যেতে দরজা ভেজিয়ে আগুনের ধারে চেয়ারে বসল মেয়েটি। গা গরম করতে করতে চারপাশে তাকিয়ে ঘরের বিলাসবহুল সাজসজ্জার দিকে তাকিয়ে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। স্বামীর কথা একবার উঁকি দিল তার মনে। ভাবল, আহা পেট পুরে খেতে না পেয়ে ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে মারা যাবার আগে কত কষ্টই না পেয়েছে বেচারা। আজ যদি সে থাকত। এই সুখের রাতে যদি তাকে পেত সে সঙ্গী হিসেবে। গনগনে আগুনের দিকে চেয়ে এসবই ভাবছে সে এমন সময় সে স্পষ্ট অনুভব করল ঘরের ভেতর সে একা নেই। কথাটা মনে হতে ঘাড় ফেরাল সে, চমকে উঠে দেখল সত্যিই তার অজান্তে একজন অচেনা পুরুষ কোন ফাঁকে এসে ঢুকে পড়েছে ভেতরে, ঘরময় নিঃশব্দে পায়চারি করে চলেছে সে। লোকটিকে দেখতে সুপুরুষ, পরনে দামি রেশমি পোষাক। আর যেই হোক, সে যে প্রাসাদের কাজের লোক নয় তা তার পোষাকের দিকে চোখ পড়তেই বুঝতে পারল সে। পায়চারি করতে করতে লোকটি আচমকা মুখ তুলে তার দিকে তাকাল আর সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল। লোকটি যে অশরীরী সে-বিষয়ে এবার নিঃসন্দেহ হল মেয়েটি। সঙ্গে বাইবেল নিয়ে এসেছিল সে, ভয়ে ভয়ে বাইবেল খুলে কয়েকটা পাতা পড়ল সে। চেয়ার ছেড়ে উঠে শুতে যাবে এমন সময় সেই মূর্তি আবার দেখা দিল। আবার নিজের মনে ঘরের ভেতর পায়চারি শুরু করল সে। প্রথম ভয়ের রেশ ততক্ষণে মেয়েটির মন থেকে কেটে গেছে। সাহসে ভর করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে সেই অশরীরীর কাছে এসে দাঁড়াল সে, বিনীত ভাবে জানতে চাইল, "আজ্ঞে আপনি কে, এখানে কিছু খুঁজতে এসেছেন? আমি আপনার কোনও কাজে লাগতে পারি?"

“পারো”, অশরীরী আঙুল তুলে ম্যান্টেলপিসের ওপর রাখা মোমবাতিটা ইশারায় দেখিয়ে বলল ‘ওটা নিয়ে আমার সঙ্গে এস।”

মোমবাতিটা নিয়ে মেয়েটি কাছে আসতেই ঘরের এককোণে দেয়ালের গায়ে একটা জায়গা দেখিয়ে ঠেলতে বলল অশরীরী। মেয়েটি ঠেলতেই দেয়ালের খানিকটা জায়গা ফাঁক হয়ে ছোট দরজা তৈরি হল। মোমবাতির আলোয় মেয়েটি দেখল সেটা একটা চোরকুঠরি। চারপাশে দেয়াল। অশরীরী এবার মেয়েটিকে সেই চোরকুঠরিতে ঢুকতে ইশারা করল।

এতক্ষণে ভয় দেখা দিল মেয়েটির মনে। তাকে ভেতরে ঢুকিয়ে অশরীরী পাছে দেয়াল বন্ধ করে উধাও হয় এই ভয় দেখা দিল তার মনে। সে ভেতরে না গিয়ে ইতস্তত করতে লাগল। তার মনের ভাব আঁচ করে অশরীরী বলে উঠল, “ভয় নেই, ভেতরে যাও, আমার কথামত কাজ করলে আর কখনও এ বাড়িতে আসব না। আমি তোমার কোনও ক্ষতি করব না। কথা দিচ্ছি।’ আশ্বাস পেয়ে মেয়েটি ঢুকল সেই চোরকুঠরিতে। বাইরে দাঁড়িয়ে অশরীরী মেঝেতে আঁটা বোর্ডের একটা জায়গা দেখিয়ে বলল, “ঐখানে আছে খুঁড়লেই পাবে।” বলেই অদৃশ্য হল সে।

মেয়েটি এবার চোরকুঠরি থেকে বেরিয়ে এল। ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসতেই শুনতে পেল একতলায় প্রচুর হৈচৈ অনেক লোকের গলা। একজন কাজের লোককে দেখে মেয়েটি জানতে চাইল ব্যাপার কি। উত্তরে সে জানাল, জমিদার মশাই খানিক আগে সপরিবারে ফিরে এসেছেন। তখনও রাত বেশি হয়নি, মেয়েটি পা চালিয়ে নেমে এল একতলায়। সাহসে ভর করে জমিদার মশাইয়ের কাছে গিয়ে তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে তার কথা খুলে বলল সে।

তার কথা শুনে চমকে উঠলেন জমিদার। তাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তখনই এসে হাজির হলেন সেই ঘরে। চোরকুঠরি দেখে বুঝলেন মেয়েটি বাজে কথা বলছেনা। মেয়েটি মেঝের যে জায়গা দেখাল কাজের লোকদের ডাকিয়ে সে জায়গাটা জমিদার তখনই খুঁড়ে ফেললেন। মেঝে খুঁড়তেই একটা ছোট লোহার বাক্স তাঁর চোখে পড়ল। সেই বাক্স তুলে এনে জমিদার অবাক, দেখেন তার ঢাকনায় মজবুত তালা আঁটা আর সেই তালার গায়ে জ্বলজ্বল করছে রাজার সীলমোহর। এ সম্পত্তি রাজার তাতে তাঁর কোনও সন্দেহ রইল না। পরদিন সকাল হতে জমিদার সেই বাক্স নিয়ে ছুটে এলেন রাজধানীতে। রাজার সঙ্গে দেখা করে সব জানিয়ে বাক্সখানা তুলে দিলেন তাঁর হাতে। জমিদারের সামনেই রাজা সীলমোহর ভেঙ্গে সেই বাক্সের ঢাকনা খুললেন। বাক্সের ভেতর থেকে বেরোল কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলিল। দলিলগুলো দেখে রাজা খুব খুশি হলেন। বেশ কিছুদিন হল তিনি ওগুলো খুঁজে পাচ্ছিলেন না। যিনি দলিল শুদ্ধ বাক্স নিয়ে এলেন পাওইস ক্যাসল প্রাসাদে সেই জমিদারের পরলোকগত কাকা ছিলেন রাজদরবারে বিদেশ কূটনৈতিক দপ্তরের বড় আমলা। অবসর সময়ে খুঁটিয়ে পড়বেন বলে তিনি ক'বছর আগে ওগুলো প্রাসাদের এক চোরকুঠরিতে গচ্ছিত রেখেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত আচমকা হার্টের অসুখে তিনি মারা যান। শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে ঐসব দলিলের হদিশ তিনি তাঁর ভাইপোকে দিয়ে যেতে পারেননি। রাজা এবার পাওইস ক্যাসলের জমিদারের কাছে জানতে চাইলেন এতদিন বাদে ঐ দলিলের বাক্স কিভাবে তিনি খুঁজে পেলেন। জমিদার লন্ডনে আসার আগেই শুনেছেন এক গরীব বিধবা মেয়েকে নায়েবের বৌ প্রাসাদে আশ্রয় দিয়েছেন, সেই মেয়েটিই ঐ বাক্স খুঁজে বের করেছে। শুনে রাজা বললেন ঐ গরীব বিধবা যুবতীকে এজন্য

তিনি কিছু পুরস্কার দিতে চান। তাঁর প্রাসাদের আশেপাশে ছোট বড় অনেক অতিথি নিবাস খালি পড়ে আছে। তার একটিতে তিনি ঐ যুবতীর আজীবন খাওয়া পরার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। জমিদারশাই ফিরে এসে রাজার সেই প্রস্তাব শোনাল সেই আশ্রিতা গরীব বিধবাকে। রাজার অনুগ্রহে তার বাকি জীবনেব খাওয়া পরার অভাব গেল ঘুঁচে। এ যেন রূপকথায় গল্পও তবে মানতেই হবে সেই অচেনা অশবীরী যিনি নিঃসন্দেহে জমিদার মশাইয়ের বাচ্চার অতৃপ্ত আত্মা। তিনি কৃপা করেছিলেন বলেই না সেই গরীব অসহায় যুবতীর কপালে ছুটল রাজার অনুগ্রহ। তার বাকি জীবনের খাওয়া পরা থাকার অভাবও ঘুচল।

পাইওস ক্যাসল

কেনসিংটনের রহস্যময়ী

১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাস। বড়দিনের উৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপনের জন্য সেজে উঠেছে লন্ডন। কেনসিংটন এলাকায় এক গির্জায় আসন্ন বড়দিন উপলক্ষে গাইয়ে বাজিয়েরা মহড়া দিচ্ছে।

সে দিন ছিল রবিবার। মহড়া ও সপ্তাহান্তি প্রার্থনা-পর্ব সেরে পাদ্রিমশাই বাড়ি যাবেন বলে সবে গির্জা থেকে বেরিয়ে রাস্তার ধারে এসেছেন এমন সময় একটি ট্যাক্সি এসে থামল তাঁর সামনে, ভেতর থেকে নেমে এলেন এক সুসজ্জিতা যুবতী। পাদ্রিকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, "আমার বিশেষ পরিচিত এক ভদ্রলোক মরতে বসেছেন। ফাদার মৃত্যুর আগে উনি আত্মার মুক্তির উপায়ে জানতে আগ্রহী হয়েছেন। আর তাই আপনাকে নিয়ে যেতে তিনি আমায় পাঠিয়েছেন।'

একজন মৃত্যুপথযাত্রী খৃষ্ঠান আত্মার মুক্তির উপায় জানতে তাঁকে ডাকছেন শুনেই পাদ্রিব মনে করুণা জাগল। কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি সেই যুবতীর সঙ্গে ট্যাক্সিতে চাপলেন। কিন্তু দূর যাবার পরে একটি বড়সড় বাড়ির সামেনে যুবতী ট্যাক্সি দাঁড় করাল। পাদ্রি লক্ষ্য করলেন তার দু'চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে। "ঐ বাড়ি, ফাদার", যুবতী চোখের জল ফেলতে ফেলতে পার্স বের করল। 'আপনি ভেতরে যান। আমি ভাড়া মিটিয়ে আসছি।" পাদ্রি সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়লেন ট্যাক্সি থেকে। সদর দরজা খোলা দেখে ঢুকে পড়লেন একতলার ড্রইং রুমে। তাঁকে দেখে বাড়ির খাস আর্দালি কৌতূহলী চোখে এগিয়ে এল। জানতে চাইল, "বলুন ফাদার, কি করতে পারি আপনার জন্য?'

"হয়ে হয়েছে", পাদ্রি দেখলেন তাড়াহুড়োর মাথায় যুবতীর কাছ থেকে তাঁর চেনা মৃত্যুপথযাত্রীর নাম আর পদবিও তাঁর জানা হয়নি। আমতা আমতা করে তাই তিনি বললেন, "তোমার মনিব শুনলাম খুব অসুস্থ, এখন তখন অবস্থা, তা তিনি কোথায়?"

"আমার মনিব?" পাদ্রির কথা শুনে খাস আর্দালি অবাক হল। বলল, "কই না ত, ফাদার, আপনাকে হয়ত কেউ ভুল খবর দিয়েছেন। আমার মনিব দিব্যি সুস্থদেহে হাঁটাচলা করছেন। ঐ যে তিনি এদিকেই আসছেন। তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির মনিব নিজেই এসে সেখানে হাজির হলেন। পাদ্রি দেখলেন খাস আর্দালি ঠিকই বলেছে। তার মনিব রীতিমত স্বাস্থ্যবান ও সুপুরুষ। বাইরে থেকে দেখে অসুস্থ বলে মনেই হয় না।

কিন্তু তাহলে। ফাদার দু'পা পিছিয়ে এসে দরজা দিয়ে বাইরে তাকালেন যে তাকে ডেকে এনেছে সেই সুশ্রী যুবতী কোথায় গেল দেখতে। কিন্তু বাইরের দিকে তাকিয়ে তিনি সেই যুবতী বা ট্যাক্সি কিছু দেখতে পেলেন না। যুবতী আর ট্যাক্সি একই সঙ্গে উধাও হয়েছে ভোজবাড়ির মত। 'আসুন ফাদার', বাড়ির মালিক সেই সুপুরুষ স্বাস্থ্যবান ভদ্রলোক ফাদারকে ড্রইংরুমে বসিয়ে বললেন, "আমার স্বাস্থ্য এখন খুবই ভাল ঠিকই কিন্তু মনে একদম শান্তি পাচ্ছিনা, মন সবসময় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছটফট করছে। আত্মার মুক্তির উপায় প্রসঙ্গে আপনার উপদেশ শোনার ইচ্ছে হয়েছিল ক'দিন ধরে। কিন্তু আপনি নিজেই যে শেষ পর্যন্ত কৃপা করে পায়ের ধুলো

দেবেন আমার বাড়িতে তা একবারও ভাবিনি। আচ্ছা ফাদার, সত্যি করে বলুন ত, আপনাকে যে আমার প্রয়োজন তা আপনি টের পেলেন কি করে?"

"কেন, আপনিই ত ঐ ভদ্রমহিলাকে দিয়ে খবর পাঠালেন', বলে ফাদার খানিক আগের ঘটনা পুরোপুরি তাঁকে বললেন, শুনে ভদ্রলোক ত থ।

"ফাদার, আপনি বলছেন বটে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, তেমন কোনও ঘটনা বাস্তবে ঘটেনি। আপনাকে খবর দেবার জন্য আমি কাউকে পাঠানো দূরে থাক, কাউকে বলিনি। চেহারায় যে বর্ণনা দিচ্ছেন, ঐ-রকম দেখতে কোনও মহিলাকেও আমি কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ছেনা। তা বাদ দিন ওসব। আসলে সবই যোগাযোগ। একবার আপনাকে যখন পেয়েছি তখন এমনিতে ছাড়ছিনা। আমার মনের বোঝা হালকা করে তবে আপনার ছুটি।"

ঘটনার আকস্মিকতায় ফাদার নিজে এমন বিভ্রান্ত হয়েছিলেন যে ভদ্রলোকের সঙ্গে মন খুলে কথাবার্তা বলতে পারলেন না। বিদায় নেবার আগে ভদ্রলোককে পরদিন গির্জায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ দিলেন।

আশ্চর্যের বিষয়। পরদিন ভদ্রলোক গির্জায় গেলেন না। কৌতূহলী ফাদার তাঁর খোঁজ নিতে আবার এলেন সেই বাড়িতে। খাস আর্দালির মুখ থেকে ফাদার শুনলেন আগের দিন তিনি বিদায় নেবার মিনিট পনেরো বাদেই তার মনিব বুকে প্রচন্ড ব্যথা অনুভব করেন। ডাক্তার আসার আগেই তিনি মারা যান।

আর্দালির মুখ থেকে এ-খবর পেয়ে ফাদার দুঃখ পেলেন, মনে মনে ভাবলেন লোকটিকে গির্জায় আসতে না বলে গতকালই তার মানসিক শান্তির উপায় বলে দিলে তিনি ভাল করতেন। ভাবতে ভাবতে আচমকা দেয়ালে টাঙ্গানো একটি মাঝারি আকারের ফটোর দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠলেন তিন। গিল্টি করা ফ্রেমে বাঁধানো এক সুশ্রী যুবতীর ফটো। আর এ সেই অচেনা রহস্যময়ী যুবতী যার ডাকে সাড়া দিয়ে গতকাল তিনি এ বাড়িতে এসেছিলেন। তাঁকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে যে ট্যাক্সি সমেত উধাও হয়েছিল ভোজবাড়ির মত। "ওহে", ইশারায় সেই ছবিটা দেখিয়ে আর্দালিকে প্রশ্ন করলেন ফাদার, "ওটা কার ফটো?"

"আজ্ঞে ওটা আমার মনিবের স্ত্রীর ফোটো, ফাদার," খাস আর্দালি বলল, "আজ থেকে বছর পনেরো আগে এই বাড়িতেই উনি মারা যান।"

মেজর হলেন কুকুর ভূত

ইংল্যান্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূতপ্রেতের দখলে যত পুরোনো বাড়ি আছে তাদের মধ্যে বালেচিন হাউস বিশেষ বৈশিষ্ট্য অনায়াসে দাবি করতে পারে। গোড়াতেই বলে রাখা ভাল পার্থশায়ারের বালিনলুইগ্ রেলস্টেশন থেকে আধমাইল দূরে লোগিয়ারেইটে অবস্থিত বালেচিন হাউস-এর ওপরে নিচে ভেতরে বাইরে এমন কোনও ছাপ নেই যা দেখলে ঐ বাড়ি ভূতের আড্ডা বলে মনে হতে পারে।

ষোড়শ শতাব্দী থেকে ঐ বাড়ি আছে স্টুয়ার্ট পরিবারের দখলে। মজার ব্যাপার হল, বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝা না গেলেও ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে শেষ, হবার আগেই বালেচিন হাউস-এর কপালে জুটল ভুতুড়ে দুর্নাম। মোটা টাকা আগাম দিয়ে যে ঐ-বাড়ি ভাড়া নেয় তারই পেছনে ভূতেরা দল বেঁধে লাগে। তাদের অত্যাচারে ভাড়াটে বেচারাকে ত্রাহিত্রাহি ডাক পাড়তে হয়। দেখতে দেখতে ভূতেদের র‍্যাগিং জাতীয় অত্যাচার এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছোয় যখন আগাম ভাড়া ফেরত পাবার মায়া বিসর্জন দিয়ে ভাড়াটেকে মালপত্র নিয়ে সে বাড়ি ছেড়ে উর্দ্ধশ্বাসে পালাতে হয়। যখনকার ঘটনা মার্কুইস অফ বুট তখনও জীবিত ; পরামনোবিজ্ঞান ও অতীন্দ্রিয় গবেষণা সমিতির এই সক্রিয় সদস্য পরলোক চর্চায় ছিলেন বিশেষ আগ্রহী। স্টুয়ার্ট পরিবারের ঐ বাড়িটির দুর্ণাম কতদূর সত্যি এবং সত্যি হলে তার আসল কারণ কি তা খুঁজে বের করার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি এবং সমিতির সাধারণ সভায় ঐ প্রস্তাব তুললেন। সমিতির কর্মকর্তারা সানন্দে তাঁর প্রস্তাবে রাজি হলেন পরীক্ষা চালানোর যাবতীয় দায়িত্ব সমিতির পক্ষ থেকে মার্কুইস অফ বুটকে দেওয়া হল এবং এই উদ্দেশ্যে বাড়িটি ভাড়াও নেওয়া হল। অশরীরী জগতের অস্তিত্বের প্রভাব সত্যিই ও-বাড়িতে আছে কিনা সে বিষয়ে পরীক্ষা শুরু করার আগে মার্কুইস অফ বুট-এর সহযোগীরা ঐ বাড়ি সম্পর্কে নানারকম খোঁজখবর নিলেন। খোঁজ নিয়ে তাঁরা জানলেন ১৮৩৪ থেকে ১৮৭৬ এই সময়ের মধ্যে বালেচিন হাউস-এর মালিক ছিলেন জনৈক মেজর স্টুয়ার্ট। নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যাবার আগে তিনি নিজের মেজো ভাগ্নেকে আইনের সাহায্যে পোষ্যপুত্র নেন। অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাকি আত্মীয়দের মধ্যে সমানভাবে ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিলেও মেজর স্টুয়ার্ট বালেচিন হাউস-এর মালিকানা দিয়ে যান শুধু তাঁর পোষ্যপুত্রকেই। বালেচিন হাউস সম্পর্কে নানারকম প্রশ্ন করে সমিতির সদস্যরা জানলেন মেজর স্টুয়ার্ট নিজে পুনর্জন্মে বিশ্বাস করতেন। প্রায়ই বলতেন মৃত্যুর কিছুদিন পরে তিনি আবার ফিরে আসবেন। মেজরের ছিল কুকুর পোষার শখ, চোদ্দটা কুকুর বাড়িতে সারাদিন দাপিয়ে বেড়াত তাদের মধ্যে কুচকুচে কালো রঙের একটি স্প্যানিয়েল ছিল তাঁর খুব প্রিয়। পুনর্জন্মের প্রসঙ্গে মেজর স্টুয়ার্ট বাড়ি ভর্তি লোকজনের সামনে বলেন, মারা যাবার পরে তিনি তার প্রিয় ঐ স্প্যানিয়েলের দেহে ভর করবেন।

পরলোকচর্চায় মেজর স্টুয়ার্টের আগ্রহের কথা তাঁর আত্মীয়দের অজানা ছিল না। তাঁর বিপুল সম্পত্তির কিছু না কিছু অংশ ভাগে পেলেও বসতবাটি প্রাসাদোপম 'বালেচিন হাউস' পুরো বেহাত হওয়ায় তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ ছিল তারা সবাই। পাছে মেজর স্টুয়ার্টের আত্মা সত্যিই

তাঁর পোষা কুকুরের দেহে ভর করে এই ভেবে তাঁর পোষা চোদ্দটা কুকুরকে একসঙ্গে গুলি করে মেরে ফেলল তারা। তাঁর বড় আদরের কালো স্প্যানিয়েলটাকেও রেহাই দিলনা।

কিন্তু গুলি করে পোষা কুকুরদের মেরে মেজরের আত্মার পুনর্জন্মের পথ বন্ধ করলেও তাঁর আত্মার সঙ্গে লড়াই করা যে খুবই দুঃসাধ্য হবে তা কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর ক্ষুব্ধ আত্মীয়বর্গ টের পেল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, মেজর বেঁচে থাকতেই এদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল তাঁর পোষ্যপুত্রের স্ত্রী অর্থাৎ ভাগ্নে বৌ। অসুস্থ মামাশ্বশুবের অজান্তে বৌটি প্রায়ই তাঁর প্রিয় স্প্যানিয়েলের বরাদ্দ মাংস থেকে খানিকটা সরিয়ে ফেলত ; আবার কখনও বেচারা হয়ত খেয়েদেয়ে প্রভুর স্টাডির দরজার বাইরে হাত পা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছে ; দেখতে পেয়ে ভাগ্নে বৌ ফায়ারপ্লেস খোঁচানো লোহার সিকের খোঁচা মেরে দিল তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে। এইভাবে কুকুরটাকে মেজরের বৌ নানাভাবে উত্ত্যক্ত করত। মেজর স্টুয়ার্ট মারা যাবার পরে তাঁর স্টাডিকে ড্রেসিংরুম বানিয়ে তুলল, সেখানে সাজগোজ করতে বসে একেকসময় মামাশ্বশুরের পোষা স্প্যানিয়েলের অস্তিত্ব স্পষ্ট অনুভব করত সে, কখনও অনুভব করত একজোড়া থাবা নখ দিয়ে তার পা আঁচড়াচ্ছে। এমন ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে বৌটি ভয় পেয়ে চেঁচামেচি করে বাড়ি মাথায় তুলত, চেঁচাতে চেঁচাতে ওপরে এসে নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ত। কিন্তু তাতেও রেহাই পেতনা, ঝাঁকড়া লোমওয়ালা কুকুর জাতীয় একটা অদৃশ্য জানোয়ার তার পায়ের ওপর মাথা রেখে শুয়ে আছে দিব্যি টের পেত সে। খানিকবাদে সেই অদৃশ্য জানোয়ারের নখের মৃদু আঁচড় পায়ে লাগতে ভয়ে দিশাহারা হয়ে বৌটি চেঁচিয়ে উঠত আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হত অদ্ভুত আওয়াজ— কুকুরের ভৌ ভৌ আর বয়স্ক পুরুষের অট্টহাসি। দুটো আওয়াজই যে বৌটির খুব চেনা ঠেকত তা বলা বাহুল্য। মামাশ্বশুর মারা যাবার পর তাঁর সম্পত্তি ভাগ্নে বৌটি খুব শান্তিতে ভোগ করতে পারেনি, সে আরেক কাহিনী।

১৮৯৫-এর জানুয়ারি মাসের একটি দিন। সকালেবেলা ব্রেকফাস্ট টেবলে মেজর স্টুয়ার্টের ভাগ্নে তার প্রতিনিধির সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করছে এমন সময় বাইরে থেকে দরজার পাল্লায় পরপর তিনবার টোকা পড়ল। ভাগ্নে চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিল কিন্তু কাউকে দেখতে পেলনা। মন থেকে আমল না দিলেও ঘটনাটা বৌকে শোনাল সে। প্রতিনিধি চলে যাবার পরে পোষাক পাল্টে ট্রেনে চেপে লন্ডন রওনা হল সে। সেই যাওয়াই তার শেষ যাওয়া। আর ফিরে এলনা সে। লন্ডনে পৌঁছে ট্রেন থেকে নেমে স্টেশনের বাইরে আসার কিছুক্ষণ পরে এক ছুটন্ত ঘোড়ার গাড়ির নিচে চাপা পড়ল মেজর স্টুয়ার্টের ভাগ্নে। চারটে ঘোড়ার আটটা পা আর গাড়ির চারটে চাকার নিচে পড়ে তার দেহ দলে পিষে টুকরো টুকরো হল। এই ঘটনার বিবরণ শুনে অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব বিশারদ মার্কুইস অফ বুট বললেন ভাগ্নেকে তার আসন্ন মৃত্যু সম্পর্কে হুঁশিয়ার করতেই ঘটনার দিন সকালে মেজর স্টুয়ার্টের বিদেহী আত্মা তার ঘরের বন্ধ দরজায় বাইরে থেকে তিনবার টোকা দিয়েছিল। সেই আওয়াজকে কাজে বাধা ধরে নিয়ে ঐদিন লণ্ডনে রওনা না হলে হয়ত ঐ শোচনীয় পরিণতি এড়ানো সম্ভব হত।

এরপরে অতীন্দ্রিয় চর্চা সমিতির সদস্যরা নির্দিষ্ট দিনে দল বেঁধে বালেচিন হাউস-এ এলেন সেখানকার ভৌতিক কাণ্ডকারখানা স্বচক্ষে দেখতে। খেয়ে দেয়ে রাতটা ঐ বাড়িতেই কাটালেন

তাঁরা। খাওয়া দাওয়া সেরে ড্রইংরুমে বসেছিলেন সবাই, এমন সময় একটা বড়সড় কালো লোমওয়ালা স্প্যানিয়েল কোথা থেকে এসে ঢুকে পড়ল সেই ঘরে। সমিতির সদস্যদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন মেজর স্টুয়ার্টের সঙ্গে যাঁদের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় ছিল। সবাই লক্ষ্য করলেন কুকুরটা বেছে বেছে তাঁদের কাছে গিয়ে ঘনঘন লেজ নাড়ছে, গায়ে গা ঘষছে, জিভ দিয়ে গাল চেটে দিচ্ছে। হাবভাব দেখে বেশ বোঝা গেল তাঁদের দেখে তার খুব আনন্দ হয়েছে। উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে একজন ছিলেন গেঁটেবাতের রুগি একখানা বড় সেকেলে ক্যামেরা তিনি নিয়ে এসেছিলেন। তখন ও ফিল্ম-এর জমানা চালু হয়নি, ক্যামেরায় পেছনে কেমিক্যাল মাখানো প্লেট লাগিয়ে ফোটো তোলা হত। সেইরকম প্লেট ক্যামেরায় এঁটে সেই সদস্য লেন্স তাক করলেন মেজরের স্টাডির দিকে। ড্রইংরুমে যে কালো লোমওয়ালা স্প্যানিয়েলটা ঘুড়ে বেড়াচ্ছিল সেটা আচমকা যেমন এসেছিল আচমকাই উধাও হল। খানিক বাদে যিনি ক্যামেরা তাক করেছিলেন তিনি স্পষ্ট দেখলেন একটা অস্বভাবিক বড আকারের কালো স্প্যানিয়েল, একেকবার দৌড়ে স্টাডিতে গিয়ে ঢুকছে, আবার খানিক বাদে বেরিয়ে যেন হাওযায় মিলিয়ে যাচ্ছে। তাঁর আহ্বানে উপস্থিত অন্যান্য সদস্যরাও এগিয়ে এসে ক্যামেরায় চোখ রেখে সেই স্প্যানিয়েল দেখা দিতেই তাকে ধরতে হাত বাড়ালেন। কিন্তু তাঁদের দু'জনেরই হাত সেই স্প্যানিয়েলের দেহ গলে বেরিয়ে এল। স্প্যানিয়েলটি নিজেও তখনই উধাও হল। তারপর তাঁরা ড্রইংরুমে ফিরে এসে মেজর স্টুয়ার্টের শেষ বাসনার প্রসঙ্গ তুললেন—মৃত্যুর পর ফিরে এসে তনি তাঁর প্রিয় স্প্যানিয়েলের দেহে ভর করবেন মেজরের ওপর ক্ষুব্ধ তাঁর আত্মীয়রা আগে থাকতে সেই স্প্যানিয়েলকে গুলি করে মেরেও হেরে গেলেন, মেজরের আত্মা তাঁর প্রিয় কুকুরেব আত্মার রূপেই আবির্ভূত হয়ে শেষ বাসনা পূর্ণ করলেন।

বাকি রাতটুকু ঐ বাড়িতেই কাটালেন সদস্যরা। শুধু এক স্প্যানিয়েল নয়, তার বিদেহী আত্মার লেজ ধরে মেজরের চোদ্দটা কুকুরের ভূতও এসে হাজির হল, তাদের সমবেত ভেউ ভেউ চিৎকারে গোটা বাড়ি মাথায় উঠল। সদস্যরা দেখলেন এত ভারি মজার ব্যাপার—একটা কুকুরও ধারে কাছে চোখে পড়ছে না অথচ কি প্রচণ্ড চেঁচামেচি জুড়েছে। পাশাপাশি শুরু হল বন্ধ দরজার পাল্লায় ধাক্কাধাক্কি, যে ঘরে সদস্যরা শুয়েছিলেন সে ঘরের ছিটকিনি আঁটা দরজার পাল্লায় বাইরে থেকে কে যেন থেকে থেকে ধাক্কা দিতে লাগল। কিন্তু যতবার দরজা খুলে তাঁরা বাইরে এলেন ততবার তাঁদের নিরাশ হতে হল কারণ বাইরে জীবন্ত কোন প্রানী তাঁদের চোখে পড়ল না। উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে ছিলেন দু'জন মহিলা, অন্য একটি ঘরে একটি খাটে পাশাপাশি শুয়েছিলেন তাঁরা। ভুতুরে কুকুরদের চেঁচামেচি সত্ত্বেও এসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তাঁরা। ঘুমের ঘোরে দু'জনেই স্পষ্ট অনুভব করলেন একটা কুকুর কোলের কাছে শুয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কুকুরের লেজ নাকে ঢুকে যাবার ফলে হাঁচতে হাঁচতে দু'জনেই ঘুম ভেঙ্গে জেগে রজালেন কিন্তু হাত বাড়িয়ে কোনও লোমওয়ালার জীবের নাগাল পেলেন না তাঁরা। ভোর রাতে বিবরণফির তেষ্টা পেতে উঠে পড়লেন দু'জনেই, অমনই চোখে পড়ল.খাটের পাশে টেবলের বললেনজোড়া ছোট থাবা। হাত বাড়িয়ে ধরতে যেতেই সেই থাবা উধাও হল।
সঙ্গে তাঁর বেলার দিকে ব্রেকফাস্ট টেবলে মহিলা দু'জন তাঁদের নৈশ অভিজ্ঞতা শোনালেন। চাবকে আরনরই পরনের পশমি গাউনে লেগে থাকা অসংখ্য কুকুরের লোম চোখে পড়তে

অন্যান্য সদস্যরা বুঝলেন আর যাই হোক তাঁরা বানিয়ে গল্প বলছেন না। শুধু কুকুর নয়, বালেচিন হাইস-এ মানুষ-ভূতেরও আনোগোনা ছিল তা সদস্যদের দু'একজনের বক্তব্যে প্রমাণিত হল। তাঁরা বললেন গভীর রাতে এক সুন্দরী যুবতী সন্নাসিনীকে তাঁরা কাঁদতে কাঁদতে গোটা বাড়ি ঘুরে বেড়াতে দেখেছেন। পড়ে খোঁজখবর নিয়ে তাঁরা জেনেছিলেন মেজর স্টুয়ার্ট বেঁচে থাকতে তাঁর এক বোনের প্রেমিক অকালে মারা যায়। প্রেমিকের অকাল মৃত্যুতে জীবনের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে মেজরের বোন সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করেন, দূরের এক কনভেন্টে নান হয়ে বাকি জীবন কাটিয়েছেন। কিন্তু সন্ন্যাসিনী হলেও পার্থিব আকর্ষণ থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেন নি বোঝাই যায়, আর তাই তাঁর অতৃপ্ত আত্মা তারপর দেখা দিত, অল্প বয়সে প্রেমিককে হারাবার মনোকষ্টে কাঁদতে কাঁদতে গোটা বাড়ি ঘুরে বেড়াত।

বলোতন হাউস

ভূতের বজ্জাতি

পোল্টারজিস্ট (জার্মান বোদ্ধা কিছু বাঙালি হালে পোল্টার গাইস্ট বলছেন ও লিখছেন লক্ষ করেছি) জার্মান শব্দ, এককথায় এর মানে হল বজ্জাতভূত। আবার ইংল্যাণ্ডের ল্যাংকাশায়ার অঞ্চলের লোককথায় এদেরই 'বগার্ট' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। বজ্জাত বগার্টরা কতদূর গেছো হারামি হতে পারে তার কিছু উদাহরণ এখানে তুলে ধরলাম।

ম্যাঞ্চেস্টার ও মিডলটনের মাঝামাঝি এক ছোট সবুজ উপত্যকায় ছিল জর্জ চিথাম নামে এক সম্পন্ন চাষীর ছবির মত সুন্দর খামার বাড়ি। কে জানে কবে কোন কুক্ষণে কোন জাহান্নম থেকে হোল ক্লুফ্ নামে এক বজ্জাত ভূত এসে মাথা গুঁজেছিল সেই খামার বাড়িতে।

হোল ক্লুফ্ যে সে ভূত নয়, সে ছিল রীতিমত বজ্জাত, পাজির পাঝাড়া, এক নম্বরের গাছ হারামি। যে যে বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবার ফলে হোল ক্লুফ্ ভূতসমাজে বজ্জাত শ্রেণীভুক্ত হতে পেরেছিল সেগুলো উদাহরণ সহযোগে একে একে তুলে ধরলাম।

দিনের বেলায় গাছের উঁচু ডাল নয়ত খামার বাড়ির ছাদের আলসের একধারে ঠ্যাঙ্গ ঝুলিয়ে বসে সারদিনের নষ্টামির ফন্দি আঁটতে হোল ; থাকতে থাকতে হয়ত চোখে পড়ল ভাল জামাকাপড় পরে কেউ নিচ দিয়ে যাচ্ছে। ব্যাস আর কথা নয়, সঙ্গে সঙ্গে তার গায়ে মাথায় দু'টি প্রাকৃতিক অপকর্মের একটি সম্পাদন করত সে। পাশাপাশি এলাকার ছোট ছেলেমেয়েদের পেছনে লাগা। সে ত তার নিত্যকর্ম। তাদের হাত থেকে খাবার কেড়ে নেয়া, তারপর তাদেরই দেখিয়ে দেখিয়ে যেসব নিজের পেটে চালান করা। বাইরে এসব বজ্জাতি একঘেয়ে ঠেকলে হোল হতচ্ছাড়া সুড়ুত করে সেঁধিয়ে যেত খামারবাড়ির ভেতরে। বাড়ির কর্তা জর্জ চিথাম হয়ত সেই সময় তার গিন্নি আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে ব্রেকফাস্ট খেতে বসেছে, হোল চুপিচুপি এসে দাঁড়াল পরিবেশনকারীর পেছনে। তারপর আচমকা দমকা হাওয়ার এক ধাক্কায় পরিবেশনকারীর হাতের গরম দুধের বাটি উল্টে দিল বাড়ির কর্তার টাক মাথায়। শুরু হয়ে গেল মহা ধুন্ধুমার. সে পাট চুকলে বাড়ির গিন্নি হয়ত বাটিতে চামচ ডুবিয়ে পরিজ খাচ্ছেন এমন সময় দেখলেন কুচো ভাজা জ্যান্ত হয়ে প্লেট থেকে লাফিয়ে একে একে উধাও হচ্ছে। এ কাজ বাড়ির পোষা ভূত হতচ্ছাড়া হোল্-এর টের পেয়ে গিন্নি হাউমাউ করে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করলেন। ব্রেকফাস্টের বারোটা বাজিয়ে হোল বেরিয়ে এল বাইরে। হয়ত সেসময় কোনও বুড়ো মানুষ লাঠি ঠুকতে ঠুকতে হাঁটছে দেখেই হোলের বজ্জাতি সুড়সুড় করে উঠল, আশাপাশের মানুষ দেখল আচমকা লাঠিটা বুড়োর হাত ফসকে স্যাৎ করে উঠে গেল অনেক ওপরে প্রায় মগডালের চূড়োয় তারপর নেমে এসে ধাঁই ধপা ধপ পেটাতে লাগল তার মালিককেই। এত গেল দিনের বেলার ফিরিস্তি, রাতেও রেহাই নেই, জর্জ চিথামের খামার বাড়িতে আবার একফাঁকে এসে ঢুকে পড়ল হোল্। সোজা শোবার ঘরে ঢুকে খাটের মশারি তুলে দেখল কোন কোন বাচ্চা জেগে আছে। যারা তখনও চোখ মেলে আছে তাদের দিকে তাকিয়ে মুখ ভেংচে এমন হাসল যে তাদের রাতের ঘুমের দফারফা। বাচ্চাদের ভয় দেখানো একঘেয়ে ঠেকলে আবার হয়ত এসে ঢুকল রান্নাঘরে, সেখানকার যত খাবারদাবার, আনাজপাতি,

মশলা সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে একসা করল, আছড়ে ভাঙ্গল, হাঁড়িভর্তি দুধভর্তি হাঁড়িতে প্রস্রাব করল, উনুন থেকে মুঠো মুঠো ছাই তুলে ঠেলে দিল খাবার জলের জালায়। এরপর রান্না ঘরে বসেই বাড়ির সবার ছোট বাচ্চার গলা নকল করে কিছুক্ষণ কাঁদল আপনমনে, তাও একঘেয়ে ঠেকলে আবার এসে ঢুকল শোবার ঘরে, মশারি তুলে কর্তা নয়ত গিন্নির বুকের ওপর সাতমণ পাথরের বোঝা হয়ে চেপে বসে রইল। হোল্-এর এমন ধারা উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে খামার বাড়ির মালিক জর্জ চিথাম একেকবার বৌ-বাচ্চাদের নিয়ে অন্য জায়গায় গিযে ঘর বাঁধবে বলে ঠিক করেছে কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাতেও বাগড়া দিয়েছে ঐ ব্যাটা হতচ্ছাড়া বজ্জাত ভূত হোল্— যতবার চিথাম তার মালপত্র বাঁধাছাঁদা করে চলে যাবার জন্য তৈরি হয়ছে ততবার ঘরের কোণ থেকে হোল্ বলে উঠেছে "তোমরা চলে যাচ্ছ বুঝি? আমার ওপর এত রাগ? না বাপু, তোমরা যেমন ছিলে থাকো, আমিই বরং চলে যাই।" বলে সত্যিই চলে গেল হোল্। হাড় জুড়োল ভেবে জর্জ আর তার গিন্নি স্বস্তিব নিঃশ্বাস ফেলে দুটো দিন শান্তিতে কাটিয়েছে? তিন দিনের মাথায় হোল্ আবার এসে হাজির। কিছু একটা নষ্টামি করেই ব্যাখ্যা করে হাসতে হাসতে বলে উঠল, ভেবে দেখলুম তোমরা আপনজন তোমাদের মায়া কাটিয়ে যাবই বা কোন চুলোয়। তাই ফিরে এলুম, থাকতে হলে তোমাদের মধ্যেই থাকব। একটু মানিয়ে নিও বাছারা। আমরা ত আর মানুষ নই ভূত। বাঁদরের মত আমবাও চুপ করে থাকতে পারি না। কিছু নষ্টামি আমাদের করতে হয় নয়ত মান ইজ্জত নিয়ে টানাটানি হয়, আমাদের ও ত সমাজ আছে বাপু!

উপকারী 'কেজো' ভূত

এত গেল বদমাশ ভূত, এদের পাশাপাশি ভাল, সৎ প্রকৃতির ভূত সম্প্রদায়ও আছে বহাল তবিয়তে। মানুষের মধ্যে যেমন পাজির পা-ঝাড়া ধাড়ি বজ্জাত নচ্ছার শয়তানের পাশাপাশি সচ্চরিত্র, উপকারী প্রচুর আছে, ভূত সমাজেও তেমনই তাদের কমতি নেই। গল্পগাথায় সাধারণত এই সব ভাল ভুতেদের দারুণ পরোপকারী ও পরিশ্রমী হতে দেখা যায় ; রাতের বেলা গেরস্থ ঘুমিয়ে পড়লে তারা এসে হেঁশেলে ঢোকে, কুয়ো থেকে জল তুলে এঁটো বাসন সাফ করে, ঘরদোর মোছে। দই মেড়ে মাখন তোলে, পরদিনের রান্নার জন্য মশলা বাটে, খড় কেটে গোয়ালে গরুর খাবার বালতিতে রেখে আসে ; রান্নার কাঠ কেটে ফালি করে উনুনে গুঁজে ভোরের আলো ফোটার আগেই চলে যায়। গল্পে দেখা যায় কাজের তারিফ করলে উপকারের বিনিময়ে উপহার জাতীয় কিছু দিলে এইসব 'কেজো' ভূতের আত্মসম্মানে ঘা লাগে ভীষণ চটে গিয়ে তারা তখন বরাবরের মত চলে যায়।

সাণ্ডার ল্যাণ্ডের হিল্টন প্রাসাদে (ভেঙ্গে পড়া পেল্লায় ফটক ছাড়া যে প্রাসাদের আর-কিছুই এখন অবশিষ্ট নেই) অতীতে ছিল এইরকম এক উপকারী ভূত যার নাম ছিল কণ্ড্ল্যাড় অফ হিল্টন। প্রচলিত লোককথায় উল্লেখ করা হয়েছে হিল্টন প্রাসাদের আস্তাবলে রজার স্কেলটন নামে এক কমবয়সী এক ছোকরা কাজ করত। হিল্টন প্রাসাদের অধিপতি রবার্ট হিল্টন ছিলেন বদরাগি লোক, কাজের লোকেদের ভুলচুক বা কর্তব্য পালনে সামান্য গাফিলতি চোখে পড়লে তিনি চাবকে তাদের পিঠের ছাল তুলে দিতেন। একবার কাজে গাফিলতির জন্য আস্তাবলের

ছোকরা রজার স্কলটনকে রবার্ট এমন বেধড়ক মার মারলেন যে বেচারা সেই যে বেহুঁশ হয়ে চোখ বুঁজল অর্থাৎ সে আর চোখ মেলল না। রজার মরে গেছে বুঝে রবার্ট হিল্টন তার ক্ষতবিক্ষত লাশটা পুঁতে ফেললেন। ঘটনা চাপা রইল না। এমন সময় সেপাইরা এসে জমিদার হিল্টনকে গ্রেপ্তার করে কোমরে দড়ি বেঁধে রাজ দরবারে নিয়ে হাজির করল। রবার্ট হিল্টন খুনের দায়ে অভিযুক্ত হলেন, এবং নিজের ভুলে খুনের অপরাধ স্বীকারও করলেন। তবু মহানুভব রাজা সব দিক বিচার করে তাঁকে ছেড়ে দিলেন। ছেড়ে দেবার পেছনে যুক্তি একটাই—রবার্ট তাঁর কাজের লোককে মারতে মারতে মেরে ফেলেছেন। কেন মেরেছেন? যেহেতু তার কাজে গাফিলতি হয়েছিল। বিচারকের ভূমিকায় এবার রাজার যুক্তি—রবার্ট তাঁর চাকরকে গাফিলতির জন্য মেরেছেন বেশ করেছেন, সে ব্যাটাই বা মনিবের মার খেয়ে মরতে গেল কোন দুঃখে, কে তাকে মরতে বলেছিল? হবুচন্দ্র রাজারা যে ইংল্যাণ্ডেও একসময় দাপটে রাজত্ব করেছেন এই দিনটি নিঃসন্দেহে তার বড় উদাহরণ।

বেকসুর খালাস পেয়ে জমিদার রবার্ট হিল্টন ফিরে এলেন প্রাসাদে। তাঁর হাতে বেধড়ক মার খেয়ে যে ছোকড়া মারা গেল সেই রজার স্কলটনের ভূত বেঁচে থাকতে তার কাজে যে গাফিলতি হয়েছিল তার প্রায়শ্চিত্ত করতে এবার উঠে পড়ে লাগল। রোজরাতে প্রাসাদের সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সে এসে ঢুকত রান্নাঘরে। শুধু রান্নার কাজটুকু ছাড়া অন্যান্য দরকারি সব কাজই অদ্ভুত দক্ষতায় সে সেরে ফেলত অল্প সময়ের মধ্যে। প্রাসাদের কাজের লোকেরা গোড়ায় এই ভোজবাজিতে অবাক হল, তারপর স্বাভাবিক কৌতুহলের বশে আড়াল থেকে নজর রেখে, দেখে ফেলল রজার স্কলটনের ভূত রোজ এসে তাদের সব কাজ করে দিয়ে যাচ্ছে। বেঁচে থাকতে রজার ছিল প্রসাদের কাজের লোক, মরে গিয়ে হয়েছে কাজের ভূত। উপকারী ভূতটি তাদের চেনা এবং বেঁচে থাকতে সহযোগী ছিল দেখে বদবুদ্ধি জাগল প্রাসাদের কাজের লোকদের মাথায়। একদিন বজারের ভূত আসার আগেই তারা তার সব কাজ নিজেরা হাত লাগিয়ে সেরে ফেলল তারপর খেয়েদেয়ে কি হয় দেখার জন্য অপেক্ষা করে রইল। রজারের ভূত রোজের মত সেদিনও এল ঠিক সময়ে। কিন্তু এসে করার মত কোনও কাজ খুঁজে পেল না। সব কাজ আগেভাগে করা হয়েছে দেখে তার মেজাজ গেল বিগড়ে, হাতের কাছে বাসনপত্র যা ছিল সব টেনে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল সে। বাসনপত্র ভেঙ্গেচুড়ে একাকার। এরপর নুন আর গোলমরিচের গুঁড়ো এক সঙ্গে মেশাল রজারের ভূত। দুধের পাত্র দিল ফেলে। ছাইভর্তি বালতি করে আড়ালে এনে কাজের লোকেদের থালায় দিল ঢেলে। রান্নাঘরের জিনিসপত্তর ছড়িয়ে ছিটিয়ে তছনছ করে রাতদুপুর প্রাসাদে মহা ধুন্ধুমার বাধাল। বাসনপত্র ভাঙ্গার ঝনঝন ঠনঠন আর কাজের লোকেদের চ্যাঁচামেচি কানে যেতে জমিদার রবার্ট হিল্টনের কাঁচা ঘুম গেল ভেঙ্গে। ব্যাপার কি জানতে তিনি নিজে ছুটে এলেন রান্নাঘরে। তাঁকে ফেলেই রজারের ভূত রান্নাঘরের ঘুলঘুলি দিয়ে পালিয়ে গেল। কাজের লোকেদের মুখ থেকে ঘটনার বিবরণ শুনে জমিদারের দু'চোখ ছানাবড়া। অনেকক্ষণ বাদে রাগে গরগর করতে করতে বললেন, হারামজদা মরেও রেহাই দেবে না। আবার এসেছে আমায় জ্বালাতে এটুকু বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খেয়াল হল রজার মানুষ নয় সে এখন পুরোদস্তুর ভূত তাই ইচ্ছে হলেও তিনি চাবকে আর তার চাল ছাড়িয়ে নিতে পারবেন না। কিন্তু রজারের ভূতকে যে ভাবেই হোক

তাড়ানোর সংকল্প নিলেন জমিদার, তাঁর হাতে খুন হয়েছে সে, উপকার করার ছলে ব্যাটা যে একদিন তাঁকেও ভূত বানিয়ে নিজের দলে ভেড়াবে না সেই নিশ্চয়তা কোথায়? রজারের ভূতকে বিদেয় করতে গাঁয়ের গির্জার পাদ্রিকে ডাকিয়ে আনলেন জমিদার রবার্ট হিল্টন। পাত্রি শুনে বললেন, এ অতি সাধারণ কাজ, ভূত তাড়ানো তাঁর কাছে জলভাত। রজারের ভূতকে তিনি ঠিকই তাড়িয়ে ছাড়বেন, তবে গির্জার তহবিলে জমিদার মশাই এরপরে কিপটেমি ছেড়ে দরাজ হাতে অর্থ সাহায্য করবেন এটুকু আশা যদি তিনি করেন তবে তা অন্যায় হবে না। জমিদার জানালেন সবই নির্ভর করছে ভূত তাড়ানোর ওপর। পরদিন রজারের ভূত আসার আগেই গাঁয়ের গির্জার পাদ্রি এসে রান্নাঘরে ঢুকে বাইবেল পড়তে শুরু করলেন। যথাসময় রজারের ভূত ভেতরে ঢুকল, ঘুলঘুলির ফোকর দিয়ে পাদ্রিকে বাইবেল পড়তে দেখেই তার মেজাজ গেল বিগড়ে। পর মুহূর্তে পাশে দাঁড় করানো মুড়ো ঝাঁটা উড়ে এসে পেটাতে শুরু করল পাদ্রিকে। বুড়ো পাদ্রি তাকে তাড়াতে পারলেন না। উল্টে রান্নাঘরের মুড়ো ঝাঁটাই বাইবেল সমেত পাদ্রিকে প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে ছাড়ল। পাদ্রিকে বিদায় করে রজারের ভূত ঝাঁপিয়ে পড়ল তার রোজের কর্মযজ্ঞে, আর তখনই আড়ালে দাঁড়ানো প্রাসাদের কাজের লোকেদের চোখে পড়ল তার উদোম গায়ে জামা দূরে থাক একটু সুতো বা নেংটি কিছুই নেই। বজার কাজ সেরে খুশি মনে চলে যাবার পরে জমিদারকে কথাটা জানাল তারা। জমিদারের সেদিন অন্য মেজাজ--রজারের ভূত পাদ্রিকে ঝেঁটিয়েছে শুনে তিনি খুব মজা পেলেন, বেচারা খালি গায়ে রান্নাঘরের সব কাজ করেছে শুনে তাঁর মনে দয়া হল। কাজের লোকেদের ডেকে তখনই রজারের ভূতের পরার মত পোষাকের ব্যবস্থা করায় হুকুম দিয়ে শুতে গেলেন তিনি।

পরদিন রাতে রজারের ভূত এল যথাসময়। কাজকর্ম মেটানোর পরে তার নজরে পড়ল উনুনের ধারে সবুজ রেশমি একখানা আলখাল্লা আর টুপি রাখা। ওগুলো যে তারই জন্য রাখা আছে তার বুঝতে বাকি রইল না। আলখাল্লা গায়ে চাপিয়ে মাথায় টুপি পড়ল রজারের ভূত, তারপর মনের আনন্দে ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে গান জুড়ল ঃ

'বাহারি আলখাল্লা গায়ে
মাথায় টুপি এঁটে
কল্ড্ ছোঁড়া যাচ্ছি চলে
আসব না আর মোটে।

কণ্ডল্যাণ্ড বা কল্ড্ ছোঁড়া, রজার স্কলটনের ভূত নতুন পোষাক পেয়ে সেই যে বিদেয় হল জমিদার রবার্ট হিল্টন যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন যে আর ওমুখো হয়নি। সাণ্ডারল্যাণ্ডের আঞ্চলিক লোককথা যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মতে জমিদার মারা যাবার পরে তাঁর ছেলের জমানায় কল্ড্ ছোঁড়া আরও একবার এসে হাজির হয়েছিল তার পোষাক ফেঁসে গেছে নতুন পোষাক চাই এই আবদার নিয়ে। নতুন জমানার জমিদার বাপের আমলের পরোপকারী ভদ্র ভূতের আবদার রক্ষা করেছিলেন কিনা তা কিন্তু জানা যায় নি। উপকারি কাজের ভূত রজার স্কলটনের প্রসঙ্গে বহুদিন আগে ছোটবেলায় পড়া গ্রিম ভাইদের লেখা বিদেশী রূপকথার একটি গল্প চোখের সামনে ভেসে উঠল—এক গরীব মুচি রোজ রাতে শুতে যাবার আগে জুতোর মাপে চামড়া কেটে রাখত আর রাখত আঠা, সুঁচ, সুতো, এসব। পরদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে

উঠে দেখত সুন্দর জুতো কে যেন তৈরি করে রেখে গেছে। পরপব ক'দিন একই ঘটনা ঘটার পর মুচি আর তার বৌ একরাতে না ঘুমিয়ে নজর রাখল। তারা দেখল একজোড়া বাচ্চাভূত এসে তাদের জন্য জুতো বানিয়ে দেয় কিন্তু বেচারাদের নিজেদেরই পায়ে জুতো নেই। দয়া পরবশ হয়ে মুচি পরদিন তাদের জন্য দু'জোড়া ছোট জুতো তৈরি করে সাজিয়ে রাখল। বাচ্চা ভূত দু'জন সেদিনও যথারীতি এল। জুতো সেলাই করে চলে যাবে এমন সময় নতুন জুতো তাদের চোখে পড়ল। নতুন জুতো পায়ে গলিয়ে খুব খুশি হল তারা। জুতো পরে বাচ্চা ভূত দু'জন খুব নাচল। তাবপর সেই যে তারা উধাও হল। আর এল না। এই গল্পের উপাদান গ্রিম ভাইযেরা যদি হিল্টন প্রাসাদের কল্ড ছোঁড়ার কাহিনী থেকে পেয়ে থাকেন তবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

টেডওয়ার্থের ঢাকীভূত

সল্সবেরি সমতলের টেডওয়ার্থে থাকতেন ছোট আদালতের বিচারক মিঃ মম্পেসন। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের এক সকালে স্থানীয় ফাঁড়ির সেপাইরা ভবঘুরে চেহারার একটি লোককে বেঁধে এনে তুলল আদালতে আসামির কাঠগড়ায়। মিঃ মম্পেসন লক্ষ্য করলেন লোকটার কাঁধে ঝুলছে মাঝারি গোছের একখানা ঢাক। লোকটির বিরুদ্ধে অভিযোগ। সে ভবঘুরে, পায়ে হেঁটে যখন যে এলাকায় যায় ঢাক বাজিয়ে সেখানকার মানুষের কান ঝালাপালা করে, তার ঢাকের বিটকেল আওয়াজে দিনে রাতে কেউ শান্তিতে দু'চোখের পাতা এক করতে পারে না। যাদের চোখে ঘুম আসি আসি করছে ঢাকের আওয়াজ কানে যাওয়ামাত্র ঘুম সেই যে পালায় ক'দিনের মধ্যে অনেক সাধ্যসাধনা করেও আর তাকে ফেরানো যায় না।

"হুঁম, অভিযোগ গুরুতর সন্দেহ নেই," বলে বিচারক মিঃ মম্পেসন আসামির কাঠগড়ার দাঁড়ানো লোকটিকে প্রশ্ন করলেন 'কি হে, তুমি ঢাক বাজাও?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।'

"তা ঢাক বাজানোর যখন এতই সাধ নিজের ঘরে বসে বাজালেই ত পারো বাপু, তা না করে ঘুরে ঘুরে বাজানোর দরকারটা কি?"

"আজ্ঞে আমার নিজের ঘরদোর ত নেই হুজুর" আসামি তক্ষুণি জবাব দিল, "তাই পথে পথে ঘুড়ে ঢাকের বাদ্যি শোনাই।"

"নিজের ঘর নেই বলে মনে দুঃখ?" বিচারক বললেন, "কিন্তু আমাদের রাজার অনেক ঘর খালি পরে আছে, আমি তোমাকে তেমনই একটা ঘরে থাকার ব্যবস্থা করছি।" বলেই বিচারক দশ পাতার রায় লিখে সেই ভবঘুরে ঢাকিকে শান্তি ভঙ্গের অপরাধের দু'বছরের মেয়াদে পাঠিয়ে দিলেন গ্লস্টার জেলে। গ্লস্টার জেলে আসামিকে ঢোকানোর সময় বাধল আরেক ফ্যাসাদ। জেল কর্তৃপক্ষ ঢাকসমেত আসামিকে জেলের ভেতরে ঢুকতে দেবেন না। আবার সে খালাস না পাওয়া পর্যন্ত ঢাক নিজের হেপাজতে রাখতেও তাঁর আপত্তি। কোনও উপায় না পেয়ে তিনি শেষকালে ঢাকখানা পাঠিয়ে দিলেন বিচারক মিঃ মম্পেসনের বাড়িতে। মিঃ মম্পেসনের সেই ঢাক রেখে দিলেন রান্নাঘরের পাশে ভাঁড়ার ঘরে।

দিনের শেষে আদালত ছুটি হলে মিঃ মম্পেসন বাড়ি এলেন। গিন্নির মুখে শুনলেন গ্লুস্টার জেলের সেপাই ওপরওয়ালার হুকুমে একখানা ঢাক তাঁর বাড়িতে দিয়ে গেছে। এ-ঢাক কার বুঝতে তাঁর বাকি রইল না তা বলাবাহুল্য। রাতেরবেলা খাওয়া দাওয়া সেরে মিঃ মম্পেসন গিন্নি আর ছেলেমেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লেন। চোখের পাতায় সবে ঘুম নেমেছে এমন সময় ভাড়ার ঘরে বেজে উঠল ঢাকের বাদ্যি—'ধুম্‌ধাম! দ্রাম! দ্রাম! ধুপ্‌ধাপ্‌। গদাম্‌ গদাম্‌! ধুমধাম!' বাজনার যে কি আওয়াজ! ঢাকের চামড়ার একেকবার আওয়াজ ওঠে। আর সে আওয়াজের তালে তালে পিলে চমকে চমকে ওঠে।

"নিশ্চয়ই বাড়িতে চোর ঢুকেছে" বিচারক মিঃ মম্পেসন গিন্নির দিকে চোখ অর্দ্ধেক খুলে তাকালেন।

"জজিয়াতি করে দিন দিন বুদ্ধির ঢেঁকি হচ্ছ" গিন্নি শাসনের সুরে জবাব দিলেন, "চোর ঢুকলে এমনই আওয়াজ করতে যাবে কোন দুঃখে বাড়ির লোকেদের ডেকে তুলবে। বলবে 'আয়রে সবাই দেখে যা কেমন করে চুরি করি তোদের নামের ডগায়?' ঘুষের টাকা অনেক জমিয়েছো। এবার চাকরির পাটই চুকিয়ে হাটে গিয়ে সবজির দোকান দাও ফেলবে বুদ্ধির জট খুলবে।"

"এক কাজ করো না দোহাই" জজসাহেব মিনতি করলেন, "একবার গিয়ে দেখে এসো না আওয়াজটা আসছে কোথা থেকে।"

"কথাটা বলতে লজ্জা হল না? একটু বিবেকে বাঁধল না?" জজগিন্নি ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, "সেই কোন সকাল থেকে সংসারের বৈঠা ঠেলছি। এখন আমার শরীর আর বইছে না। সাফ বলে দিচ্ছি আমি যেতে পারব না। তুমি যেচে ঝামেলা বাঁধিয়েছো, দেখতে হলে তুমি একাই যাও।"

"আমি আবার কি ঝামেলা বাঁধালাম?" গিন্নির কথা বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকালেন জজ মিঃ মম্পেসন।

"কিঃ ভাবো আমায়", আবার তেড়ে উঠলেন জজ গিন্নি, "মেয়ে মানুষ, বুদ্ধিশুদ্ধি নেই, কোনও কম্মের নই, এইত? জেলের যে সেপাই ঢাক পৌঁছে দিয়ে গেছে তার মুখ থেকে শুনেছি সব। বলি সাতবার ফাঁসিতে ঝোলালেও যাদের উচিত সাজা হয় না এমন যত চোর জোচ্চোর, খুনে ডাকাত হাড়ে হারামজাদাকে ত ঘুষ খেয়ে রোজ বেকসুর খালাস করে দিচ্ছ; আর এক বেচারা ভবঘুরে দিনরাত মনের সুখে ঢাক বাজিয়ে ঘুরে বেড়ায় বলে তাকে দু'বছরের মেয়াদে জেলে পাঠালে? এর নাম বিচার? শান্তি ভঙ্গ হচ্ছে বলে যারা পুলিশের কাছে নালিশ করেছে তাদের কানে তুলো আঁটার কথা তোমার মাথায় এল না কেন বলতে পারো? আধা ভবঘুরে বেচারার নিশ্চয়ই এই ঢাকটা ছাড়া ওর আর কেউ নেই। আমার মন বলছে নির্ঘাত ঐ ঢাকে কোনও তুক আছে তাই মালিক ছাড়া আপনিই বেজে বেজে উঠছে।" গিন্নীর দাঁত খিঁচুনি শুনে জজসাহেব কি করবেন ভেবে পেলেন না। তাঁকে আর না ঘাঁটিয়ে সাহসে ভর করে নিজেই খাট থেকে নেমে বাইরে এলেন, সিঁড়ি বেয়ে একতলায় নেমে রান্নাঘরের লাগোয়া ভাঁড়ারের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। ভাঁড়ারে তখন ঢাকে বোল বাজছে, "দ্রাম। দ্রাম। ধ্রাম। ধ্রাম। ডিস। ছেড়ে। ছেড়ে। ধাঁই। ধপ্‌। ধপ্‌সা।'

বাইরে থেকে ঠেলে মিঃ মম্পেসন দরজা খুলতে পারলেন না, বুঝলেন গিন্নি দরজার পাল্লায় তালা এঁটে দিয়ে গেছেন। হাতের ল্যাম্প তুলে চাবির ফুটোয় চোখ রাখলেন তিনি কিন্তু ভেতরে কাউকে দেখতে পেলেন না। আর ঠিক তখনই একটা নিদারুণ সন্দেহ উঁকি দিল তাঁর মনে—ভাঁড়ার ঘরের ভেতরে কেউ নেই তবু ঢাকটা আপনিই বেজে উঠছে, বাইরে দরজাতেও তালা আঁটা। তাহলে কি ভৌতিক...?

ছোট আদালতের জজ হলে কি হবে, মিঃ মম্পেসনের ভারি ভূতের ভয়। সন্দেহটা অমূলক হতেই তিনি দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে এসে গিন্নির পাশটিতে শুয়ে পড়লেন। জজসাহেব দেখলেন তাঁর গিন্নি মাথায় রমাল বেঁধে তাই দিয়ে দু'কান ঢেকে দিব্যি ঘুমোচ্ছেন, ছেলেমেয়েরা জেগে ঠায় বসে আছে। ঢাকের আওয়াজ কখনও জোরে কখনও ঢিমে তালে হচ্ছে। খানিক বাদে ঢাকের আওয়াজ পৌঁছে গেল ছাদের ওপর আর দেয়ালের চারপাশে, মনে হল গোটা বাড়িটাই যেন ঢুকে পড়েছে আওয়াজের চৌখপি ঘেরাটোপে দেখতে দেখতে সেই আওয়াজ এমন বেড়ে গেল যা মিঃ সম্পেসনের গিন্নির ঘুম গেল ভেঙ্গে। চমকে উঠে দু'হাতে স্বামী আর সন্তানদের আঁকড়ে ধরলেন তিনি। বিদঘুটে ঐ আওয়াজের ঠ্যালায় গোটা বাড়িটা না হুড়মুড়িয়ে ভেঙ্গে পড়ে এই ভয় দেখা দিল তাঁদের মনে। বাড়ি ভেঙ্গে না পড়লেও বাকি রাতটুকু কর্তাগিন্নি আর ছেলেমেয়েরা ঠায় জেগে একভাবে বিছানায় বসেই কাটালেন। ভোরবেলা আকাশে আলো ফুটতে সব আওয়াজও নেমে গেল এক নিমেষে। এখন সবাই হাঁফ ছেড়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

দিনের বেলাটা পরদিন ভালয় ভালয় কাটল। কিন্তু রাতে খেয়ে দেয়ে সবাই শুতে যাবার পরে শুরু হল ভৌতিক অত্যাচারের দ্বিতীয় পর্ব। আজকের অত্যাচারের আগের দিনের চেয়ে অভিনব—ঢাকের বাজনার আওয়াজ শুনে গৃহস্বামী মিঃ মম্পেসনের মনে হল যেন কোনও ওস্তাদ বাজিয়ের হাতে সেই ঢাক পড়েছে, ঢিমে তালে ঢিব্ ঢিব্ থেকে বাড়তে বাড়তে তা আচমকা এমন মাত্রায় চড়ে গেল যা কল্পনা করা কষ্টকর ; সেই আওয়াজের ধাক্কায় তাঁদের বিশাল খাটের মশারি আর পর্দা খাটানো সবকটা ছত্রি গেল খুলে। পর মুহূর্তে ছত্রিগুলোতে যেন প্রাণসঞ্চার হল। খাটের একধারে ভয়ে জড়োসড় হয়ে শুয়েছিল তাঁদের কচি ছেলেমেয়েরা। কোনও অদৃশ্য শক্তির নির্দেশে ছত্রিগুলো এবার ধাঁই ধাঁই করে তাদের পেটাতে লাগল। বাচ্চারা ব্যথায় কঁকিয়ে কাঁদতে লাগল। তাদের কান্নার সঙ্গে তাল রেখে এবার শোনা গেল অট্টহাসি যেন তাদের দুর্দশা জেনে কেউ দারুণ সাজা পাচ্ছে। হাততালির আওয়াজও হল। আওয়াজগুলো ঘরের ভেতরে হলেও ঠিক কোন দিক থেকে আসছে তা তাঁরা স্বামী-স্ত্রী বুঝে উঠতে পারলেন না। ছেলেমেয়েদের বাঁচাতে দু'জনে তাদের জড়িয়ে ধরতে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘটল বিপত্তি—ছত্রিগুলো এবার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁদের গায়ের ওপর বারবার আছড়ে পড়তে লাগল।

ভৌতিক এই অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে যেতে তাঁদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। রাতটা কোন মতে কাটিয়ে পরদিন দিনের আলো ফুটতে মিঃ সিম্পসন তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এলেন গির্জায় তাঁর কাছে সব বলে প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলেন। পাদ্রি সব শুনে আশ্বাস দিয়ে বললেন তিনি রাতে তাঁদের শোবার ঘরে বাইবেল পাঠ করবেন। তাহলেই সব ভৌতিক কাণ্ড কারখানা বন্ধ হবে। তখনকার মত আশ্বস্ত হয়ে মিঃ মম্পেসন তাঁর গিন্নিকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। রাতে ঘুমোতে পারেন নি বলে অনেক বেলা পর্যন্ত পরে ঘুমোলেন মিঃ মম্পেসন।

সন্ধ্যের পরে গির্জার পাদ্রি তাঁর কথা মতন এসে হাজির হলেন মিঃ মম্পেসনের বাড়িতে, কর্তা গিন্নির সঙ্গে একসঙ্গে ডিনার খেলেন তিনি, তারপর ছেলেমেয়েরা শুতে যাবার পর শোবার ঘরের ভেতরে আর বাইরে গির্জা থেকে নিয়ে আসা জর্ডন নদীর পবিত্র জল ছেটালেন, তারপর ধূপকাটি জ্বেলে গলা চড়িয়ে বাইবেল থেকে কয়েকটি বিশেষ অংশ পড়তে লাগলেন। ব্যস, আর যায় কোথায়। সন্ধ্যের পর থেকে পরিবেশ যেটুকু শান্ত ছিল, তাও গেল নষ্ট হয়ে, পাঠ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমন্ত দানব জেগে উঠল। আজ আর ঢাকের আওয়াজ হল না বটে তবে দারুণ এক ঘূর্ণিঝড় উঠল শোবার ঘরের ভেতর, সেই ঝড়ের তাণ্ডবে শোবার ঘরের ভেতরে কাপড় চোপড় কাগজপত্র যা কিছু ছিল সব ছিঁড়ে খুঁড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে তালগোল পাকিয়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ল। অথচ বাইরে প্রকৃতি তখন শান্ত, ঝড় দূরে থাক, আকাশের বুকে একটুকরো মেঘ পর্যন্ত নেই। আগের দিনের মতন খাটের ছত্রিগুলোতে আজও প্রাণ সঞ্চার হল যেন অদৃশ্য কারও নির্দেশে, লাঠির মত তেড়ে এসে সেগুলো ধাঁই ধপাধপ পেটাতে লাগল পাদ্রিকে। এদের সঙ্গে যোগ দিল চটি জুতোরাও। খাটের ওঠার আগে সাজিয়ে রাখা জুতোগুলো লাফাতে লাফাতে পাদ্রির কোলে চেপে বসল, তারপর ভৌতিক থাপ্পড় হয়ে ঠাস ঠাস করে আছড়ে পড়তে লাগল তাঁর দু'গালে। খাটের ওপর ছেলেমেয়েদের নিয়ে বসে মিঃ সিম্পসন আর তাঁর স্ত্রী পাদ্রির দুর্দশা দেখছেন অথচ কিছু করতে পারছেন না। মিঃ সিম্পসন একবার খাট থেকে নামতে যেতেই খাটের একটা ছত্রি টের পেয়ে দু'টা কষাল তাঁর হাঁটুতে আর কোমরে। ব্যাথায় চেঁচাতে চেঁচাতে তিনি নামার আসা ছেড়ে বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। ঘরের ভেতর যে ক'টা তেলের ল্যাম্প জ্বলছিল ভৌতিক ঘূর্ণি ঝড়ের দাপটে খানিক বাদে সেগুলো একে একে নিভে গেল। সেই একঘর আঁধারের মধ্যে পাদ্রিমশাই আচমকা 'গেলুম! গেলুম!' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। মিঃ মম্পেসন এবার নাম ধরে তাঁর খাস আর্দালিক ডাকলেন। কিন্তু তার সাড়া পেলেন না। উপায় না পেয়ে তিনি নিজেই সাহসে ভর করে খাট থেকে নেমে দেশলাই জ্বেলে আলোগুলো একে একে জ্বালিয়ে দিলেন। আলো জ্বলে উঠতেই পাদ্রি হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, খানিক আগে আঁধারের মধ্যে কার দুটো হাত তাঁর মুখ চেপে ধরেছিল, আর সেই ফাঁকে কটা আঙ্গুল তাঁর নাকের ফুটোয় ঢুকে চিমটি কেটে লোমগুলো দলা করে ছিঁড়ছিল। তাঁর ঢের শিক্ষা হয়েছে, এই ভূতের সঙ্গে লড়াই করা যে তাঁর কম্মো নয় তা তিনি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। এইসব বলতে বলতে পাদ্রি তখনই সেই বাড়ি থেকে পালিয়ে বাঁচলেন। পাদ্রি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ভৌতিক উপদ্রব সে রাতের মত থেমে গেল। পালিয়ে যাবার পরে খাস আর্দালির নাম ধরে আবার ডাকলেন মিঃ মম্পেসন। এবার যে এসে হাজির হল মিঃ মম্পেসন দেখলেন ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে তাঁর খাস আর্দালি।

"তোমার আবার কি হল?" মিঃ মম্পেসন জানতে চাইলেন, "খানিক আগে যখন ডাকলাম শোননি?"

"আজ্ঞে শুনেছি হুজুর," আর্দালি কাঁপতে কাঁপতে বলল, "একটা দানো ভয় দেখাচ্ছিল বলে আসতে পারি নি।"

"দানো? কি দানো? কেমন দানো, কেমন দেখতে তাকে?"

"হুজুর" খাস আর্দালি বলল, "খেয়েদেয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল ছিল না। খানিক আগে আপনার ডাক শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলতে দেখি পায়ের কাছে কিম্ভূত চেহারার

একটা বেঁটে মোটা জীব দাঁড়িয়ে দু'চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে আছে আমার মুখের দিকে। আমি উঠতে যেতেই সেটা বেড়ালের গলায় 'ম্যাও' করে ডাক ছাড়ল, দেখি তার দু'চোখ দিয়ে আগুনের হল্‌কা বেরোচ্ছে। তাই দেখে আমার আর বিছানা ছেড়ে ওঠার সাহস হল না হুজুর, ভয়ে ভয়ে আবার চোখ বুঁজে ফেললাম। তারপর এই খানিক আগে আপনি আবার আমার নাম ধরে ডাকলেন। এবার চোখ মেলে আর সেই দানোকে দেখলাম না, তাই চলে এলাম। তবে হুজুর ব্যাটা যাবার আগে চোখের চাউনির হলকায় আমার কিছু টাকা নষ্ট করে দিয়ে গেছে। এগুলো হুজুর দয়া করে পাল্টে দেবার ব্যবস্থা করুন, তারপর ঐ দানো ব্যাটাকে কি করে তাড়াবেন তাই ভেবে বের করুন। রোজ রাতে এমনই অত্যাচার করলে আপনার এখানে কি করে থাকব আপনিই বলুন হুজুর।"

"তোমার পোড়া টাকাগুলো একবার দেখাও আমায়", মিঃ মম্পেসন বললেন। শুনে খাস আর্দালি পকেট থেকে কয়েকটা খুচরো নোট বের করল। মিঃ মম্পেসন দেখলেন সত্যিই আগুনের হল্‌কা লাগলে যেমন হয় তেমনই একটা পোড়া কালচে দাগ পড়েছে নোটগুলোতে একদিকে, কোণের খানিকটা পুড়ে কুঁকড়েও গেছে। দরকার হবে বলে দু'টো পোড়া নোট তিনি খাস আর্দালির কাছ থেকে চেয়ে নিলেন।

এরপরে এক টুকরো কাগজে মিঃ মম্পেসন লিখলেন যে শরীর খারাপ হওয়ায় আজ তিনি বাড়ি থেকে বেরোবেন না। খাস আর্দালিকে ডেকে ঐ চিঠি ছোট আদালতের পেশকারকে দেবার নির্দেশ দিলেন। খাস আর্দালি সেই চিঠি নিয়ে চলে যাবার পরে মিঃ মম্পেসন খাওয়া দাওয়া ছেড়ে ঘোড়ার গাড়ি চেপে এসে হাজির হলেন গ্লুস্টার জেলে। সঙ্গে দেখা করে জানতে চাইলেন ঢাক বাজিয়ে এলাকার লোকেদের শান্তিভঙ্গ করায় অভিযোগে ক'দিন আগে যে ভবঘুরে লোকটিকে জেলে পাঠিয়ে ছিলেন তার খবর কি, কেমন আছে সে?

জেলার জানালেন সেই কয়েদী আগের দিনই তাঁর কাছে এসেছিল, সে নিজে থেকে জানিয়েছে ঢাক ফেরতও না পাওয়া পর্যন্ত যে জজ তাকে জেলে পাঠিয়েছেন তাঁর জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে সে, নিজের পোষা ভূতদের এমনভাবে লেলিয়ে দেবে যাতে তাদের অত্যাচারে তাঁর বাড়ির লোক রাতের বেলা ঘুমোতে না পারে।

জেলারের জবাব শুনে জজ মিঃ মম্পেসন অবাক হলেন, তাঁর অনুরোধে জেলার সেই কয়েদীকে এনে হাজির করলেন। মিঃ মম্পেসন কোনও ভূমিকা না করে ক'দিনের ভৌতিক অত্যাচারের বিবরণ তাকে শোনালেন, তারপর বললেন, "শুনলাম তুমি তোমার পোষা ভূতের পাল লেলিয়ে দিয়েছো আমার পেছনে যাতে তাদের উৎপাতে আমি আর আমার বাড়ির লোকেরা ঘুমোতে না পারি। একথা সত্যিই?'

"একশোবার সত্যি, হুজুর," কয়েদী তাঁর দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত হাসি হাসল, "আমার ঢাক আমায় ফিরিয়ে দেবার হুকুম দিন, তাহলেই আমার ভূতেরা আপনাকে ছেড়ে দেবে তার আগে নয়।"

কয়েদীর সঙ্গে আর কথা না বলে মিঃ মম্পেসন জেলারের দিকে তাকিয়ে ইশারা করলেন, সেই ইশারার মানে বুঝে জেলার কয়েদীকে তার কামরায় পাঠিয়ে দিলেন। লোকটির ওপর দিনরাত নজর রাখার হুকুম দিয়ে মিঃ মম্পেসন বাড়ি ফিরে এলেন। রাজাকে একটা চিঠিতে

বিশদভাবে সব লিখে জানালেন, সেই সঙ্গে ব্যাখ্যার অতীত যে সব ঘটনা তাঁর বাড়িতে ঘটছে তাদের আসল কারণ খুঁজে বের করতে উপযুক্ত কজন শিক্ষিত লোককে পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে চিঠিটি লোক মারফত পাঠিয়ে দিলেন সরাসরি রাজধানী লণ্ডনে।

তখন রাজা দ্বিতীয় চার্লস ইংল্যাণ্ড শাসন করছেন, টেডওয়ার্থের ছোট আদালতের জজ মিঃ মম্পেসনের চিঠিখানা তিনি খুঁটিয়ে পড়লেন তারপর এমন কজন শিক্ষিত লোককে তাঁর বাড়িতে তদন্ত করতে পাঠালেন, ব্যাখার অতীত যে কোন ঘটনার তদন্তে যাঁরা বিশেষজ্ঞ। তাঁরা টেডওয়ার্সে এসে মিঃ মম্পেসনের বাড়িতে উঠলেন। বাড়ির প্রত্যেকটি আনাচ কানাচ খুঁটিয়ে দেখলেন। যে ক'দিন তাঁরা রইলেন সে ক'দিন উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটল না। এমন কি ঢাকের আওয়াজও হল না। কোনও ঘটনা না ঘটায় নিরাশ হয়ে বিশেষজ্ঞরা ফিরে গেলেন লণ্ডনে, আর তাঁরা ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে না দেখা ভূতের পাল শুরু করল তাদের অত্যাচার। ভূতেদের হাত থেকে বাঁচতে মিঃ মম্পেসন এবাব অন্য মতলব আঁটলেন। দিনের বেলা লুকিয়ে গিয়ে দেখা করলেন গ্লুস্টার জেলের জেলারের সঙ্গে, দরজা জানালা বন্ধ করে অনেকক্ষন তাঁর সঙ্গে গোপনে কিছু আলোচনা করলেন। আলোচনা শেষ হলে জেলারকে একটি প্রস্তাবও দিলেন তিনি। শুনে জেলার এককথায় তাঁর প্রস্তাবে রাজি হলেন।

পরদিন জেলার সেই কয়েদীকে নিয়ে এলেন জাহাজ ঘাটায়। তার চোখের সামনে সেই ভুতুড়ে ঢাক আনিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে ফেললেন তিনি। সবশেষে একটা বড় পালতোলা নৌকোয় এক সঙ্গে খাবার দাবার আর পানীয় জল সমেত কয়েদীকে তুলে সমুদ্রে নির্বাসন দিলেন। সাধের ঢাক নষ্ট হবার দুঃখে চোখের জল ফেলতে ফেলতে হতভাগা ভবঘুরে নৌকোয় চাপতেই মাঝি নৌকো ছেড়ে দিল। জেলারের নির্দেশে গভীর সমুদ্রের বুকে নামহীন এক অজানা দ্বীপে কয়েদীকে খাবার দাবার আব পানীয় জল সমেত নামিয়ে দিয়ে নৌকো নিয়ে সেদিনই ফিরে এল। সেদিন থেকে মিঃ মম্পেসনের বাড়িতে ভূতের অত্যাচার অথবা ব্যাখ্যার অতীত অপ্রাকৃতিক কাণ্ড কারখানার অবসান ঘটল, শান্তির ঘুম নেমে এলে পরিবারের সবার চোখে। সলসবেরি সমতলের লোককথায় টেডওয়ার্থের ঢাকীভূতের এই কাহিনীটিই প্রচলিত আছে।

এপওয়ার্থের জেফরি

ইংল্যাণ্ডের লিংকনসায়ার জেলার এপওয়ার্থ শহরের অনেকটা এলাকা অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় ছিল পাদ্রির শাসনাধীন। পাদ্রির অফিস ও লাগোয়া বাসভবনে এক ভূতের অস্তিত্বের কথা স্থানীয় লোককথায় পাওয়া যায়।

বাড়ির কাজের লোকেরা সেই ভূতকে জেফ্‌রি বুড়ো নামে উল্লেখ করত। জেফরি বুড়োকে পাদ্রি বা তাঁর কাজের লোকেরা কেউ কখনও চোখে দেখে নি। চোখের সামনে আর্বিভূত না হলেও যখন তখন বাইরে থেকে দরজায় ঘা দেয়া কি রান্নাঘরের তাকে খুটখাট আওয়াজ করা এইসব অপকর্মের মাধ্যমে সে বুঝিয়ে দিত পাদ্রির বাড়ি হলেও সে তাঁকে এতটুকু ভয় করে না। সাধারণত রাত ন'টা থেকে দশটার মধ্যে জেফরি বুড়োর ভৌতিক অপকর্ম শুরু হত। পাদ্রির বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েরা ন'টার মধ্যে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ত, জেফরি বুড়োর ভূত তাদের একেক জনের ঘরে ঢুকে খাটের গায়ে ঠুকঠুক আওয়াজ তুলত। কোনও ছোট ছেলে বা মেয়ে হয়ত তখনও না ঘুমিয়ে হাঁ করে জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরের আকাশের দিকে নয়ত প্যানপেনে নাকি গলায় কান্না জুড়েছে। এমন সময় খাটের গায়ে ঐ ঠুক ঠুক আওয়াজ হলে তাদের মায়েরা চমকে উঠত, বাচ্চাকে বুকে জাপটে ধরে কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় বলত, "জেফরি বুড়ো এসে গেছে, ভাল চাস্ ত কান্না থামিয়ে শীগ্‌গির চোখ বুজে ঘুমো, নয়ত ওকে ডাকব বলে রাখছি।" আগেই বলেছি খুটখাট ঠুকঠাক আওয়াজ করা জেফরি বুড়োর অপকর্ম এসবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এর আগে বদমাশ হাড়ে হারামজাদা ছোকরা ভূতের বাচ্চাদের বজ্জাতির যেসব বিবরণ শুনিয়েছি সে সবের ধারে কাছে ঘেঁষত না সে। এর দুটো কারণ থাকতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। এক জেফরি বুড়ো ভূত হলেও থাকত পাদ্রি মশাইয়ের বাড়িতে, যৌবনে যদি বা কখনও নচ্ছারপনা সে কোথাও করে থাকে ত বয়োবৃদ্ধি আর পাদ্রির বাড়ির সৎ সঙ্গের প্রভাবে সেই চরিত্র শেষে অনেকটাই কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল সে। যেটুকু ছিল চাঁদে কলংকের মত সেটুকু না থাকলে ভূত সমাজে তার বেঁচে থাকাটাই হত অর্থহীন। দুই ; জেফরি বুড়ো নামের মধ্যেই তার শান্তিপ্রিয়তার ইঙ্গিত আছে। বয়স বাড়লে মানুষের কেমন কাজ করার ক্ষমতা কমে যায় তেমনই ভূতেরও বজ্জাতি বদমায়েশির মাত্রা কমে আসে এবিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকার কথা নয়। হাজার হোক, ভূতের ও ত বয়স বাড়ে।

না, জেফরি বুড়োকে কেউ কখনও দেখেনি তবে বাড়ির পোষা ম্যাসটিফ কুকুরটা রোজ রাতে বাড়ির আনাচে কানাচে আক্রমণ করার ভঙ্গিতে দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে যেত। ঐ সময় অদ্ভুত একরকম একঘেয়ে গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে আসত তার গলা দিয়ে। কিন্তু ঐ দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে যাওয়া পর্যন্তই, তারপরেই দেখা যেত সে ছিটকে পড়েছে এককোণে। কাছে যেতে না যেতেই কেঁউ কেঁউ আওয়াজ করতে করতে লেজ গুটিয়ে দৌড়ে পালাত সে। সারারাত আর ধারেকাছে ঘেঁষত না। অনেকে বলেন কুকুর আর বেড়াল নাকি অশরীরীদের দেখতে পায়। ম্যাসটিফ কুকুরটাও কি জেফরি বুড়োকে দেখতে পেয়ে তার দিকে তেড়ে যেত। তারপর তার

হাতে পাল্টা মার খেয়ে পালিয়ে যেত? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া বুদ্ধির ব্যাখ্যার বাইরে। কুকুরদের দুনিয়ায় ম্যাসটিফের খুব সুনাম, সাহস ও লড়াই-এর হিম্মতে হাউণ্ডের পরেই তার আসন ; এহেন এক ম্যাসটিফ যখন কুঁই কুঁই করতে করতে ছিটকে পড়ত তখন বোঝাই যায় হাজার সাহসী আর মারকুটে হলেও অশরীরী জেফরি বুড়োর দাঁত খিঁচুনি দেখেই তার পিলে যেত চমকে। ধারালো দাঁত নখ দিয়ে যে ভূতের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না তা আঁচ করেই পরাজয়ের গ্লানি সইতে না পেরে কুঁই কুঁই করে কাঁদত সে।

ভূতের ভবিষ্যদ্বাণী

১৭০৬ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। অক্সফোর্ডসায়ার জেলার সোলডার্ন গ্রামের পাদ্রি রেভারেণ্ড মিঃ তাঁর স্টাডিতে জানালার ধারে জি চেয়ারে বসে বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছেন, এমন সময় খোলা জানালা দিয়ে কে যেন ভেতরে ঢুকল। চমকে উঠে পাদ্রি দেখেন তাঁর ছোটবেলার বন্ধু এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী জন নেলর খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়ে হাসি মুখে তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে। পাদ্রির চোখের চাউনি আর ভাবভঙ্গি দেখে মিঃ নেলর আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে হাত তুললেন তারপর একখানা চেয়ার নিয়ে এসে মুখোমুখি বসে বললেন। "মাটির নিচে সময় আর কাটতে চায় না হে, তাই বেরিয়ে পড়লাম, ভাবলাম পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে আসি।"

পাঁচ বছর আগে জন নেলরের মৃতদেহ কবর দেবার সময় পাদ্রি মিঃ শ নিজে বাইবেল থেকে মন্ত্র আর স্বস্তিবচন পাঠ করেছেন। বন্ধুর বিদেহী আত্মার কথা শুনে নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখলেন জেগে আছেন কিনা। ব্যথা অনুভব করতে বুঝলেন যা দেখছেন তা স্বপ্ন নয় বাস্তব।

"তোমায় শান্তির জন্য যদি আমার কিছু করায় থাকে ত বলো, "পাদ্রির কর্তব্য সম্পর্কে বন্ধুর বিদেহী আত্মাকে সচেতন করিয়ে দিতে কথাটা বললেন তিনি।

"তুমি ভুল করছ," বন্ধুর বিদেহী আত্মা জবাব দিল, "শান্তির জন্য আমি পাদ্রি খুঁজতে বেরোই নি। এক পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আগেই ত বললাম মাটির নিচে সময় আর কাটতে চাইছে না। হ্যাঁ, বলতে ভুলে গিয়েছি, এখানে আসায় আগে আর্থারের বাড়ি গিয়েছিলাম। আর্থার অর্চাডকে মনে আছে ত? সেই যে আমাদের সঙ্গে একই ইয়ারে পড়ত কেমব্রিজে। তা সেতো এখন খুব নামী লোক হয়েছে। আর্থারকে শুনিয়ে এলাম ওর সময় হয়ে এসেছে, শীগগিরই মাটির নিচে ওর বিছানাও পাতা হবে, তার আগে হাতের কাজকর্মগুলো যেন তাড়াতাড়ি সেরে নয়। সময় কিন্তু খুব বেশি নেই। আমার পক্ষে ভালই হবে, কলেজের পুরোনো বন্ধুরা আবার অনেকদিন পরে কাছাকাছি হব। পাদ্রি মিঃ শ অবাক হয়ে পরলোকগত বন্ধুর বিদেহী আত্মার কথা শুনছিলেন মন দিয়ে। এবার তাঁর দিকে আঙ্গুল তুলে ইশারা করল সে। একই মেজাজে বলল, "আর সেই প্রসঙ্গেই বলছি তোমারও সময় ঘনিয়ে এল বলে আর্থারের পরেই কিন্তু তোমার যাবার পালা সেদিন আসতে খুব দেরি নেই বলে রাখছি তাও।" বলতে বলতে সেই বিদেহী জানালার কাছে এসে দাঁড়াল, পরক্ষণে পাদ্রি মিঃ শ আর তাকে দেখতে পেলেন না। কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তার বিদেহী আত্মার আবির্ভাবের ঘটনা পৃথিবীর সব দেশেই প্রচলিত আছে। কিন্তু একবার ভাবুন ত, একজন জীবিত মানুষকে যদি একই সময়

পরপর দু'টি জায়গায় আবির্ভূত হতে দেখা যায় তবে তার যুক্তি সঙ্গত ব্যাখ্যা কি হতে পারে? না, দ্বৈত ভূমিকা সম্বলিত টানটান বাঁধুনির নিখুঁত ক্রাইম কাহিনীর প্লট নয়, এ একেবারে সত্যিকাহিনী ; ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা 'দ্য টাইমস''-এর চিঠিপত্র কলমে যা ছেপে বেরিয়েছিল।

তারিখটা ছিল ১৯০৮ সালের ১৩ই ডিসেম্বর। ইংল্যাণ্ডের নরফোক এলাকার বাসিন্দা ডঃ অ্যাস্টলি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে পাড়ি দিয়েছিলেন ফ্রান্সে। তাঁদের গন্তব্যস্থল ছিল আলজিরিয়ার বিসক্রায়, শীতের সময় ঐ এলাকার এক গ্রামের গির্জায় পাদ্রি হবার প্রস্তাব ডঃ অ্যাস্টলি সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন। আলজিরিয়া তখনও ছিল ফরাসি উপনিবেশ, ফ্রান্স হয়েই সেখানে যেতে হত, তাই ডঃ অ্যাস্টলি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ফ্রান্সের জাহাজে চেপেছিলেন। মার্সেই বন্দরে পৌছে ডঃ অ্যাস্টলি আলজিরিয়াগামী ট্রেনে চাপলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আলজিরিয়ায় পৌছোনোর আগেই তাঁদের দু'জনকে এক মারাত্মক ট্রেন দুর্ঘটনা পড়তে হল। আলজিরিয়াগামী ট্রেনটি খুব জোরে ছুটে চলছিল। আচমকা এঞ্জিন চালক দেখতে পেল তার উল্টোদিক থেকে একই লাইনে ছুটে আসছে একটি মালবাহী ট্রেন। ব্রেক চাপবার আগেই যাত্রীবাহী এক্সপ্রেস ট্রেনটি হুড়মুড় করে গিয়ে ধাক্কা মারল মালবাহী ট্রেনকে, প্রচণ্ড সংঘর্ষে এক্সপ্রেস ট্রেনের অনেকগুলো কামরা লাইনচ্যুত হয়ে ছিটকে গিয়ে পড়ল নদীর ধারে। অ্যাস্টলি আর তাঁর স্ত্রী দু'জনেরই পাঁজর ও পায়ের কয়েকটি হাড় গেল ভেঙ্গে, গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁদের দু'জনকেই নিয়ে যাওয়া হল স্থানীয় সরকারি হাসপাতালে।

ডঃ অ্যাস্টলি ও তাঁর স্ত্রীর রেল দুর্ঘটনার গুরুতর আহত হবার খবর কিন্তু তখনও ইংল্যাণ্ডে তাঁদের গ্রামে পৌছোয় নি। পরে ঐ ঘটনা প্রসঙ্গে খবরের কাগজে প্রকাশিত চিঠিপত্র পরে জানা যায় ট্রেন দুর্ঘটনার দিনটি ছিল শনিবার। নরফোকের ইস্ট রুডহ্যাম গ্রামের বাসিন্দা মিসেস হার্টলি স্থানীয় এক সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়িতে হাউস কিপারের কাজ করতেন। সেদিন বিকেলে স্টাডির জানালা বন্ধ করতে গিয়ে তিনি দেখলেন ডঃ অ্যাস্টলি বাড়ির আঙ্গিনায় ঢুকে পড়েছেন। লন পেরিয়ে ধীরে ধীরে জানালার কাছে এসে আচমকা থমকে দাঁড়ালেন তিনি। মিসেস হার্টলির বর্ণনা অনাযায়ী তিনি হাসিমাখা মুখে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলেন। বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও ডঃ অ্যাস্টলি বাড়ির ভেতরে এলেন না। ডঃ অ্যাস্টলির অনুপস্থিতিতে তাঁর বন্ধু প্রতিবেশী মিঃ ব্রুক সাময়িক ভাবে স্থানীয় গির্জায় পাদ্রির কাজ চালাচ্ছিলেন, ঐ সময় তিনি স্টাডিতে বসে বই পড়ছিলেন। মিসেস হার্টলির ডাক শুনে তিনি এসে দাঁড়ালেন জানালার সামনে। জানালার ওপাশে ডঃ অ্যাস্টলিকে তিনিও স্পষ্ট দেখতে পেলেন। তখন বিকেল পৌনে পাঁচটা। বেলা শেষ হয়ে এলেও সূর্যের আলোয় এখনও ভাঁটা পড়েনি ; একই দৃশ্য দেখলেন দু'জনেই, কেউ ভুল দেখেন নি। মিঃ ব্রুক পরে এই ঘটনা প্রসঙ্গে যা লিখেছিলেন তার সারমর্ম হল, ধীরে ধীরে ডঃ অ্যাস্টলির মূর্তি তাঁর চোখের সামনে থেকে মুছে গেল। এই ঘটনার কিছুদিন পরে এক ট্রেন দুর্ঘটনায় ডঃ অ্যাস্টলির গুরুতর আহত হবার খবর শুনে চমকে উঠলেন মিঃ ব্রুক ও মিসেস হার্টলি। চমকানোর কারণও ছিল যেহেতু তাঁরা দু'জনে যে সময় ডঃ অ্যাস্টলিকে দেখেন সেই সময় তিনি ইংল্যাণ্ড থেকে বহু দূরে ফ্রান্সের এক সরকারি হাসপাতালে আপাদমস্তক ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় শুয়ে ছিলেন। ঐ অবস্থায় দু'জন প্রতিবেশী একইসঙ্গে তাঁকে সুস্থ অবস্থায় কিভাবে

দেখতে পেল তা বিজ্ঞানের অতীত। এই ঘটনা প্রসঙ্গের পাদ্রি মিঃ ব্রুকের লেখা একটি চিঠি পরে ১৯০৮-এর ২৮শে ডিসেম্বর তারিখের 'দ্য টাইমস' সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছি বলে জানা যায়।

ভৌতিক খুলির কাহিনী

মৃতব্যক্তির শেষ ইচ্ছানুসারে কবর দেবার আগে তার মাথা ধড় থেকে কেটে তার বসতবাড়ির কোনও নির্দিষ্ট স্থানে পুঁতে রাখার নজীর মধ্যযুগের ইংল্যাণ্ডে ভুরি ভুরি আছে। যে ভাবধারার বশবর্তী হয়ে প্রাচীন মিশরের মানুষ মৃত্যুর পরেও ঐহিক ভোগবিলাসে আসক্ত থাকার মোহে নিজেদের যাবতীয় ঐশ্বর্য বিলাসের উপকরণ এমন কি দাসদাসীদেরও নিজেদের মৃতদেহের সঙ্গে জীবন্ত সমাধি দিত। নিজের মৃতদেহের মাথা কেটে বাড়ির ভেতরে পুঁতে রাখায় ভাবনা যে সেই একই ভারধারা সঞ্জাত তাতে এতটুকু সন্দেহের অবকাশ নেই।

বার্টন অ্যাগনেস হল

ইয়র্কশায়ারের পূবদিকে ব্রিডলিংটন ও ড্রিফিল্ডের মাঝখানে ছবির মত গ্রাম বার্টন অ্যাগনেস। স্থানীয় প্রাসাদটি গ্রাম থেকে কিছু দূরে উঁচু জমির ওপর দাঁড়িয়ে। স্থাপত্যকলার ভাষায় এলিজাবেথ ও জেকোবিয়ান শিল্পকলায় বৈশিষ্ট্যযুক্ত এই প্রাসাদ রেনেশাঁস যুগের এক অন্যতম উৎকৃষ্ট শিল্প নিদর্শন।

নানা বংশের হাত ঘুরে রাণী প্রথম এলিজাবেথের জমানার শেষের দিকে বার্টন অ্যাগনেস হলের উত্তরাধিকারী হল তিনজন ; স্যার হেনরি গ্রিফিনের তিন মেয়ে। তিনটি মেয়েই দেখতে ছিল অসামান্য রূপসী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা না থাকলেও এখনকার দৃষ্টি ভঙ্গির মাপকাঠিতে বিদূষী, গৃহকর্মা নিপুনা, সেই সঙ্গে বুদ্ধিমতী। এতসব গুণের অধিকারিণী হওয়ার পরেও ভাগ্য কিন্তু তাদের ওপর মোটেও সুপ্রসন্ন হল না—বার্টন অ্যাগনেসের মত এক গ্রাম্য এলাকায় এমন পাত্র তাদের জুটল না যারা রূপে গুণে বিদ্যায় বুদ্ধিতে এবং অবশ্যই অর্থ কৌলিন্যে তাদের উদ্ধার করার উপযুক্ত। অগত্যা বাবা স্যর হিনরি গ্রিফিন মারা যাবার পরে তাঁর মেয়েরা পৈতৃক সম্পত্তি দেখাশোনা করেই সময় কাটাতে লাগল।

সামন্ততন্ত্রের যুগ তখন শেষ হয়ে আসছে, পরিখা ঘেরা দুর্গের ভেতর জবুথবু হয়ে দিন কাটানো অর্থহীন হয়ে উঠছে ইংল্যাণ্ডের মানুষের কাছে। শিল্পের দুনিয়ায় যে নতুন হাওয়া বইতে শুরু করেছে তার মিষ্টি আমেজ এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে বাড়ি ঘর তৈরির সাবেক পদ্ধতির ধ্যান ধারায়, আনছে নতুন ধারা যার নাম রেনেশাঁস বা নবজাগরণ। হাতে কাজকর্ম নেই। চিন্তা ভাবনা নেই। অন্তত দু'পুরুষ ত নিশ্চিন্তে কাটানোর মত অঢেল টাকা বাপ রেখে গেছে। তাই গ্রিফিন বোনেরা এবার সে টাকা ওড়ানোর কাজে মন দিল। অবশ্যই বাজে কাজের পেছনে নয় ; পূর্বপুরুষের তৈরি প্রাসাদটি অত্যন্ত সেকেলে এবং থাকার অযোগ্য এই ভাবনা দানা বাঁধল তাদের মনে, অন্য কোথাও গিয়ে ঘর বাঁধার সম্ভাবনা যখন দেখা যাচ্ছে না তখন যেখানে আছি সে জায়গাটারই চেহারা পাল্টে মনের মত করে গড়ে তোলা যাক এই সিদ্ধান্ত নিল তারা তিনজনে। গ্রামের জমিদারের প্রাসাদ ভেঙ্গেচুরে নতুন করে গড়া হবে এ-খবর ছড়াতে দেরি

হ'ল না। আর খবর পেয়েই রাজমিস্ত্রীর দল এসে দেখা করতে লাগল গ্রিফিথ বোনেদের সঙ্গে। আগেই বলেছি ওড়ানোর মত প্রচুর টাকা তাদের বাবা স্যার গ্রিফিথ রেখে গিয়েছিলেন। সেই টাকা খরচ করে ইনিগো জোনসের মত নামী স্থপতিকে সেই গণ্ডগ্রামে নিয়ে এল তারা। নতুন করে প্রাসাদ গড়ার দায়িত্ব সঁপে দিল তাঁর হাতে।

হাতের পাঁচটা আঙ্গুল একে অন্যের চেয়ে আলাদা এই সনাতন ও শাশ্বত নিয়ম অনুযায়ী তিন গ্রিফিথ বোনের ধাতও যে একরকম ছিল না তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। স্যার গ্রিফিথের বড় আর মেজো মেয়ে টাকা ওড়াতে জানত, কিন্তু শিল্পকলার সঙ্গে একাত্ম, এক মন প্রাণ হওয়ার সূক্ষ্মতা তাদের দু'জনের একজনেরও মধ্যে ছিল না। সেই সত্তা ছিল শুধু ছোট মেয়ে অ্যানের মধ্যে। পৈতৃক প্রাসাদ ভেঙ্গে চুরে নতুন করে গড়ার মুহূর্ত থেকে সে প্রধান স্থপতির পায়ে পায়ে ঘুরছে, রাজমিস্ত্রিদের বিশাল কর্মযজ্ঞের প্রতিটি মুহূর্ত খুঁটিয়ে লক্ষ করছে। বাড়ির পুরোনো ভাঙ্গাচোরা অংশে নতুন ঢালাইয়ের কাজের সময় দাঁড়িয়ে পছন্দ মতন একেকটি অংশ নতুন করে গড়ার নির্দেশ দিচ্ছে। পৈতৃক বার্টন অ্যাগনেস হল নতুন করে গড়ে তোলার কাজে অ্যান গ্রিফিথ নিজের সত্তাকে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে ফেলেছিল। সত্যি বলতে কি, ছোটবোন অ্যান বাড়ি তৈবির দায়িত্ব এই ভাবে ভালবেসে নিজের হাতে নেয়ায় তার ওপরের দু'বোন নিশ্চিন্ত হয়েছিল, একাজ থেকে নিজেদের যতদূর সম্ভব গুটিয়ে নিয়েছিল তারা।

বাড়ি তৈরির কাজ একদিন শেষ হল। নতুন প্রাসাদে বোনেরা যে যার মত গুছিযে বসার কিছুদিন পরের ঘটনা। বার্টন অ্যাগনেস গ্রাম থেকে মাইল খানেক দূরে হারদ্যামে এক আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গেল অ্যান। ইয়র্কশায়ারের মেঠো পথঘাট সে সময় চোর ডাকাত, লুটেরা আর ভণ্ড সাধুতে থিকথিক করছে। কোনও সদ্য যুবতীর পক্ষে ঐখানে আসা যাওয়া করার অর্থ যেচে বিপদের ঝুঁকি নেয়া। সবকিছু জেনেও অ্যান একাই তার আত্মীয়ের বাড়ির পথে পাড়ি দিল। কিন্তু বেচারির কপাল মন্দ, অর্দ্ধেক পথ পেরোনোর আগেই একপাল ছেনতাইবাজের হাতে পড়ল সে। তারা তাকে মেরে ধরে কাপড় চোপড়, টাকা কড়ি, গয়নাগাঁটি সঙ্গে যেটুকু ছিল সব কেড়ে নিল। তারপর বেহুঁশ অবস্থায় তাকে এক গাছতলায় ফেলে রেখে চম্পট দিল। সূর্য ডোবার আগেই পথ চলতি কিছু লোক গাছতলায় প্রায় অর্দ্ধনগ্ন একটি বেহুঁশ যুবতী মেয়েকে অসহায়ভাবে পড়ে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়াল। কাছে এগিয়ে আসতে তারা দেখল এ যে বার্টন অ্যাগনেস হলের জমিদার স্যার গ্রিফিথের ছোট মেয়ে অ্যান। ঘোড়ার পিঠে কোনমতে বসিয়ে দয়া পরবশ এক পথচারী অ্যানকে পৌঁছে দিলেন তার বোনেদের কাছে। বোনেরা লোক ডেকে ধরাধরি করে অ্যানকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে শোয়াল। যিনি তাকে পৌঁছে দিলেন তাঁকে জানাল ঘোড়ারগাড়িতে চড়ে ছোট বোনকে আত্মীয়ের বাড়ি পাঠাতে চেয়েছিল। কিন্তু ছোট বোনটি চিরকালই জেদী আর একগুঁয়ে, তাদের সদুপদেশ না শুনে সে একা পায়ে হেঁটে রওনা হয়েছিল। এই ভাবে তাদের কথা না শোনার ফল বেচারীকে হাতে হাতে পেতে হল। যে পথচারী অ্যানকে বাড়ি পৌঁছে দিলেন তিনিই গ্রিফিথ পরিবারের পারিবারিক চিকিৎসককে খবর দিয়ে ডেকে আনলেন। স্যার গ্রিফিথের ছোটমেয়ের চিকিৎসার ত্রুটি হল না। হুঁস ফিরে এলেও একরকম ঘোর বা আচ্ছন্নতার মধ্যে রইল অ্যান। বড় বোনেদের ডেকে বলল,

"আমি আর সেরে উঠব না। যত চিকিৎসাই করো তোমরা আমায় বাঁচাতে পারব না। শীগগিরই আমি মুক্ত হব, তারপর চলে যাব বাবার কাছে, তিনি আমায় কোলে তুলে নেবেন বলে আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। যাবার আগে তোমাদের কাছে একটা ছোট প্রার্থনা জানাচ্ছি দেখো আমার প্রার্থনা পূরণ করতে যেন ভুলে যেয়ো না। বলো আমার প্রার্থনা পূরণ করবে ত?"

"কি তোমার প্রার্থনা?" বড় বোন জানতে চাইল।

'বড় কষ্ট করে সব মন প্রাণ ঢেলে এই প্রাসাদ নতুন করে গড়ার কাজে আমার সব মন প্রাণ ঢেলে দিয়েছি, এর মায়া আমি কাটাতে পারব না, কবর দেবার আগে আমার মাথাটা কেটে তোমরা সিঁড়িতে ওঠার মুখে দেওয়ালের ভেতরে গেঁথে রেখো। দেখবে এতে তোমাদের ভাল হবে।'

জোরালো ভাবে প্রতিশ্রুতি না দিলেও বড় বোনেরা এমনভাবে অ্যানকে প্রবোধ দিল যা শুনে বেচারি আশ্বস্ত হল। চিকিৎসার কোনও হেরফের না হলেও তাতে কোনও কাজ হল না। পারিবারিক চিকিৎসকের সবরকম প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দুর্ঘটনার ক'দিন বাদে চিরদিনের জন্য চোখ বুঁজল অ্যান গ্রিফিন, বালবাহুল্য মৃতদেহ কবর দেবার সময় অ্যানের শেষ বাসনার কথা ভুলে গেল তার বোনেরা। ছোটবোনের দেহটি অবিকৃত অবস্থাতেই কফিনে পুরে প্রাসাদের নিচে পারিবারিক সমাধি ভবনে চোখের জল ফেলতে ফেলতে রেখে এল তারা।

অ্যান মারা যাবার মাসখানেকের মধ্যে বাড়ির ভেতরে শুরু হল ব্যাখ্যায় অতীত নানারকম অস্বাভাবিক কার্যকলাপ। দিনেরাতে যখন তখন ধুপধাপ আওয়াজ শুরু হয় ছাদে ; রাতদুপুরে দুদ্দাড় করে কে সারা বাড়ি দৌড়োয়। ভাঁড়ার ঘরে ইঁদুর ছুঁচো নেই অথচ তারই মধ্যে কাপ ডিশ ভেঙ্গে তছনছ হয়। রান্নার জিনিস মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। খাবার জলের কুঁজো উল্টে সব জল যায় নর্দমায় গড়িয়ে। এসবই, এর ওপর আছে অদ্ভুত আওয়াজ। দিনেরবেলা যেমন তেমন, কিন্তু পিলে চমকানো বিটকেল আওয়াজে রাতভর দু'চোখের পাতা এক করতে না পারলে মানুষ টেঁকে কি করে?

শুধু কাজের লোকেরাই নয়, প্রাসাদে ভৌতিক উপদ্রব শুরু হবার পর থেকে স্যর গ্রিফিনের দুই মেয়ের চোখ থেকেও ঘুম বিদেয় নিয়েছে। ছোট বোনের শোক ভুলতে না ভুলতেই এইসব উপদ্রবে তারা হতভম্ব হয়ে পড়েছে। উপায়ান্তর না দেখে কাজের লোকেদের দিয়ে গির্জায় পাদ্রিকে বোনেরা ডেকে পাঠাল। পাদ্রি এসে সব শুনে এসব যে ভৌতিক উপদ্রব সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলেন। কথা প্রসঙ্গে ছোটবোন অ্যানের মৃত্যু প্রসঙ্গ উঠল। আর আশ্চর্য, মারা যাবার আগে তার যে অন্তিম বাসনার কথা বোনেরা ভুলে গিয়েছিল বা গুরুত্ব দেয়নি সেই প্রসঙ্গও এসে গেল। শুনে পাদ্রি বোনেদের বললেন, ছোটবোনের সব বাসনা পূরণ না করে খুব অন্যায় করেছে তারা। সেদিনই দু'বোনকে নিয়ে তিনি নেমে এলেন প্রাসাদের নিচে গ্রিফিন পরিবারের নিজস্ব সমাধি ভবনে। ভবনের দরজা খুলে মশাল জ্বালিয়ে ভেতরে ঢুকে সবাই দেখল পরিবারের প্রত্যেকটি মৃতদেহের কফিন উল্টে পাল্টে স্থানচ্যুত হয়ে মেঝেময় ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের ভেঙ্গে ভেতর থেকে গলিত পা বা হাত উঁকি দিচ্ছে, কোনওটা থেকে পচাগলা বীভৎস মুখ। সেগুলো পেরিয়ে এসে অ্যানের কফিনের সামনে এসে দাঁড়ালেন সবাই। পাদ্রির নির্দেশে কফিন খুলতে সবাই দেখল এক আশ্চর্য দৃশ্য, অ্যানের মৃতদেহের ঘাড়ের ওপর থেকে মাথাটা

কে যেন ধারলো অস্ত্র দিয়ে কেটে বসিয়ে রেখেছে মৃতদেহের বুকের ওপর। পচনের ফলে মুখের মাংস গলে গেলেও চোখ দুটো এখনও জীবন্ত ঠেকছে, বিদ্রূপ মেশানো চাউনি মেলে সে দু'টি চোখ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে বড় দু'বোনের মুখের দিকে, সমাধি ভবনের দরজায় তালা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও কে কিভাবে কফিনের ভেতরে শোয়ানো অ্যানের মৃতদেহ থেকে তার মাথা খানা কেটে ফেলল এই প্রশ্নের উত্তর পাদ্রি অ্যানের ওপরের দু'বোনকে দিতে পারলেন না। কিন্তু তাঁর নির্দেশে অ্যানের দিদিরা তার মাথাখানা নিয়ে ওপরে উঠে এল। তারপর অ্যান যেমন চেয়েছিল হুবহু সেইভাবে দোতলার ওঠার সিঁড়ির মুখে দেওয়ালে খুঁড়ে ভেতরে মাথাখানা রেখে আবার দেয়াল বুজিয়ে দিল। প্রাসাদের ভেতরে যেসব ভৌতিক কাণ্ডকারখানা এতদিন ধরে চলছিল আশ্চর্যজনক ভাবে সে সবই ঐদিন থেকে থেমে গেল। বহু বছর এইভাবে কাটাবার পরে ঘটল এক ঘটনা ; বার্টন অ্যাগনেস হলে জমিদার স্যার গ্রিফিনের ছোট মেয়ে অ্যানের মাথার খুলি রাখা আছে এই খবর বাড়ির কাজের লোকেদের মুখ থেকে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। ভূত প্রেমিক পর্যটকদের কানেও সে খবর পৌঁছে গেল। এই খবরে কৌতূহলী হয়ে তারা দলে দলে এসে ভিড় জমাতে লাগল বার্টন অ্যাগনেস হলে। রেনেসাঁস শৈলীতে নবগঠিত প্রাসাদের স্থাপত্য সৌধ দেখার বিন্দুমাত্র আগ্রহ তাদের নেই, তাদের যত আগ্রহ আর কৌতূহল অ্যানের খুলিকে ঘিরে। অ্যানের বোনেরা তাদের নিরাশা করল না। দেওয়ালের যে অংশে খুলি রাখা ছিল সেই অংশ ভেঙ্গে সেখান কাঁচের শোকেস বসালো তারা, ভেতরে ফ্লোরোসেন্ট টিউবের আলোর সামনে ছোট রূপোর রেকাবিতে গয়নার বাক্সের ভেতরে ভেলভেটের নরম কাপড়ের ওপর রাখল ছোটবোনের মাথার খুলি। একদিন বাড়ির এক কমবয়সী কাজের মেয়ের মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি খেলেছিল, মালকিনদের নজর এড়িয়ে সে সেই খুলি সিঁড়ির দেওয়ালের গায়ে আঁটা শোকেস খুলে বের করে চলে এল ছাদে, তারপর ছেলেমানুষি খেয়ালের বশে বলের মত সেটা দু'হাতে লোফালুফি শুরু করল। প্রাসাদের সমানের রাস্তা দিয়ে একটা মালবোঝাই ঘোড়ার গাড়ি যাচ্ছিল, মেয়েটা খেলতে খেলতে খুলিটা আচমকা ছুঁড়ে ফেলল সেই গাড়ি তাক করে। খুলিটা এসে পড়ল গাড়ির পাটাতনে রাখা তরকারির চুবড়ির ভেতর। সঙ্গে সঙ্গে যেন জাদু মন্ত্রবলে থেমে গেল গাড়িতে আঁটা ঘোড়া দুটো, গাড়োয়ান হাজার চাবুক মেরেও তাদের এক পা নড়াতে পারল না। খানিক বাদে দু'জন পর্যটক এসে হাজির, তারা অ্যান গ্রিফিনের খুলি দেখবে বলে লণ্ডন থেকে ছুটে এসেছে বার্টন অ্যাগনেস গ্রামে। অ্যানের বোনেরা তাদের সমাদর করে নিয়ে এল বাড়ির ভেতর, কিন্তু সিঁড়ির কাছে যেতেই চোখ ছানাবড়া হবার জোগার। কাঁচের শোকেস খালি, ভেতরে রূপোয় রেকাবিতে রাখা ভেলভেটে মোড়া কাঠের গয়নার বাক্সের ডালা খোলা, তাতে খুলি নেই, কোথায় গেল তাদের আদরের ছোট বোনের খুলি? স্যার গ্রিফিনের বড় আর মেজো মেয়ের মুখ উত্তেজনা আর অপমানে লাল হয়ে উঠল। পর্যটক দু'জনকে ড্রইংরুমে অপেক্ষা করতে বলে দু'বোন আবার এল শোকেস-এর কাছে দেখল শোকেস-এর কাঁচ ঠিকমতন বন্ধ করা হয় নি। খুলি যেই সরাক সে যে পাকা চোর নয়, এ বিষয়ে নিশ্চিত হল দু'জনেই। তখনই বাড়ির কাজের লোকেদের সবাইকে তলব করল তারা। কাজের লোকেরা সবাই এসে জড়ো হতে জানা গেল কম বয়সী একটি মেয়ের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। মেয়েটির মা রান্নাঘরে কুটনো কোটে, এটা সেটা জোগান দেবার কাজে সাহায্য হবে

ভেবে নিজের মেয়েকে রোজ নিয়ে আসত সে, মনিবনীরা এতদিন এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিছু বলে নি।

"কোথায় গেল তোমার মেয়ে?" জানতে চাইল বড় মনিবনী, যেখান থেকে পারো তাকে খুঁজে বের করে হাজির করো।"

'তাকে ত বহুক্ষণ মুখ দেখতেছি না দিদি।" বলল রান্নাঘরের কুটনো কোটা ঝি।

"ওসব বললে শুনছি না।" বলেই প্রাসাদের সদর ফটকের দারোয়ানকে ডেকে ফটক বন্ধ করার হুকুম দিল বড় মনিবনী। জানতে চাইল কুটনো কোটা ঝি-র মেয়েকে প্রাসাদের বাইরে সে যেতে দেখেছে কিনা। দারোয়ান বলল, দেখে নি।

এবার কাজের লোকেদের প্রাসাদের ভেতর সবখানে খোঁজার হুকুম দিল মনিবনীরা। হুকুম পেয়ে তারা প্রবল উৎসাহে ছুটল যে যেদিকে পারে। একজন খুঁজতে খুঁজতে চলে এল ছাদে। এসে দেখে কুটনো কোটা ঝি-এর দুষ্টু মেয়েটা ছাদের কোণে আলসের ওপর ঝুঁকে পড়ে গভীর আগ্রহে নিচের দিকে কি যেন দেখছে।

"অ্যাই, তুই এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস?" সেই কাজের লোক ধমকে উঠল। "এদিকে আমরা বাড়িশুদ্ধ সবাই তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

ধমক খেয়ে মেয়েটা ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল। কাজের লোকের হাত ধরে বলে ফেলল সে না জেনে খুব অন্যায় করেছে, মনিবনীরা জানতে পারলে রান্নাঘরের বেলনি দিয়ে ঠেঙ্গিয়ে তার পিঠ ভাঙ্গবেন। তার কথার ধরনে কাজের লোকের সন্দেহ হল, মেয়েটার কান পেঁচিয়ে ঠাস ঠাস করে গোটা দু'ই চড় মারল তার গালে, জানতে চাইল কি অন্যায় সে করেছে। মার খেয়ে মেয়েটা আর চুপ করে থাকতে পারল না। মুখ ফুটে বলে ফেলল খানিক আগে বল নিয়ে লোফালুফি খেলার সাধ জেগেছিল মনে কিন্তু হাতের কাছে বল না পেয়ে মাথায় বদবুদ্ধি এল, সিঁড়ির মাথার শোকেস খুলে দিদিমণিদের সাধের মড়ার খুলি বের করে নিয়েছিল সে। ছাদে এসে তাই নিয়ে ত দিব্যি লোফালুফি খেলছিল, আচমকা খুলিটা যেন তার হাত ফসকে উড়ে গিয়ে পড়ল নিচে ঘোড়ায় টানা গাড়ির সবজির চুবড়িতে। গাড়ির চাকা সেই থেকে অচল হয়ে আছে। গাড়োয়ানের চাবুক বারবার পিঠ পেতে খেয়েও ঘোড়াদুটো গাড়িটা টানতে পারছে না। গাড়ির চাকা মাটিতে বসে গেছে অনড় হয়ে।

শুনে সেই কাজের লোকের মাথায় ফের রক্ত চড়ে গেল, কান ধরে আরও গোটাকয়েক থাপ্পড় কষাল তার দু'গালে। পরক্ষণে মাথা ঠাণ্ডা করল সে। সে জানে মেয়েটাকে টেনে মনিবনীদের কাছে নিয়ে গিয়ে হাজির করলে তাঁরা এই মুহূর্তে মেয়েটাকে প্রাসাদ থেকে দূর করে দেবেন। চাই কি চুরির দায়ে পুলিশের হাতেও তুলে দিতে পারেন। আহা, মেয়েটির মা বড্ড গরীব। হয়ত মেয়ের অপরাধে সেই বেচারিরও চাকরি যাবে। কিন্তু কি ভাবে সবাইকে বাঁচিয়ে সবদিক রক্ষা করা যায়? ভাবতে ভাবতে এক বুদ্ধি এল তার মাথায়, মেয়েটিকে ছাদের চিলেকোঠায় ঢুকিয়ে চুপ করে থাকতে বলল সে। তারপর বাইরে থেকে দরজায় শেকল তুলে আলসের গায়ে বৃষ্টির জলের পাইপ বেয়ে তর তর করে নেমে গেল নিচে। মাটিতে নেমে দেখল প্রাসাদের একপাশে এসে দাঁড়িয়েছে সে, তখনই প্রচুর লোকের হইহল্লা তার কানে এল। ঘুরে প্রাসাদের সামনে আসতে দেখে মেয়েটি খানিক আগে ঠিকই বলেছে। দু'ঘোড়ায় টানা

একখানা ঘোড়ার গাড়ি অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পথের মাঝে। গাড়োয়ানের চাবুক খেয়ে ঘোড়াদুটো হেদিয়ে পড়েছে, বৃষ্টির জলের মত ঘাম ঝরে পড়ছে তাদের গা থেকে কিন্তু গাড়ি টানতে পারছেনা তারা। কাজের লোকটি দেখল গাড়োয়ানের ঠিক পেছনে কাঠের পাটাতনের ওপর সত্যিই একটা বড় চুবড়িতে সবজি রাখা আছে। মজা দেখার জন্য ততক্ষণে অনেক লোক এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে গাড়ির চারপাশে। ব্যাপার দেখে সবাই হতভম্ব। কাজের লোকটি এবার সাহসে ভর করে ভিড় ঠেলে উঠে পড়ল গাড়ির পাটাতনে, চুবড়ির ভেতর উঁকি দিতেই সবুজ তরকারির ফাঁকে খুলির সাদা অংশটা তার চোখে ঠেকল। কোনওদিকে না তাকিয়ে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে খুলিটা তুলে আনল সে। তারপর পাটাতন থেকে নেমে আগের মতই প্রাসাদের পাশে চলে এল। ছোট খুলিটা ট্রাউজার্সের পকেটে ঢুকিয়ে বৃষ্টির জলে পাইপ বেয়ে ওপরে উঠতে না উঠতেই গোড়াদুটোর চিঁহি আর চাকার ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ কানে আসতে সে বুঝল অচল ঘোড়ার গাড়ি আবার চলতে শুরু করেছে। ভয়ে ভয়ে পাইপ বেয়ে ছাদের ওপর উঠল সেই কাজের লোক, তারপর চিলেকোঠার শেকল খুলে দুষ্টু মেয়েটিকে চাপা গলায় বলল, "খুলি পাওয়া গেছে! যা! এবারের মত বরাত জোড়ে বেঁচে গেলি। এবার যা বলি শোন, তুই চিলেকোঠায় চোখ বুঁজে শুয়ে থাক। আমি বলব তুই ছাদে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিলি। খুলি, আমি যাদের জিনিস তাদের হাতে ফিবিয়ে দিচ্ছি। ভয় নেই, তোর নাম ফাঁস করব না। কিন্তু আবার কখনও এতে হাত দিলে জানিস তোকে বাঁচানোর মত কেউ থাকবে না, আমাদের মনিব-নীরাও না!"

মেয়েটি তার কথামতন চিলেকোঠায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। কাজের লোকটি এরপর নিচে গিয়ে খুলিটা মনিবণীদের হাতে দিয়ে বলল মেয়েটি ছাদের চিলেকোঠায় পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। এও বলল ছাদ থেকে নেমে আসার মুখে খুলিটা সিঁড়ির কোণে পড়ে আছে দেখতে পেয়ে তুলে এনেছে সে। তার বলার মধ্যে মেয়েটিকে সন্দেহ করার মত যথেষ্ট উপাদান থাকা সত্ত্বেও হারানো খুলি ফিরে পাবার খুশিতে গ্রিফিথ বোনেদের মনে সে প্রশ্ন দেখা দিল না। খুলিটাকে যথাস্থানে রেখে কাজের লোকেদের তখনকার মত রেহাই দিল তারা। তাদের খুলি দেখতে আসা বিদেশী পর্যটকদের ডাকিয়ে এনে তা দেখাল। ঐ ঘটনার পরে গ্রিফিথ বোনেরা তাদের ছোট বোনের খুলির বাণিজ্যিক মূল্য কি অপরিসীম তা বুঝতে পারল। খুলি সমেত প্রাসাদের জাতীয় প্রাচীন ঐতিহাসিক দ্রব্য দেখার জন্য টিকিট কাটার ব্যবস্থা চালু করল তারা। এরপর তারা খুলি পাহারা দেবার জন্য লোকও রাখল। শুনলে আশ্চর্য হতে হবে, খুলি যে শোকেস থেকে সরিয়েছিল প্রাসাদের রান্নাঘরের কুটনো কাটা ঝি-এর সেই দুষ্টু মেয়েটি অ্যান গ্রিফিথের খুলি পাহারা দেবার কাজে বহাল করল বার্টন অ্যাগনেস হলের মালিক গ্রিফিথ বোনেরা।

গ্রিফিথ বোনেদের মধ্যে বড়টির বিয়ে হয় নি। যৌবনেই তার অকালমৃত্যু ঘটে। মেজো মেয়েটি পাত্রস্থ হয় বার্মস্টোনের বায়ন্টন জমিদার পরিবারে। বিয়ের পরে জামাই শ্বশুরবাড়িতে এসে বহুযুগ আগে মৃত ছোট শ্যালিকার খুলি দর্শনীয় বস্তু হিসেবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে দেখে অবিশ্বাসের হাসি হাসল। দেয়ালে আঁটা শো-কেস থেকে খুলিটা বের করে 'কি হয় দেখি' গোছের মনোভাব নিয়ে প্রাসাদের বাগানের এক কোণে পুঁতে ফেলল সে। বহুকাল পড়ে আবার খুলির এহেন অবমাননা ঘটায় অ্যানের আত্মার শান্তির ঘুম গেল ভেঙ্গে। আবার মেজে বোনের

পরিবারে একের পর এক অশান্তির ঝড় তুলল সে। খুলিটা বাগানে পুঁতে অ্যানের মেজো ভগ্নিপতি ঘোড়ায় চেপে বেড়াতে বেরিয়েছিল। মাঝপথে ঘোড়াটা আচমকা গেল ক্ষেপে। পিছপা হয়ে মনিবকে ফেলে দিল পিঠ থেকে। মাটিতে আছড়ে পড়ে জামাই বাবাজীবনের হাত ভাঙ্গল। ডান পা গেল মচকে। ঐ অবস্থায় গ্রামে পড়ে থাকা অর্থহীন। তাই সুচিকিৎসার জন্য বৌকে নিয়ে গাড়ি ভাড়া করে বাড়ি ফিরল সে। ফিরেই শুনল দুঃসংবাদ—তাদের তিনটি জাহাজ মালসমেত ডুবে গেছে ভূমধ্যসাগরে। জামাইয়ের বড় ভাই সে রাতে পার্টিথেকে বেশি রাতে ফিরে নেশায় বেহুঁশ হয়ে শুয়ে পড়েছিল। হুঁশ ফেরার আগেই হার্টফেল করে মারা গেল সে। পর পর এসব ঘটনা ঘটায় তার স্ত্রী গেল ঘাবড়ে। ছোট বোনের খুলিটা মাটি খুঁড়ে তুলে আগে যে জায়গায় ছিল সেখানে রেখে দেবার অনুরোধ করতে লাগল সে। জামাই ততদিনে মনোবল খুইয়ে ভৌতিক কার্যকলাপে দারুণ বিশ্বাসী হয়ে পড়েছে। ছোট শ্যালিকার আত্মার প্রতি সম্মান দেখাতে সে নিজে হাতে তার খুলি বাগানের মাটি খুঁড়ে তুলে আগের জায়গায় সেই শোকেসে রেখে দিল। দুর্ভাগ্য সৌভাগ্যে পরিণত না হলেও এরপর নতুন করে কোনও দুর্দৈবের মুখোমুখি হতে হয় নি জামাই বাবাজীবনকে।

এই সেদিন আজ থেকে পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে ষাটের দশকে সেই একদা ভূতে ঘোর অবিশ্বাসী জামাইয়ের এক বন্ধুর ছেলে বার্টন অ্যাগনেস হলের খুলির কাহিণী বইয়ে পড়ে আর লোকমুখে শুনে নিজে চোখে দেখতে লণ্ডন থেকে এসে হাজির হল সেখানে। তার বাবার বন্ধু অ্যান গ্রিফিথের মেজো বোনের বরের কাছ থেকে একখানা সুপারিশ জোগাড় করেছিল সে। প্রাসাদের কেয়ার টেকারের হাতে সেখানা দিয়ে বলল, কম করে সাতদিন সে ঐ প্রাসাদে কাটাবে বলে এসেছে।

সুপারিশখানা মন দিয়ে পড়ল কেয়ারটেকার—মেজো জামাইয়ের নিজের হাতে লেখা সুপারিশ। পত্রবাহক যে ক'দিন চায় সেই ক'দিন তার থাকা খাওয়ায় সুবন্দোবস্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাতে।

"তুমি এ বাড়ির মেজো জামাইয়ের বন্ধুর ছেলে", প্রৌঢ় কেয়ারটেকার সুপারিশখানা পড়ে পকেটে গুঁজে বললেন, "তুমি এখানে থাকবে এত আনন্দের কথা। বুড়ো হয়েছি। স্বজনেরা বেশিরভাগ কবে মরে গেছে, বাকি যারা ছিল তারা কাজকর্মের ধান্দায় বিদেশে গেছে কবে। বিদেশী মেয়ে বিয়ে করে ঘর বেঁধেছে সেখানেই। মানুষ ত আর একা থাকতে পারে না। তুমি এলে তোমার সঙ্গে কথা বলে তবু মনটা ভাল থাকবে। তা বাবা তোমার বন্ধুর বাবা, ইয়ে আমাদের জামাই বাবাজী হয়ত একটা কথা তোমায় বলতে ভুলে গেছেন। ইয়ে, বলছি কি তোমার ভূতের ভয় নেই ত?"

"ভূতের ভয়?" ছেলেটি বড় বড় চোখে কেয়ারটেকারের দিকে তাকাল। "কিন্তু আমার বাবার বন্ধু ত একথা আমায় আগে বলেন নি। কেন এখানে ভূত আছে নাকি।"

"আছে বইকি," কেয়ারটেকার ড্রইংরুমের দেয়ালে টাঙ্গানো একটি বিশাল তৈলচিত্র ইশারায় দেখাল, "ঐ যে ছবিতে তিনটি মেয়েকে দেখছ ওরা তিন বোন, ওদের বাবা স্যার হেনরি বহু দিন ছিলেন এই প্রাসাদের মালিক। ঐ তিন বোনের মধ্যে ডানদিকে সব শেষে যাকে দেখছ তারই নাম অ্যান, যার খুলি এই প্রাসাদে বহুকাল ধরে রক্ষিত আছে। তিন বোনের কেউই এখন আর বেঁচে নেই।"

"তা এর মধ্যে ভূত কোথায়?"

"আছে হে আছে," কেয়ারটেকার বলল, "রাতের বেলা খেয়েদেয়ে ঘুমোচ্ছ আচমকা করিডোরে কারও জুতোয় আওয়াজে হয়ত ঘুম ভেঙ্গে গেল। বাইরে এলে হয়ত দেখবে রাণী প্রথম এলিজাবেথের আমলের পোষাক পরে কোনও মেয়ে করিডোরে আপনমনে হাঁটছে। তোমার দেখে হয়ত লজ্জা পেয়ে ঢুকে পড়বে ঐ ছবিতে।"

"ঐ ছবিতে! তার মানে! আপনি বলতে চান যাদের ছবি দেওয়ালে ঝুলছে তাঁরা রোজ রাতে করিডোরে হেঁটে বেড়ান?"

"সবাই নন", কেয়ারটেকার বলল, "মাত্র একজন, অ্যান গ্রিফিথ। আমাদের অ্যান দিদিমণি। স্যার গ্রিফিথ মারা যাবার পরে এই প্রাসাদ নতুন করে যখন গড়া হল তখন অ্যান দিদিমণি দাঁড়িয়ে থেকে সবদিকে নজর রাখতেন।" আমার বাবা ছিলেন এই প্রাসাদের খাস আর্দালি। প্রাসাদ নতুন করে গড়ার সময় বাবার সঙ্গে রোজ আমি আসতাম। অ্যান দিদিমণিকে তখনই খুব কাছ থেকে দেখেছি।"

"তুমি ওঁকে ছবির ভেতর ঢুকতে দ্যাখো রোজ?"

"দেখি বলেই ত এখনও টিকে আছি বাপু, নয়ত কবে পাগল হয়ে যেতাম।"

"যাও! যাও! যত্ত সব গাঁজাখরি গালগল্প! আমি ভূত কখনও দেখিনি আর ভূতে বিশ্বাসও করি না। তুমি আমায় আমার ঘর দেখিয়ে দাও!" ছেলেটি প্রায় ধমকে উঠল।

কেয়ারটেকার কথা না বাড়িয়ে করিডোরের শেষপ্রান্তে গেষ্টরুমে তার থাকার জায়গা করে দিল। সারাদিন প্রাসাদের আশেপাশে ঘুরে বেড়াল ছেলেটি। বাগানে মরশুমি ফুলের ফোটো তুলল। সন্ধের কিছু পরে ডিনার খেয়ে রাত-পোষাক চাপিয়ে ঘরে ঢুকল। কেয়ারটেকার ডিনারের শেষে বলে দিয়েছিল আমার ঘর করিডোরের মাঝখানে। তোমার ঘরের তিনটে ঘর পরেই, রাতে দরকার হলে আমায় ডেকো।"

"ধন্যবাদ", ঠোঁট উল্টে অবজ্ঞার হাসি হেসে সে বলেছিল, "তার দরকার হবে না।"

শেষ পর্যন্ত কেয়ারটেকারের কথা যে সত্যি হয়ে দেখা দেবে তা ছেলেটি আশা করে নি। মাঝরাত থেকে সেই যে করিডোরে উঁচু হিল তোলা জুতো পায়ে পায়চারির আওয়াজ শুরু হল তা আর থামতেই চায় না। ব্যাপার কি দেখার জন্য ছেলেটি মোমবাতি জ্বালিয়ে যতবার বাইরে বেরিয়ে আসে ততবার কে যেন ঘাড়ের পেছন থেকে ফুঁ দিয়ে তা নিভিয়ে দেয়। শেষরাতে আরেকবার ঘর থেকে মোমবাতি না জ্বালিয়েই বেরোল ছেলেটি। দেখল করিডোরে এক যুবতী আপনমনে পায়চারি করছে। তার জুতোর আওয়াজ হচ্ছে খট্ খট্। মেয়েটির পরণে প্রাচীন কালের পোষাক। যে পোষাক রাণী প্রথম এলিজাবেথের আমলে ইংল্যাণ্ডের মেয়েরা পরত। মেয়েটি অনেকক্ষণ আপনমনে পায়চারি করল। তারপর আচমকা মিলিয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। কৌতুহলী ছেলেটি কেয়ারটেকারকে ডেকে ঘর থেকে বের করে আনল, ড্রইং-রুমে ঢুকে দেয়ালে টাঙ্গানো গ্রিফিথ পরিবারের তিন বোনের তৈল চিত্রে ডানদিকে দাঁড়ানো মেয়েটিকে দেখিয়ে বলল, "আমি কাল রাতে এঁকে করিডোরে পায়চারি করতে দেখেছি। উনি খানিক আগে আচমকা উধাও হয়ে গেলেন।"

"তোমার অনেক সৌভাগ্য অ্যান দিদিমণির আত্মাকে নিজের চোখে দেখেছো।" কেয়ারটেকার বলল," দিদিমণি আমার কোথাও যাননি তিনি আছেন এখানেই এই প্রাসাদের ইঁট পাথর, চূণবালি, সুড়কি ও প্রতিটি ধুলিকণার মধ্যে তিনি আছেন।

যতদিন দাঁড়িয়ে থাকবে ততদিন উনি এর মধ্যে বিরাজ করবেন। ছেলেটি আর কথা বাড়াল না। সকালবেলা ব্রেকফাস্ট খেয়ে পরিদিনই লণ্ডনের ফিরে গেল সে।

ওয়ার্ডলি হলের খুলি ঃ রজার ডাউনি

তখন রাজা দ্বিতীয় চার্লসের আমল, চরম অরাজকতা চলছে লণ্ডনের রাজপথে। খুন জখম, রাহাজানি, লুঠতরাজ, দিনে দুপুরে প্রায়ই ঘটছে রাজধানীর বুকে পুলিশের চোখের সামনে। ব্যবসায়ীরা নগদ টাকাকড়ি নিয়ে চলাফেরা করতে পারে না। প্রয়োজনে নিশ্চিন্তে বাইরে পা রাখতে পারে না বাড়ির মেয়েরা।

অপরাধীদের মধ্যে আছে কিছু কমবয়সী ছেলে ছোকরাও। সবে গোঁফদাড়ি গজানো এইসব যুবকেরা বেশির ভাগই ভাড়াটে যোদ্ধা নয়ত ক্ষমতাবান রাজপুরুষের ছেলে নয়ত ভাইপো। এদের অপরাধের ধরণটা একটু আলাদা। তাহল বয়স্ক অথর্ব অসহায় মানুষদের নিয়ে নৃশংস রসিকতা। ঐরকম কাউকে চোখে পড়লেই তারা এগিয়ে এসে গায়ে পড়ে কোনও ছুতোয় ঝগড়া বাধায়। সে রুখে দাঁড়ালেই তাদের চেহারা যায় পাল্টে। আচমকা কোমরে ঝোলানো খাপ থেকে তলোযার বের করে ঝাঁপিয়ে পড়ে, বেচারা কিছু বুঝে ওঠার আগেই তলোয়ারের ধারালো ফলাব কোপে তাব নাক কান কেটে নেয় কচ কচ করে। পুলিশ দূরে দাঁড়িয়ে দেখে আর নাক চুলকোয়। এক বেপরোয়া ছোকরা রজার ডাউনি, সমবয়সী একপাল ছেলে ছোকরা জুটিয়ে সে রীতিমত সন্ত্রাসের রাজত্ব গড়ে তুলেছিল লণ্ডন ব্রিজের ওপর। রজার আর তার দলের উৎপাতে সাধারণ মানুষেব লণ্ডন ব্রিজের ওপর দিয়ে চলাফেরা করাই প্রায় বন্ধ হবার জোগার হয়েছিল।

কিন্তু রজার ডাউনিরও জীবনের শেষদিন ঘনিয়ে এল। লণ্ডন পুলিশেরই এক করিতকর্মা কমবয়সী অফিসার এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় ঘোড়ার গাড়ি চেপে স্ত্রীকে নিয়ে ফিরছিল, সঙ্গে ছিল তার স্ত্রীর এক বয়স্ক আত্মীয়। লণ্ডন ব্রিজের মাঝামাঝি আসতেই রজার ডাউনি তার দলবল নিয়ে সেই ঘোড়ায় গাড়ির পথ রুখল ; তারপর দরজা খোলার জন্য জানালায় ঘা দিতে লাগল। গাড়ি চালাচ্ছিল সেই তরুণ পুলিশ অফিসার নিজেই। রজার ডাউনি আর তার দলের চ্যাঙ্গাদের উৎপাত যে অনেকদিন আগেই সহ্যের সীমা ছাড়িয়েছে তা তার অজানা ছিল না। কোনও কথা না বলে ব্রিজের একধারে গাড়ি রেখে চাবুক হাতে সে নেমে এল গাড়োয়ানের সিট থেকে। রজারকে সামনে দেখেই সে চাবুক হাঁকাল তার ওপর। অভাবিত পাল্টা আক্রমণ হজম করতে না পেরে রুখে দাঁড়াল রজার, তলোয়ার বের করে মুখোমুখি 'ডুয়েল' বা দ্বন্দ্বযুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানাল সেই গাড়োয়ানকে। গাড়োয়ানের পোষাক পরা পুলিশ অফিসারও ততক্ষণে খাপ থেকে তলোয়ার টেনে বের করেছে। প্রচণ্ড বিক্রমে সেও তলোয়ার উঁচিয়ে তেড়ে গেল দুশমনের দিকে।

'ঝন! ঝন! ঝনাৎ!' বারকয়েক দুটি ইস্পাতের ফলার ঠোকাঠুকি গাড়ির ভেতরে রসাভীত যাত্রীদের কানে এল, তারপরেই সেই তরুণ পুলিশ অফিসার লাফিয়ে উঠে তলোয়ার হাঁকালো দুশমনের কাঁধে, সেই আঘাতে রজার ডাইনির তাজা মাথাখানা ধড় থেকে আলাদা হয়ে ছিটকে পড়ল রাস্তার ধারের নর্দমার। সর্দার খতম হতেই রজারের চ্যালাদের মনোবল গেল ভেঙ্গে, তারা সরে গিয়ে গাড়ি যাবার পথ করে দিল। তরুণ অফিসারটি গাড়ি নিয়ে অনায়াসে চলে যেতে পারত কিন্তু কি মনে হতে নর্দমার পড়ে থাকা রজার ডাউনির কাটা মাথাখানা সে তুলে নিল, তার চ্যালাদের একজনকে চেপে ধরে জেনে নিল ঠিকানা, তারপর ফুটবলের মত এক লাথি মেরে মাথাটা তুলে নিল গাড়োয়ানের সিটের নিচে। রজারের চ্যালাদের সামনে তার কাটা মাথার ওপর বুটপরা পা তুলে দিয়ে সেই অফিসার বীরবিক্রমে গাড়ি চালিয়ে কুখ্যাত লণ্ডন ব্রিজ নিরাপদে পেরিয়ে গেল।

লণ্ডন ব্রিজ থেকে কিছুদূরে এক খামার বাড়িতে রজার ডাউনি তার মা আর বোনের সঙ্গে থাকত। ঐ ঘটনার পরদিন বেলার দিকে একখানা বড়সড় প্যাক করা বাক্স এক অচেনা লোকে নিয়ে এল। তাদের বাড়িতে বাক্সটি পৌঁছে দিয়েই লোকটি ঘোড়ায় চেপে চলে গেল। রজারের মা আর বড়বোন দেখল প্যাকটের গায়ে নাম ঠিকানা কিছুই লেখা নেই। কৌতূহল বশে প্যাকেট খুলতেই তার গা শিউরে উঠল, দেখল, ভেতরে ছোটভাই রজারের রক্তমাখা কাটামাথা। ততক্ষণে রজারের মাও এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে। গোল্লায় যাওয়া একমাত্র ছেলের কাটামাথা খানা বুকে চেপে মা আর বড় বোন বুকফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

মার পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও রজারের বড়বোন তার ভাইয়ের কাটা মাথা ধর্মীয় রীতি মেনে কবর দিল না। সিঁড়ির গোড়ায় দর্শনীয় বস্তুর মত তা বসিয়ে রাখল। ছেলে অপরাধের পথ বেছে নেবার ফলে এমনিতেই গোটা এলাকার মানুষের কাছে তারা ব্রাত্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কেউ পারতপক্ষে কথা বলত না তাদের সঙ্গে। রজারের মৃত্যু, আর তার মাথা বাড়ির সিঁড়ির গোড়ায় সাজিয়ে রাখার খবর ছড়িয়ে পড়তে দেরী হল না, যেসব প্রতিবেশী তাদের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করেছিল তারাই দলবেঁধে এল ঐ কাটামাথা দেখতে। ক'দিন বাদেই পচন ধরায় রজারের কাটা মাথা থেকে উৎকট দুর্গন্ধের দাপটে আশপাশের মানুষের টেকা দায় হয়ে উঠল। প্রতিবেশীরা গাড়ি করে এসে রজারের মা আর বড়বোনকে ঐ পচন ধরা কাটা মাথা কবর দেবার জন্য অনুরোধ করল, কিন্তু তারা সে কথায় কান দিল না। বাধ্য হয়েই তখন প্রতিবেশীরা দলবেঁধে হাজির হল স্থানীয় গির্জায়, সেখানকার পাদ্রিকে সব বলে প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করল। পাদ্রি সেদিনই এসে হাজির হলেন রজারদের বাড়িতে, নাকে রুমাল চেপে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে গিয়ে দেখেন সত্যিই সামনে সিঁড়ির মুখে একটা পচাগলা কাটামাথা বসানো দুর্গন্ধ সেখান থেকেই ছড়াচ্ছে। রজারের মা আর বোনকে ডেকে পাদ্রি এই বলে হুমকি দিলেন যে অবিলম্বে ঐ আপদ মাটিতে পুঁতে না ফেললে তিনি রাজার কাছে তাদের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে বাধ্য হবেন।

পাদ্রির হুমকিতে ভয় পেয়ে রজারের মা আর বোন ঐ কাটামাথা সেদিনই পুঁতে ফেলল তাদের বাগানে। সারা দিনে কিছুই হল না। কিন্তু সূর্য ডোবার পরেই শুরু হল প্রচণ্ড তুষার ঝড়, সেই ঝড়ে আশপাশের অনেক প্রতিবেশীর ক্ষেতের ফসলের দারুণ ক্ষতি হল, অনেকের

বাড়ির ছাদ গেল উড়ে। কানে তালা ধরানো প্রচণ্ড বাজপড়ার আওয়াজ শুনতে শুনতে রজার আর তার মা চাদরে গা মাথা ঢেকে কোনরকমে রাতটুকু কাটিয়ে দিল। একসময় ভোর হল। ঝড় থেমে সূর্য উঠল আকাশে, কুয়ো থেকে খাবার জল তুলতে রজারের মা আর বোন দু'জনেই নেমে এল খাট থেকে। ঘরের বাইরে বেরিয়ে দু'জনেরই চোখ ছানাবড়া, দু'জনেই দেখল রজারের কাটা মাথা আবার ফিরে এসেছে, আগের মতই সিঁড়ির মুখে তা বসানো। তফাতের মধ্যে সব মাংস আর চামড়া খসে এখন শুধু শুকনো সাদা খুলিটাই আছে খালি। চোখের কোটর দুটোর দিকে তাকাতে তাদের দু'জনেরই মনে হল খুলিটা তাদের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসছে। রজারের কাটা মাথা খুলি হয়ে ফিরে আসার খবর আবার ছড়াল চারপাশে। আবার সবাই দলবেঁধে এল তা দেখতে। পচাগলা মাংস সব খসে যাওয়ার দুর্গন্ধ আর নেই, তাই এ'নিয়ে আর কেউ নতুন করে অশান্তি বাধাল না। রজার ডাউনির খুলি স্বমহিমায় তার বাড়ির সিঁড়ির মুখে দিন কাটাতে লাগল, শুধু বিশেষ পর্বে বা বাড়িতে কেউ এলে তা সরিয়ে রাখা হত।

গুরুপাদ্রির খুলি

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংল্যাণ্ডের ল্যাংকাশায়ারে জন্মেছিলেন আলেকজান্ডার বার্লো। পরিণত বয়সে তিনি পাদ্রি হন। পোপের অনুশাসন নিষিদ্ধ হবার পরেও ইংল্যাণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় ক্যাথলিক ধর্মের ধারক যারা ছিল বার্লো ছিলেন তাদের শিরোমণি ও গুরুপাদ্রি। ফাদার অ্যামব্রস নামে তিনি নিজের পরিচয় দিতেন। ১৬৪১-এর মাঝামাঝি নাগাদ সরকারি আদেশে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং চার্চ অফ ইংল্যাণ্ডের অনুশাসন না মানার অপরাধে দেশদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় বিচারক তাঁকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং মৃত্যুর পরে তাঁর মাথা ধর থেকে কেটে নিয়ে ম্যাঞ্চেস্টারের পুরোনো গির্জায় টাঙ্গিয়ে রাখার আদেশ দেন। ফাদার অ্যামব্রসের বয়স তখন পঞ্চান্ন। হাসিমুখে তিনি প্রাণদণ্ডের আদেশ গ্রহণ করেন। প্রাণদণ্ড কার্যকর করার আগে জেলে দুজন পাদ্রি তাঁকে ধর্মকথা শোনাতে যান এবং বলেন চার্চ অফ ইংল্যাণ্ডের অনুশাসন আজীবন মেনে চলবেন একথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে রাজি হলে তাঁরা তাঁর প্রাণ বাঁচানোর জন্য রাজার কাজে আর্জি জানাবেন। ফাদার অ্যামব্রস শুনে বলেন মূর্খের দলে ভেড়ার মত থাকার থেকে, মাথা উঁচু করে জীবন দেয়া অনেক বেশি সম্মনজনক। তিনি তাই করবেন। শুনে দু'জন হতাশ হয়ে চলে যান। ফাদার অ্যামব্রস এরপর বাইবেল পড়ে নিশ্চিন্তমনে ঘুমোলেন। পরদিন ভোরবেলা বীরের মত বুক ফুলিয়ে এসে হাজির হলেন ফাঁসিগাছের কাছে, জীবনের শেষ মুহূর্তেও স্থির অবিচল রইলেন। প্রাণদণ্ড কার্যকর হবার পরে তলোয়ারের এক কোপে তাঁর মাথা আইন রক্ষকেরা কেটে নেয় এবং বিচারকের আদেশ অনুযায়ী ম্যানচেস্টারের পুরোনো গির্জার বুরুজে একটি বর্শার ফলায় গেঁথে টাঙ্গিয়ে রাখে। দু'একদিন বাদে প্রহরীদের নজর এড়িয়ে তাঁর এক স্নেহভাজন ভক্ত ঐ কাটামাথা বর্শা থেকে খুলে নেন। তারপর ওয়ার্ডলি হলে একটি ছোট টেবলের ওপর সাজিয়ে রাখেন। ভক্তটির অবর্তমানে যতবার ঐ খুলি সরিয়ে ফেলতে গেছে

ততবারই চাপা কান্নার আওয়াজ আর চাপা দীর্ঘশ্বাস ভেসে এসেছে খুলির ভেতর থেকে। সেসব অগ্রাহ্য করে ওয়ার্ডলি হলের বাসিন্দারা ঐ খুলি পুঁতে ফেলার উদ্দেশ্যে দু একবার টেবিল থেকে সরিয়েছে ; কিন্তু সে কাজে যতবার তারা হাত লাগিয়েছে ততবারই হয় প্রচণ্ড সামুদ্রিক ঝড় নয়ত ভূমিকম্পের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছে। গোয়ালের সব ক'টি গোরুর বাঁট রাতারাতি গেছে শুকিয়ে, পঙ্গপালের ঝাঁক উড়ে এসে উজাড় করে দিয়েছে ক্ষেতের ফসল। এইসব ব্যাখ্যার অতীত ঘটনা চোখের সামনে ঘটতে দেখে ওয়ার্ডলি হলের বাসিন্দারা ঘাবড়ে গেছে। গুরু পাদ্রি ফাদার অ্যামব্রসের খুলিকে আর না ঘাঁটিয়ে শেষ পর্যন্ত রেখে দিয়েছে তার নিজের জায়গাতেই।

ওয়ার্ডলি হলের খুলি

ক্রীতদাসের কাঁদুনে খুলি

সরিয়ে ফেলতে গেলেই কেঁদেকেটে চেঁচামেচি জুড়ে দেয়। এমন আরেকটি ভৌতিক খুলির প্রসঙ্গ কথায় আসছি। চেঁচামেচির বৈশিষ্ট্য অর্জন করার ফলে যেখানে তা রাখা আছে সেই একদা রান্টি অ্যানের খামার বাড়ির নামই স্থানীয় লোকের মুখে মুখে হয়ে দাঁড়িয়েছে 'চিল্লানো খুলির বাড়ি' বা 'কাঁদুনে খুলির বাড়ি'।

ইংল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক শোভায় অনেকটাই যে সেখানকার দক্ষিণে অবস্থিত পল্লী অঞ্চল বা পাড়াগাঁয়ের আকাশে বাতাসে ছড়ানো রয়েছে বাইরের মানুষের কাছে আজও তা অজানা। একই কারণে পর্যটকদের ভিড়ও আজও এখানে তেমন চোখে পড়ে না। ডরসেন্টশায়ার ও লাইম-রেজির মাঝামাঝি অবস্থিত বেটিসকম্ব খামার বাড়ির আশে পাশেই অতীতে দাঁড়িয়েছিল রান্টি অ্যানের প্রাসাদ। ভাঙ্গা চোরা দু একটি ফটক ছাড়া সেই প্রাসাদের বাকি সবটুকুই আজ কালের করাল গ্রাসের কবলে অবলুপ্ত। খামার বাড়ির গায়েই ছিল প্রাসাদের গির্জা। প্রাকৃতিক বিপর্যয় আর দেখাশোনার অভাবে তাও কবে ভেঙ্গে চুড়ে গেছে। তবে গির্জাটি হালে আবাব নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছে।

ফেরা যাক খুলি প্রসঙ্গে। রান্টি অ্যানের শাসনকালে বেটিসকম্ব খামারবাড়ি ছিল ব্রডউইনসবের পাদ্রি রেভারেণ্ড জন পিনির ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

পাদ্রি জন পিনির মৃত্যুর পরে ১৬৮৫ তে মনমাউথের ডিউক রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। পাদ্রির দুই ছেলে জন ও অ্যাজারিয়া তাতে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। প্রশাসনের সময়োপযোগী হস্তক্ষেপে বিদ্রোহের আগুণ জ্বলে উঠেই নিভে যায়। সংশ্লিষ্ট হঠকারীরাও সবাই ধরা পড়ে কঠিন সাজা পায়। জন আর অ্যাজারিয়া, দু'টি ভাই-ই ছিল এদের দলে। বিচারে জনের হয় প্রাণদণ্ড। আর অ্যাজারিয়ার হয় নির্বাসন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তখন ব্রিটিশ উপনিবেশ, সেখানকার ক্ষেতখামারে কাজ করার জন্য তখন প্রচুর ক্রীতদাস দরকার হয়ে পড়েছিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের স্থানীয় নিগ্রো বাসিন্দাদের দিয়ে যে প্রয়োজন মিটছিল না। সেই প্রয়োজন মেটাতেই নির্বাসিত বিদ্রোহীদের ক্রীতদাস হিসেবে পাঠানো হল ওয়েস্ট ইণ্ডিজে। এই নির্বাসিতদের দলে ছিল অ্যাজারিয়া পিনি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে পৌছানোর পরে লেভিস দ্বীপে অ্যাজারিয়াকে কয়েকটা বছর ক্রীতদাসের হীন জীবন কাটাতে হয়। পরে তার ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে। অগাধ টাকাকড়ির মালিক হয়ে সে চৌত্রিশ বছর পরে ১৭১৯ নাগাদ ফিরে আসে ইংল্যাণ্ডে, দেশে ফিরে আসার অল্প কিছুদিন বাদেই মারা যায় অ্যাজারিয়া পিনি। অ্যাজারিয়ার নাতি জেমসের ছিল এক কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস, নাম ছিল তার বেটিসকম্ব। মনিবের সঙ্গে তখনকার রীতি অনুযায়ী পোষা কুকুরের মত শেকল বাঁধা অবস্থায় ইংল্যাণ্ডে আসার কিছুদিন পরেই অসুখে পড়ে বেটিসকম্ব, সেখানকার জলহাওয়া তার সহ্য হয়নি। মারা যাবার আগে প্রভু জেমসের কাছে শেষ নিবেদন জানিয়েছিল ক্রীতদাস বেটিসকম্ব যাতে মৃত্যুর পরে তার মৃতদেহ তিনি ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাটিতে কবর দেন। মুখে আশ্বাস দিলেও বেটিসকম্ব মারা যাবার পরে জেমস পিনি তার কথা রাখেনি। ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী কবর না দিয়ে কাজের লোকেদের দিয়ে বাড়ি থেকে কিছু দূরে এক ভাগাড়ে মাটি খুঁড়ে

হতভাগ্য বেটিসকম্বের মৃতদেহ তাতে ফেলে মাটি চাপা দিয়ে নিশ্চিন্তে হয়েছিল। কিন্তু প্রভু কথা দিয়েও না রাখার শাস্তি পায়নি বেটিসকম্বের বিদেহী প্রেতাত্মা। শোনা যায় তার মৃতদেহ ভাগাড়ে পুঁতে ফেলার পরেই শুরু হয়েছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয়। ভূমিকম্প ছাড়াই জেমস পিনির পৈতৃক বাড়ি থেকে থেকে কেঁপে উঠতে লাগল। সবকটা ক্ষেতের ফসল রাতারাতি গেল শুকিয়ে। সকালে ফসলের গোলা খোলার পরে দেখা গেল ভেতরে একদানাও নেই। মেঠো ইঁদুরের পাল মাটি খুঁড়ে কখন গোলায় ঢুকে মজুত ফসল সব খেয়ে শেষ করেছে বাড়ির কাজের লোকেরা কেউ টেরও পায়নি।

প্রভুর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বদলা নিতে বেটিসকম্বের ভূত এখানেই থামল না। যে ভাগাড়ে তার মৃতদেহ পুঁতে ফেলা হয়েছিল সেখানে বসে এমন চেঁচিয়ে নাকি কান্না জুড়ে দিল যা শুনে তার প্রভু জেমসের নাড়ি ছেড়ে যায় আর কি! কাজকর্ম, খাওয়া, ঘুম, জেমসের সব গেল ঘুঁচে। দিনরাত শুধু একা বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর সময় থাকতে কেন বেটিসকম্বের মৃতদেহ তার দেশে ফেরত পাঠালনা তাই ভেবে আপন মনে বিড়বিড় করে। কিন্তু প্রভুর ঐ দশা দেখেও বেটিসকম্বের ভূতের মন আদৌ নরম হলনা। তার অত্যাচার দিনে দিনে বাড়তে লাগল। চেঁচিয়ে নাকি সুরে প্যানপ্যান করে কেঁদে বাড়ি মাথায় করে তুলতে লাগল সে। রেগেমেগে একদিন জেমস পিনি যাদের দিয়ে বেটিসকম্বের মৃতদেহ মাটিতে পুঁতেছিল তাদের ডাকিয়ে আনল তারপর ভাগাড়ের মাটি খুঁড়ে ক্রীতদাস বেটিসকম্বের মৃতদেহের মাথাটা ধড় থেকে কেটে আনার হুকুম দিল।

হুকুম তামিল হল সেদিন। বেটিসকম্বের খুলিতে তখন মাংস বা চামড়া কিছুই লেগে নেই। সব পচে গলে কবে ঝরে গেছে। নিগ্রো ক্রীতদাসের সেই শুকনো খুলিটাই বসার ঘরে সাজিয়ে রাখল জেমস। সেই থেকে আজও তা একইভাবে রয়েছে। খুলিখানা ওখানে নিয়ে আসার পর থেকে ভৌতিক অত্যাচার গেছে বন্ধ হয়ে এখন খুলিখানা জেমসের বসার ঘর থেকেকেউ সরাতে গেলেই তা চেঁচামেচি আর কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। সেই থেকে ঐ খুলির নাম হয়েছে ক্রীতদাসের কাঁদুনে খুলি ; যেখানে আছে জেমস পিনির খুলি সেই বাড়ির নাম হয়েছে 'কাঁদুনে খুলির বাড়ি।' ১৯১৪ সালে খুলির ভেতর থেকে কোনও অজ্ঞাত কারণে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত গড়িয়ে পড়তে অনেকেই দেখেছে। যদিও এর সঙ্গে আগে বা পরের কোনও ঘটনার যোগসূত্র কেউ খুঁজে পায়নি।

ফরাসি সাংবাদিক মঁশিয়ে এজে পুয়ের কাছেও ছিল বহুদিনের পুরোনো একটি খুলি। মঁশিয়ে পুয়ের এজে বলতেন সপ্তদশ শতাব্দীতে ফার্দিনান্দ নামে এক বীর যুদ্ধে প্রাণ দেন। ঐ খুলি তাঁরই, কিভাবে সেই বীর পুরুষের খুলি মঁশিয়ে পুয়ের হাতে এসেছিল তা জানা না গেলেও অনেকেই লক্ষ্য করেছেন ফার্দিনান্দ নামে যোদ্ধার ঐ খুলির এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য—নিজের খেয়াল খুশিমত তা একেকসময় চেঁচামেচি জুড়ে দিত। আর তার কিছুদিন বাদেই মঁশিয়ে পুয়ের পরিবারের কারও না কারও মৃত্যু ঘটত। কাকতালীয় মনে হলেও এ-ঘটনা প্রতিবার ঘটত তা তিনি লক্ষ করেছেন। ১৯৭১ সালে শেষবার মঁশিয়ে পুয়ের খুলি চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দিল। সেই সঙ্গে বুকফাটা কান্নার মত আর্তনাদ বেরিয়ে আসতে লাগল তার ভেতর থেকে ; এর কিছুদিন বাদেই মারা গেলেন মঁশিয়ে পুয়ের স্বয়ং। তাঁর শিয়রে মরা এসে দাঁড়িয়েছে টের পেয়েই তাঁর পোষা খুলি তাঁকে সতর্ক করতে চেঁচামেচি করছে এবং তাতে ফল হবে না জেনে কাঁদছে তা তিনি বুঝতে পারেন নি।

দুই দুশমনের খুলি

ইংল্যাণ্ডে সাসেক্সের পল্লী অঞ্চলের এক ছোট গ্রাম রাশলেক গ্রিন। বহুকাল আগে সেই গ্রামে ঘন গাছপালায় ছায়ায় গড়ে উঠেছিল ওয়ারবলটন প্রায়রি নামে একটি মঠ। শহর থেকে জায়গাটা ছিল বহু দূরে, ঘোড়ায় টানা গাড়ি চেপে গ্রামের কাদা প্যাচপেচে পথ উজিয়ে অনেক ঝোপঝাড় ভেঙ্গে তবে সেখানে পৌঁছোতে হত। সম্ভবত যোগাযোগের অসুবিধা আর নিয়মিত যত্নের অভাবে সে মঠ বিলীন হয়েছিল কালের করাল গর্ভে, স্থানীয় ভূস্বামি সেই মঠের ধ্বংসস্তূপের ওপর তৈরি করেছিলেন এক খামার বাড়ি। কিন্তু খামার বাড়ি তৈরি করলেও তা বেশিদিন সেই ভূস্বামি ভোগ করতে পারেন নি। খামার বাড়ি তৈরি হবার কিছুদিনের ভেতর জমি জমা সংক্রান্ত বিবাদের জেরে স্থানীয় এক প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে তিনি খুন হন। ভূস্বামির আততায়ীও প্রাণে বাঁচেনি, হিংস্র শ্বাপদের হাতে তাকে প্রাণ দিতে হয়। মজার ব্যাপার হল, ভূস্বামির ছেলে তার বাবা আর তাঁর আততায়ী দু'জনেরই খুলি জোগাড় করেছিল। ঐ খামার বাড়ির একতলা আর দোতলায় খুলি দুটি সাজিয়ে রেখেছিল সে।

খুলি দু'টি একসঙ্গে না রাখার পেছনে যে কাহিনী আছে তার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নাতীত না হলেও কৌতূহলের খোরাক তার মধ্যে আছে। সে কাহিনী এরকম ঃ

ভূস্বামির ছেলে তার বাপের খুলির পাশে যতবার তার খুনির মাথার খুলি রেখেছে ততবারই বেধেছে ঝামেলা। খুলি দু'টির ভেতর থেকে ভেসে আসা চিৎকার চেঁচামেচিতে খামার বাড়ি সমেত আশপাশের প্রতিবেশীদের কান ঝালাপালা হয়েছে। বেঁচে থাকতে যারা ছিলেন একে অপরের প্রচণ্ড দুশমণ, মরে যাবার পরে সেই দুশমণি যে একতিলও কমে নি তারই প্রমাণ ঐ খুলিদুটোর চেঁচামেচি। ফায়ারপ্লেসের ওপর খুলি দুটো বসানো থাকত, মাঝখানে থাকত কম করে দেড় দু'হাতের দূরত্ব। কিন্তু কোন যাদুমন্ত্রবলে কে জানে, রোজ রাতে দেখা যেত সেই দূরত্ব ঘুচে গেছে, দুটো খুলি যেন ঘষটে ঘষটে একে অপরের খুব কাছে চলে এসেছে। গোড়ায় এই ব্যাপারটায় ভূস্বামির ছেলে তেমন গুরুত্ব দেয় নি, বরং দুটোখুলির ঝগড়া দেখে সে মজা পেত। কিন্তু এইভাবে চলতে চলতে একদিন ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা—এক তলায় বসার ঘর তালা বন্ধ করে বাড়ির সবাই কোন কারণে দোতলায় উঠেছিল। খানিকবাদে একতলায় বসার ঘরে ঠক ঠক শব্দ শুনে সবার নজর সেদিকে আকৃষ্ট হল। আরও কিছুক্ষণ পরে কোনও জিনিস জোরে মেঝেতে আছড়ে পড়ার আওয়াজ হলে কাজের লোকেরা নিচে নেমে এল, তালা খুলে বসার ঘরে ঢুকে তারা দেখল তাদের নিহত ভূস্বামির খুলি পড়ে আছে মেঝেতে, আর তাঁর খুনির খুলিখানা মাথা উঁচু করা ভঙ্গিতে বসানো আছে ফায়ার প্লেসের ওপরে। মেঝে থেকে মনিবের খুলিটা কুড়িয়ে নিয়ে কাজের লোকটি দেখে তার অনেকগুলো দাঁত গেছে ভেঙ্গে। সেই মুহূর্তে বসার ঘরের কোণে দাঁড় করিয়ে রাখা সাবেক আমলের গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লকের দিকে কাজের লোকটির চোখ পড়ে। অবাক হয়ে সে দেখে বেলা তিনটে বেজে ঘড়ি থেমে গেছে। তার পেণ্ডুলামের দুলুনি গেছে বন্ধ হয়ে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ল দু'বছর আগে ত ঐ তারিখেই তার মনিব খুন হয়েছিলেন আততায়ীর হাতে, সেদিনও তিনটে বেজে ঐ ঘড়ি বন্ধ

হয়ে গিয়েছিল। পুরোনো মনিবের খুলি হাতে নিয়ে কাজের লোকটি তখনই ছুটে এল ওপরে। তার মুখ থেকে ঘটনার বিবরণ শুনে ভূস্বামির ছেলে চমকে গেল, সেই মুহূর্তে সে বুঝল পরপারে পৌঁছোনোর পরেও তার বাবা আর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর পুরোনো শত্রুতা কমে নি বরং আগের চেয়ে জোরালো হয়ে উঠেছে। খুলি দুটো আলাদা রাখার সিদ্ধান্ত নিল নিহত ভূস্বামির সেই ছেলে। বাপের খুলি সাজিয়ে রাখল সে দোতলার শোবার ঘরে তাঁর তৈলচিত্রের ঠিক নিচে। না, এরপরে আর খুলি দুটোর মধ্যে কোনও রেষারেষির ঘটনার কথা শোনা যায় নি। আলাদা করে দেবার ফলে তাদের চেঁচামেচিও আর কারও কানে যায় নি। তবে খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয়।

সত্যি ভূতের জমাটি গল্পের খোঁজে যারা দেশবিদেশের পাড়াগাঁয়ে যখন তখন হানা দেন, তাঁদের নিরাশ করতে কোনও ঘোর বেরসিক বছর তিনেক আগে ঐ সময় বাড়ি থেকে নিহত ভূস্বামি আর তাঁর আততায়ীর খুলি দুটো চুরি করেছে। আজ পর্যন্ত তাদের হদিশ মেলেনি।

অতৃপ্ত আত্মার উপদ্রবের কাহিনী

কাম্বারল্যাণ্ডের জমিদার স্যার হেনরি ভেইনের বিধবা স্ত্রী লেডি ভেইন মারা যান ১৯১৬ সালে। অতৃপ্ত আত্মার উপদ্রব এবং তা প্রশমনের একটি ঘটনা বেঁচে থাকতে তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করেন এবং নিজের ডায়েরিতে তার বিস্তারিত বিবরণ লিখে রাখেন। ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করা হল।

কাম্বারল্যাণ্ডের প্রাসাদবাড়ির শোবারঘরে রোজ বেশি রাতের দিকে অদ্ভুত আওয়াজ হত। স্যার হেনরি ভেইন আর তাঁর স্ত্রী লেডি ভেইন দু'জনেরই ঘুম সেই আওয়াজে ভেঙ্গে যেত। আওয়াজটা আসত শোবার ঘরের একদিক থেকে, শুনে মনে হত কেউ দেয়ালের ভেতর দিয়ে ছাদে ওঠার চেষ্টা করছে আর বারবার পা হড়কে পড়ে যাচ্ছে। অনেক চেষ্টা করেও , আওয়াজের উৎস খুঁজে পান নি তাঁরা। এক সময় স্যার ভেন্টন নিজে হাল ছেড়ে দিলেন কিন্তু তাঁর স্ত্রী দমলেন না। তিনি সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন।

সুযোগ একদিন এসে গেল হাতের মুঠোয়। জমিদারি দেখাশোনার কাজে স্যার ভেইন ক'দিনের জন্য বাইরে গেলেন। এই ফাঁকে লেডি ভেইন শোবার ঘরের যেদিক থেকে আওয়াজ ভেসে আসত সেদিকের দেয়াল রাজমিস্ত্রিদের দিয়ে ভাঙ্গলেন। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন দেয়ালের ভেতর সিঁড়ির ধাপের মত পা রাখার খোপ পর পর উঠে গেছে ওপরে ছাদের দিকে। সেখানে হাতড়ে তিনি একখণ্ড পুরোনো বাইবেল, একটা খালি মদের বোতল আর কিছু হাড়গোড় খুঁজে পেলেন। স্বামিকে দেখাবেন বলে সেসব একটা বাক্সে ভরে ভাঙ্গা দেয়াল তিনি আবার জুড়ে দিলেন। স্যার ভেইন বাড়ি ফিরে এলে লেডি ভেইন তাঁকে সব খুলে বলেন এবং বাক্সের ভেতরে যা কিছু ছিল সব দেখান। সে রাতে দেয়ালের যে অংশ ভাঙ্গা হয়েছিল সেখানে আবার অদ্ভুত আওয়াজ শুরু হল। ঐ আওয়াজে স্যার হেনরি ভেইনের ঘুম ভেঙ্গে যায়। চোখ. মেলে সেদিকে তাকাতে তিনি চমকে ওঠেন—দেখেন প্রাচীনকালের পোষাক পরা এক রূপসী যুবতী দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, এক দৃষ্টে সে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সেই রহস্যময় মূর্তি বাতাসে মিলিয়ে গেল। নিজের চোখে ঐ রূপসীর বিদেহী মূর্তি দেখে স্যার হেনরি তার পরিচয় জানতে খুব কৌতূহলী হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত পুরোনো কাগজপত্র ঘেঁটে তিনি জানতে পারেন তাঁরই এক অত্যাচারী পূর্বপুরুষ স্থানীয় এক ভদ্রঘরের রূপসী যুবতীকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। মেয়েটিকে ভোগ করে তিনি খুন করেন। তারপর বাড়ির শোবার ঘরের দেয়াল খুঁড়ে তার মৃতদেহ ভেতরে ঢুকিয়ে ভাঙ্গা দেয়াল জুড়ে দেন। দেয়ালের ভেতর থেকে লেডি ভেইন যে হাড়গোড় পেয়েছিলেন সেগুলো যে সেই হতভাগিনীরই মৃতদেহের তাতে স্যার হেনরির সন্দেহ রইল না। তিনি এরপর সেই হাড়গোড় ধর্মীয় রীতি মেনে কবর দেন। এরপরে সেই ঘরে আর কোনও আওয়াজ বা ভৌতিক উপদ্রব হয় নি।

অভিশপ্ত পানপাত্র

গ্লামিস নামটি মহাকবি শেক্সপিয়ারের মনগড়া নয়, স্কটল্যাণ্ডে ফরফারশায়ারে গ্লামিস ক্যাসল নামে সত্যিই একটি প্রাচীন প্রাসাদ আছে। গ্লামিস ক্যাসলেই মহাবীর ম্যাকবেথ উচ্চাশাতাড়িত স্ত্রীর প্রেরণায় অতিথি রাজা ডানকানকে ঘুমন্ত অবস্থায় বধ করেছিলেন। ১৩৭১ খ্রীষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় রবার্ট তাঁর জামাই স্যার জন লিয়নকে গ্লামিস ক্যাসল উপহার দেন। রাজকন্যাকে বিয়ে করে স্যার জন লিয়ন পাকাপাকিভাবে ঐ প্রাসাদে থাকতে শুরু করেন। উত্তরাধিকার সূত্রে স্যার লিয়ন একটি দামি পানপাত্র পেয়েছিলেন যার সঙ্গে জড়িত ছিল বহু পুরোনো অভিশাপ—ঐ পানপাত্র যার অধিকার থাকবে বংশধরদের ঘটবে অকাল মৃত্যু।

অভিশপ্ত পানপাত্রের অধিকারী হওয়া সত্বেও স্যার জন লিয়নের ছেলে আর নাতি অর্থাৎ পরবর্তী দু'পুরুষের মৃত্যু ঘটেছিল আর পাঁচজন স্বাভাবিক মানুষের মতই, এমনকি তাঁর নাতি ১৪৪৫ খ্রীষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডের রাজার কাছ থেকে লর্ড গ্লামিস খেতাবও অর্জন করেছিলেন। তাঁর পরবর্তী বংশধরদের অন্যতম ষষ্ঠ লর্ড গ্লামিসের বিধবা স্ত্রী জ্যানেট ছিলেন অপরূপ সুন্দরী, ক্ষমতাশালী কিছু পুরুষকে রূপ যৌবন দিয়ে তুষ্ট না করায় তাঁদের কোপদৃষ্টি পড়ল তাঁর ওপর। লেডি গ্লামিস ডাকিণী-বিদ্যায় পারদর্শী, রাজা পঞ্চম জেমসের প্রাণনাশ করতে তিনি গোপনে নানারকম তুকতাক করছেন এই অভিযোগে তাঁরা তাঁকে গ্রেপ্তার করে রাজদরবারে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন। তখনকার ইওরোপে ডাইনি খুঁজে বের করার কি হিড়িক লেগেছিল তা সবারই জানা। ক্ষমতাশালী রাজপুরুষের নর্ম সহচরী হতে নারাজ হলেই রূপবতী হত ডাইনী, প্রতিভাধর বিজ্ঞানী রাত জেগে গবেষণা করলে সেও হত ডাইনী। সবার বেলায় ছিল একই শাস্তির বিধান তাহল প্রকাশ্যে হাত পা বেঁধে পোড়ানো। লেডি গ্লামিসও এই সাজা থেকে রেহাই পেলেন না। ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এডিনবরায় ক্যাসল হিলে তাঁকে জ্যান্ত পোড়ানো হল। তাঁর একমাত্র ছেলের বয়স তখন সাত কিন্তু ক্ষমতাশালী রাজপুরুষেরা বয়সের কথা বিবেচনা না করে তাকেও ধরে নিয়ে গিয়ে ঠুকে দিলেন তুড়ুম কলে, ক্রমাগত যন্ত্রণা দিয়ে ঐটুকু বাচ্চাকে দিয়ে তাঁরা বলালেন যে তার মা ছিল ডাইনী তার একাজে সেও তার মাকে সাহায্য করত।

তুকতাক করে রাজার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রের অন্যতম চক্রী হিসেবে রাজপুরুষেরা তাকেও তার মার মতই পুড়িয়ে মারতে তৈরি ছিলেন। কিন্তু বরাত জোড়ে ছেলেটি তখনকার মত বেঁচে গেল। রাজ দরবারের পাদ্রি ঘোষণা করলেন যতদিন লেডি গ্লামিসের ছেলে সাবালক না হয় ততদিন পর্যন্ত তার প্রাণদণ্ড তোলা থাকুক। পাদ্রির অনুগ্রহেই লেডি গ্লামিসের সাত বছরের শিশুপুত্রের প্রাণ বেঁচে গেল। সে পৈতৃক প্রাসাদে কাজের লোকেদের যত্নে বড় হতে লাগল। কিন্তু তার কপাল ছিল ভাল তাই সাবালক হবার পরে স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসনে নতুন রাজা বসলেন, তিনি তুকতাক আর ডাকিনি বিদ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন না তাই লেডি গ্লামিসের ছেলের অপরাধ মুকুব করলেন এবং সপ্তম লর্ড গ্লামিস খেতাবে তাকে ভূষিত করলেন। কিন্তু নিজে বাঁচলেও একমাত্র পুত্র অষ্টম লর্ড গ্লামিসের বেলায় বংশের পুরোনো অভিশাপ আবার ছোবল

হানল। লিগুসে রাজবংশের সঙ্গে তাঁদের পুরোনো শত্রুতার কথা স্কটল্যাণ্ডের কারও অজানা ছিল না। ঐ বংশেরই এক যুবকের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে তিনি প্রাণ হারান। এই ভাবে পুরোনো অভিশাপ কার্যত ফলে গিয়েছিল। গ্লামিস বংশধরদের অনেকেরই ঘটেছিল অকালমৃত্যু। যতদূর জানা যায় তাঁর অকালমৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই গ্লামিস বংশের ঘটেছিল অবসান। পরবর্তীকালে গ্লামিস ক্যাসলের অধিকারী হন আর্ল অফ স্ট্র্যাথমোর গ্লামিস কাসলের যাবতীয় সম্পত্তির সঙ্গে অভিশপ্ত পানপাত্রটিও আসে তাঁর অধিকারে। তার ফলে অভিশাপ নেমে আসে তাঁর বংশধরদের ওপর। পরবর্তী তিন চারজন পুরুষ যুদ্ধে নয়ত দ্বন্দ্বযুদ্ধে অকালে প্রাণ দেবার পরে প্রাসাদের মালিক হন ষষ্ঠ লর্ড স্ট্র্যাথমোর। তাঁর পৈতৃক নাম ছিল চার্লস। এঁর বেলায় বংশের পুরোনো অভিশাপের গতি অন্যপথে মোড় নিল। এতদিন পর্যন্ত গ্লামিস ক্যাসল-এর অধিকারীরা প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অকালে প্রাণ হারিয়েছেন। কিন্তু প্রাসাদের মালিকানা এবার যার হাতে গেল তিনি সে ধারও মাড়ালেন না. সংক্রামক বীজানুর মতই তাঁর মাথায় চাপল জুয়োর নেশা। ক্ষমতায় প্রতিদ্বন্দ্বী যেসব জমিদার বংশের সঙ্গে ছিল বহুদিনের শত্রুতা, পথেঘাটে যাদের সঙ্গে কখনও দেখা হলে বাপ ঠাকুর্দা খাপ থেকে তলোয়ার বের করতেন, চার্লস তাদের সঙ্গে মিতালি পাতালেন। চুটিয়ে মদ খাওয়া সুন্দরী যুবতীদের পিছু ধাওয়া করা। চড়া বাজি ধরে জুয়ো খেলা, ইত্যাদি সবরকম অপকর্মে তিনি পুরোনো দুশমনদের অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত কাছে টানতে লাগলেন। স্কটল্যাণ্ডের আঞ্চলিক উপকূলীয় চার্লসের এই জুয়ো খেলা প্রসঙ্গে এমন এক সর্বনাশা ঘটনার উল্লেখ আছে যা শুনলে গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে।

নভেম্বর মাসের এক রবিবারের সন্ধ্যে, সূর্য ডোবার পর থেকেই ষষ্ঠ লর্ড স্ট্র্যাথমোর ঢুকেছেন তাঁর ব্যাক্তিগত কামরায়, জুয়ো খেলবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছেন তিনি। কিন্তু তিনি পাগল হলেও প্রাসাদের কাজের লোকেরা মাথা ঠিক রেখেছে। রবিবার দিনটা খ্রীষ্টানদের কাছে 'স্যাবাথ' বা পুরোপুরি বিশ্রামের দিন। ঐদিন জুয়ো খেলাও নিষেধ। কাজের লোকেরা দেখছে তাদের প্রভু খুব দিলদরিয়া মেজাজে আছেন। দুপুরের পর থেকে ঘন ঘন চুমুক দিচ্ছেন মদের গ্লাসে। একে নিষিদ্ধ দিন, তার ওপর মনিব নেশায় চুবচুর হয়ে ঢুলছেন। এই অবস্থায় সত্যি সত্যি জুয়ো খেলতে বসলে তাঁর মাথা আদৌ কাজ করবে না এবং বাজি ধরে খেলতে গিয়ে তিনি হেরে ভূত হবেন তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই, কাজের লোকেদের মধ্যে প্রকৃত হিতৈষী যারা তারা আগেভাগেই মনিবের ঘরে ঢুকে টেবলের দেরাজ খুলে তাসের প্যাকেট সরিয়ে রেখেছে, ফটকের প্রহরীকে তারা বলে রেখেছে মনিব যাদের সঙ্গে জুয়ো খেলেন তাদের একজনকেও আজ রাতে যেন প্রাসাদে ঢুকতে না দেয়। দুপুর থেকে অঝোর ধারে বৃষ্টি পড়ছে। এবার তার সঙ্গে প্রচণ্ডবেগে বইতে লাগল ঝোড়ো বাতাস, ঘন ঘন বাজ পড়ায় আওয়াজ কেঁপে উঠতে লাগল চারদিক। শাস্ত্রের নিয়ম না মেনে প্রভু জুয়ো খেলতে বসবেন, তার মধ্যে প্রকৃতির এই অভাবিত রুদ্ররূপ দেখে প্রাসাদের কাজের লোকেদের মুখ শুকিয়ে গেল। কিন্তু তারা ভয় পেলেও তাদের প্রভুর এতটুকু ভ্রূক্ষেপ নেই, দেরাজ হাতড়ে প্যাকেট ভর্তি চেনা তাসের হদিশ না পেয়ে তাঁর চনমনে নেশার দিলদরিয়া মেজাজ গেছে খিঁচড়ে। নাম ধরে কাজের লোকেদের ডেকে তিনি তাদের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে লাগলেন। বেগতিক দেখে যে তাসের প্যাকেট লুকিয়েছিল সে নিজেই এগিয়ে এল। খোঁজার ভান করে ঢুকে পড়ল খাটের নিচে, সেখান থেকে

চেঁচাতে লাগল 'হুজুর, পেয়েছি! এই যে, এখানে পড়ে আছে,' বলে তাসের প্যাকেট পকেট থেকে বার করে বেরিয়ে এল সে, প্যাকেটখানা মনিবের সামনে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

"চালাকি পেয়েছো?" মনিব খেঁকিয়ে উঠলেন, "বন্ধ দেরাজ থেকে তাসের প্যাকেট ভর্তি তাস আমার খাটের নিচে ঢুকল কি করে? আমি নেশা করেছি বলে আমার তাসের ত হাত পা গজায় নি! এসব তোদেরই কাজ, আমি বিলক্ষণ জানি, আমায় জুয়ো খেলতে না দেবার মতলবে তোরা সবাই একজোট হয়েছিস!"

"না হুজুর", হাতজোড় করে লোকটি বলল, 'বিশ্বাস করুন'।

"আমি কি কচি লোক যে তোর কথা বিশ্বাস করব?" প্রভু নেশার ঘোরে বললেন, "বিশ্বাস করতে পারি যদি আমার সঙ্গে বাজি ধরে জুয়ো খেলিস; যা, টেবলের ওপিঠে আমার মুখোমুখি বসগে যা!"

প্রভুর কথা শুনে ভয়ে কাজের লোকটির মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল। হাতজোড় করে সে বলল, "মাফ করুন হুজুর! আর যা বলেন সব করতে পারি, কেবল ঐটে ছাড়া। আজ রোববার, স্যাবাথ, সবার বিশ্রামের দিন। আজকের দিনে যে জুয়ো খেলে ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করেন না!"

"আরে ছো!" মনিব তুড়ি মেরে তার কথা উড়িয়ে দিলেন, "ঠিক আছে, তোকে খেলতে হবে না, তুই চলে যা। গিয়ে সবাইকে বল আমার খেলার পার্টনার দরকার। তোদের মধ্যে যে জুয়ো খেলতে জানে তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দে! জলদি যা!"

যাকে বলা সে তখন মনিবের সামনে থেকে পালাতে পারলে বাঁচে। কোন মতে ঘর থেকে বেরিয়ে বাকি সবাইকে জড়ো করে সবকথা শোনাল সে, প্রভু যে জুয়ো খেলার জন্য একজন পার্টনার খুঁজছেন তাও বলল। কিন্তু রাঁধুনি, বাবুর্চি, খাস আর্দালি, মশালচি থেকে শুরু করে ফাই ফরমাশ খাটা চাকর, দেহরক্ষি এমনকি ঠিকে কাজের লোকেরাও কেউ শাস্ত্রের নিয়ম ভেঙ্গে সে রাতে তাদের প্রভুর জুয়োর পার্টনার হতে চাইল না। রোজ যারা তাঁর সঙ্গে জুয়ো খেলতে আসে তাদের একজনও ঘটনাচক্রে সেদিন এল না। একজনকেও পার্টনার না পেয়ে শেষকালে লর্ড স্ট্র্যাথমোর ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন। পরিণতির কথা না ভেবে তিনি আপন মনে বলে উঠলেন, "আর কেউ যখন আসতে চাইছেনা তখন শয়তান নিজেই ত আসতে পারে। আজ রাতে আমি শয়তানের সঙ্গে যে কোন বাজি ধরে জুয়ো খেলতে তৈরি আছি।"

স্কটিশ গ্রামাঞ্চলের উপকথায় লেখা আছে তিনি আপনমনে একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের বুক চিরে ফালা ফালা করে বিজলি জ্বলে উঠল, কানফাটানো আওয়াজে কাছেই কোথাও বাজ পড়ল। তার খানিকবাদে বাইরে থেকে দরজায় টোকা পড়ল, গম্ভীর গলায় কে যেন বলে উঠল, "ভেতরে আসতে পারি?"

"যেই হও, এসো", ভেতর থেকে লর্ড স্ট্র্যাথমোর নেশা জড়ানো গলায় বলে উঠলেন, "শয়তানের নাম নিয়ে বলছি এসে আমায় উদ্ধার করো!"

সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা ঠেলে এক অচেনা লোক ভেতরে ঢুকে মুখোমুখি চেয়ারে বসে পড়ল। লোকটি বেজায় ঢ্যাঙ্গা, কালো আলখাল্লা গলা পর্যন্ত ঢাকা, মাথায় টুপি ভুরু পর্যন্ত টেনে নামানো বলে তার চেহারা দেখা যাচ্ছে না। কেন কে জানে. প্রচণ্ড নেশার মধ্যেও লোকটি ভেতরে ঢোকামাত্র লর্ডের গা এক অজানা আশঙ্কায় শিউড়ে উঠল।

"পার্টনার যখন পেয়ে গেছেন তখন শুধু শুধু দেরি করে লাভ কি", আগন্তুক মুখ তুলে বলল। "তবে আগেই বলে রাখছি আমি কিন্তু চড়া দরে বাজি ধরে খেলতে বসি। যদি আপনার পোষায় ত ভাল নয়ত আমি এক্ষুণি চলে যাব।"

"বলুন, কি আপনার বাজি", লর্ড বললেন।

"টাকাকড়ির ওপর আমি বাজি ধরি না।" আগন্তুক বলল। "আমার বাজি একটাই, তা হল ; খেলায় হেরে গেলে আমি যা করতে বলব তাই করতে হবে, যেভাবে চলতে বলব সেইভাবে চলতে হবে। যদি রাজি থাকেন ত এই চুক্তিপত্রে আগাম সই করে দিন," বলে একখানা গোটানো কাগজ বাড়িয়ে দিল সে। কাগজে কি লেখা আছে ভাল করে না পড়েই লর্ড তার নিচে সই করে দিলেন।

এরপর শুরু হল খেলা। দরজা বন্ধ তাই ঘরের ভেতরে কি হচ্ছে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু তাদের মনিব যে জুয়ো খেলছেন সে বিষয়ে কাজের লোকেদের মনে কোনও সন্দেহ নেই। তাদের সবার চোখমুখে প্রশ্ন একটাই তাহল লর্ড কার সঙ্গে জুয়ো খেলতে বসেছেন? কখন কোন দরকারে ডাকবেন ভেবে যারা বন্ধ দরজায় আশেপাশে ঘুরঘুর করছিল তারা খানিক আগেও কাউকে ঘরে ঢুকতে দেখেনি। তাদের চোখ এড়িয়ে বাইরের কোনও লোকের পক্ষেই ভেতরে ঢোকা সম্ভব নয়। আবাব খানিক আগেই তারা নিজে কানে শুনেছে তাদের মনিব পার্টনার না পেয়ে অস্থির হয়ে শেষকালে যে অশুভ অলুক্ষণের নাম মুখেও আনতে নেই সেই শয়তানকে তাঁর জুয়ো খেলার পার্টনার হতে আহ্বান করেছেন। আর তার খানিক বাদে তিনি হাঁকডাক করে দান ফেলছেন যার মানে দাঁড়ায় তাদের মনিব জুয়ো খেলছেন। তা খেলুন ক্ষতি নেই কিন্তু প্রশ্ন হল খেলছেন কার সঙ্গে, শেষপর্যন্ত কে এসেছে এই বিশ্রি বদখত রাতে ওর পার্টনার হতে? তবে কি—?

প্রশ্নটা সবার মনেই চাপা থেকে যায়। কেউ কাউকে মুখ ফুটে তা জিজ্ঞাসা করবার মত সাহস পায় না।

বন্ধ ঘরের ভেতর খেলা ততক্ষণে জমে উঠেছে, প্রভুর গলা ছাপিয়ে উঠছে আরেকটি গলা। ভারি, গমগমে সে গলা শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়, লোম খাড়া হয়ে ওঠে। তাদের মনিবের মত হেঁকে হেঁকে সেও দান দিচ্ছে। পার্টনার যেই হোকনা কেন তার পরিচয় জানতে সবাই কৌতূহলী হল। কিন্তু কৌতূহলী হলেও উপায় নেই। খেলা শেষ হবার আগে দরজা খোলার মত বেয়াদপি তাদের পক্ষে করা কোনমতেই সম্ভব নয়। বিশেষতঃ তারা প্রাসাদের কাজের লোক এক কথায় চাকরবাকর। মনিবের পার্টনারকে জানতে হলে ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। খেলা শেষ হলে বাজির টাকাকড়ি গুছিয়ে পকেটে ভরে নয়ত সব খুইয়ে তাদের প্রভুর হাতে তুলে দিয়ে সে লোক আপনিই দরজা খুলে বেরিয়ে পরে।

কিন্তু উদগ্র কৌতূহল ততক্ষণ চেপে রাখতে সবাই পারে না আরও আজকের পরিস্থিতিতে। লর্ডের খাস আর্দালির বয়স হয়েছে, কিন্তু হলে কি হবে, মনিবের পার্টনারকে দেখার জন্য সেই ছটফটিয়ে মরছে। তার মুখখানা না দেখলে যেন তার রাতের খাওয়া হজম হবেনা। দরজার ধারেকাছে ভিড় করে দাঁড়ানো আর সব কাজের লোকেদের ঠেলে সে এগিয়ে এল, ঘাড় অনেকটা ঝুঁকিয়ে পাল্লার গায়ে চাবির ফুটোয় চোখ রেখে তাকাল ভেতরের পানে, আর তার সঙ্গে সঙ্গেই—

"ঐ উঁকি মারা চোখটা গেলে দে!" বলে গা হিম করা গলায় কে যেন হেঁকে উঠল ভেতর থেকে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে সেই খাস আর্দালি চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে উল্টে পড়ল বারান্দায়। সবাই ছুটে এসে তাকে সোজা করে দিতেই চমকে উঠল. দেখল তার বাঁ চোখটা গলে নষ্ট হয়ে গেছে। রক্ত গড়াচ্ছে দর দর করে সেখান থেকে দেখে মনে হয় কেউ লোহার শিক গরম করে চোখ কানা গেলে দিয়েছে। চোখের চারপাশে ছ্যাঁকা দেবার মত গোল কালো দাগ। হাউ মাউ করে কাঁদছে বেচারা প্রচণ্ড যন্ত্রণায়।

'অ্যাই!' কে ভেতরে উঁকি দিয়েছিলি। তোদের সাহস দেখছি দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। গজরাতে গজরাতে দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন লর্ড স্ট্র্যাথমোর, কাজের লোকেদের ধমক দিয়ে বললেন, "আমার খেলা শেষ হলে তোদের ডাকব তখন আসবি। তার আগে ধারে কাছে যে চেঁচাবে তার মাথা ধড় থেকে নামিয়ে দেব খেয়াল থাকে যেন। "বলতে বলতে ফের ঢুকলেন ঘরে। ভেতরে পা দিয়েই তাঁর চোখ ছানাবড়া। কারন মুখোমুখি বসা আলখাল্লা গায়ে সেই রহস্যময় পার্টনার ততক্ষণে উধাও হয়েছে। আর যাবার আগে তাঁর নিজে হাতে সই করা খাতাখানাও সঙ্গে নিতে ভোলেনি। তিনি হেরে গেছেন সেই মুহূর্তে লর্ড তা বুঝতে পারলেন। প্রচণ্ড ঝড় জলের রাতে তাঁর জুয়োখেলার পার্টনার হতে এসেছিল তা সেই সব খোয়ানোয় চরম মুহূর্তে দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে উঠল তাঁর কাছে। নেশার ঘোর তখন প্রায় পুরোটাই ফিকে হয়ে এসেছে। লর্ডের মনে পড়ল পার্টনারের অভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি শয়তানকে তাঁর পার্টনার হবার জন্য আহবান করেছিলেন আর তার খানিক বাদেই এই রহস্যময় অচেনা লোকটির আবির্ভাব ঘটেছিল। খেলায় তিনি হেরেছেন, সে জিতেছে। বাজির শর্ত অনুযায়ী এবার সেত সবটাই উশুল করে নেবে। সে লোকের ইচ্ছের দাস হয়ে চলতে হবে তাঁকে অনন্তকাল করে যেতে হবে শয়তানের দাসত্ব। লোকে বলতেই বলে পাওনা উসুল করতে শয়তানের কখনও ভুল হয় না।

"হা ঈশ্বর, এ আমি কি করলাম।" অসহায় গলায় আর্তনাদ করে উঠলেন লর্ড স্ট্র্যাথমোর। "এভাবে নিজের সর্বনাশ করলাম। এবার কে আমায় বাঁচাবে এই অনন্ত অভিশাপ থেকে।" কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

সেই দুঃস্বপ্নের পরে কেটে গেছে কত বছর, পান পাত্রের অভিশাপ লর্ড স্ট্র্যাথমোরের বংশধরদের জীবনে আজও করাল প্রভাব ফেলছে কিনা জানা নেই। হবে গ্ল্যামিস ক্যাসলে বছরের এক নির্দিষ্ট দিনে লর্ড স্ট্র্যাথমোরের সেই ব্যক্তিগত কামরার ভেতর আজও বসে জুয়োর আসর, বন্ধ দরজায় ওপাশ থেকে নেশা জড়ানো গলায় দান ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হয় আওয়াজ। সেই গলার আওয়াজ তখনই চাপা পড়ে কারও ছাদ ফাটানো অট্টহাসিতে, সে হাসি বেড়েই চলে আর কমতে চায় না। সেই রহস্যময় অট্টহাসি শোনামাত্র প্রাসাদের বাসিন্দাদের গায়ের লোম ভয়ে খাড়া হয়ে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে তারা কপালে বুকে পবিত্র ক্রস চিহ্ন আঁকে। ঐ ক্রস চিহ্নকে শয়তান ভর করে তা তাদের অজানা নয়।

স্কটল্যাণ্ডের কেল্ট উপজাতির অনেকে ছিল দিব্যদ্রষ্টা। মজার ব্যাপার হল, নিজের ভাগ্য সম্পর্কে কেউ কিছু জানতে চাইলে এরা শুধু খারাপ বা ভবিষ্যতের অশুভ ঘটনাগুলো এমন ভাবে তুলে ধরত যা শুনে প্রশ্নকর্তার নিরাশ হওয়া ছাড়া আর কোনও গতি থাকত না। যে প্রতিবাদ করত তাকেই শাপশাপান্ত করত এরা। সাধারণ মানুষ তাই ভারতীয় পুরাণের দুর্বাসা

মুনির মতই এদের ভয়ের চোখে দেখত। পথে ঘাটে দেখা হলে এড়িয়ে যেত। এমনই এক দিব্যদ্রষ্টা ছিল কইনিখ ওভার নামে এক চাষী যাকে সবাই ব্রাহানের দিব্যদ্রষ্টা নামে ডাকত। কইনিখের কাছে থাকত মাঝখানে ফুটো করা একখানা গোল সাদা পাথর। কেউ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন করলে সে সেই পাথরখানা তুলে ধরত চোখের সামনে। কইনিখ বুক ফুলিয়ে বলে বেড়াত এক বিদেহী আত্মা তাকে ঐ পাথর দিয়েছে। প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের উত্তর ফুটে উঠত সেই পাথরে ছবির মত। তাই দেখে সে উত্তর দিত কিন্তু ভবিষ্যৎ বলতে গিয়ে সে নিজেও প্রশ্নকর্তার দুর্ভাগ্যের দিকগুলোই শুধু তুলে ধরত।

একবার ব্রাহান প্রাসাদের অধিপতি লর্ড সিফোর্থ বিশেষ কাজে বিদেশে গেলেন। প্রাসাদে যুবতী স্ত্রী, আর নায়েব, গোমস্তা, পাইক, পেয়াদা, বরকন্দাজ দিন রাতের কাজের লোক আর একপাল সেপাই শান্ত্রী ছাড়া কেউ নেই। বহুদিন কেটে গেল তবু লর্ড সিফোর্থের দেশে ফেরার নামটি নেই। তা কাজের চাপ থাকায় ফিরতে দেরি হতেই পারে। কিন্তু ঘোড়সওয়ার পাঠিয়ে খবর দেয়া নেয়াও ত তিনি করতে পারেন? কিন্তু লর্ড বাহাদুর সে ধারও মাড়াচ্ছেন না। বহুদিন স্বামির কোনও খোঁজখবর না পেয়ে লেডি সিফোর্থ স্বাভাবিক ভাবেই উতলা হলেন। তাঁর বাপের বাড়ির ক'জন আপনার-জন কিছুদিন হল প্রাসাদে অতিথি হয়ে আছেন। জমিদার জামাইয়ের খোঁজখবর না পেয়ে তাঁরাও চিন্তিত। একদিন তাঁদেরই একজন কথায় কথায় দিব্যদ্রষ্টা কইনিখের নাম বললেন। তার ভবিষ্যৎ দর্শনের ক্ষমতার কথা লেডি সিফোর্থকে মনে করিয়ে দিলেন। তিনিই বললেন কইনিখ যখন লর্ড সিফোর্থের অধীনস্থ প্রজা তখন লেডি সিফোর্থ ইচ্ছে করলেই তাকে ডাকিয়ে তাঁর স্বামি কোথায় কেমন আছেন এসব প্রশ্নের উত্তর জেনে নিতে পারেন। যিনি কইনিখের প্রসঙ্গ তুললেন ধরেই নেয়া যায় তিনি ছিলেন এক মহিলা, জমিদারের খোঁজখবর নেবার ফাঁকে নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু প্রশ্নের উত্তর ফাঁকতালে জেনে নেয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁর প্রজাদের মধ্যে দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন একজন আছে একথা আগে জানতেন না লেডি সিফোর্থ। তিনি তখনই লোক পাঠালেন কইনিখের খোঁজে। তাকে যেখান থেকে হোক নিয়ে আসার হুকুম দিলেন তিনি।

কইনিখ বেচারা তখন তার ক্ষেতে কাজ করছিল, জমিদারের পেয়াদা এসে তাকে একরকম জোর করে ধরে নিয়ে এল প্রাসাদে। আত্মীয়দের সামনে লেডি সিফোর্থ বললেন, "শুনেছি তোমার দৈব ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতা বলে দূরের সবকিছু দেখতে পাও, ভবিষ্যতও বলতে পার। তোমাদের প্রভু লর্ড সিফোর্থ বিদেশে গেছেন। বহুদিন তাঁর খোঁজখবর না পেয়ে আমার মন উতলা হয়েছে। তুমি বাপু একবার তোমার ক্ষমতা বলে দ্যাখো ত উনি কোথায় আছেন।"

জমিদারনীর আবদার শুনে কইনিখ তার জামার ভেতর থেকে সেই ফুটো করা পাথরখানা বের করল। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "জমিদার মশাই প্যারিসে আছেন দেখছি। উনি সুস্থই আছেন, ওঁর জন্য আপনি অযথা ভাববেন না।"

"প্যারিসে আছেন ত বুঝলাম।" স্বামী সুস্থ শরীরে আছেন জেনে লেডি সিফোর্থ কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। জানতে চাইলেন, "তা প্যারিসে উনি এখন কি করছেন কিছু দেখতে পাচ্ছো?"

"আজ্ঞে পাচ্ছি বই কি", কইনিখ তার হাতে ধরা পাথরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জবাব দিল। "উনি এমন এক ধনী বেশ্যার বাড়িতে এসেছেন দেশের বড় মানুষরাও যাকে

খাতির করে, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সেই বেশ্যা আয়নার সামনে বসে সাজগোজ করছে আর আমাদের জমিদার মশাই তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাত পেতে কিছু চাইছেন।"

কইনিখের জবাব শুনে লেডি সিফোর্থের মাথার ভেতর আগুন জ্বলে উঠল। তিনি ধরে নিলেন ভবিষ্যৎ দেখার নামে কইনিখ তাঁকে ভাঁওতা দিচ্ছে, বাইরের পাঁচ জনের সামনে মশকরা করছে তাঁর সঙ্গে। ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে তিনি সেপাইদের ডেকে বললেন, "এই লোকটা সবার সামনে লর্ড সিফোর্থের নামে যাতা বলে তাঁর অপমান করেছে। একে এক্ষুণি বাইরে নিয়ে গিয়ে ফাঁসিতে ঝোলাও।"

লেডি সিফোর্থের হুকুম শুনে কইনিখের দু'চোখেও আগুন জ্বলে উঠল। হাতে ধরা পাথরখানা জামার ভেতরে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল তারপর আঙুল নেড়ে দেখালো সিফোর্থকে বলল, "সোয়ামির খবর জানতে আমায় ডাকিয়ে আনলেন। আমি যা দেখেছি তাই বলেছি। এর জন্যে আপনি আমার ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারবেন? আমি ত কোনও দোষ করিনি। তা ফাঁসি দিতে চান দিন। ভূত ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার কারবার। মরতে আমি ভয় পাই না। কিন্তু জমিদারনি তুমি হুঁশিয়ার এই বলে দিচ্ছি। বিনা দোষে আমার প্রাণ নিয়ে তুমি খুব ভাল করলেনা। এর ফল তোমায় ভুগতে হবে।"

"কি ফল ভুগব শুনি?" কইনিখের কথায় ঘাবড়ে না গিয়ে লেডি সিফোর্থ বললেন, "তুমি আমার কি ক্ষতি করবে চাষা ভূত কোথাকার?"

"আমি করবার কে," কইনিখ আঙ্গুল মটকে শাপশাপান্ত শুরু করল। "মরার আগে বলে যাচ্ছি তোমার সোয়ামির বংশে বাতি দেবার কেউ থাকবে না। তোমাদের শেষ বংশধর হবে বোবা আর কালা। তার চারটে ছেলে হবে। তাদের একটার হবে দাঁত উঁচু, একটার চেরা ঠোঁট, একটা হাবাগবা, আরেকটা তোতলা। এমন অদ্ভুত রোগে ভুগে ওরা মরবে যার চিকিৎসা কোনও ডাক্তার করতে পারবেনা।" লেডি সিফোর্থের হুকুম তামিল করতে কইনিখকে তখনই প্রাসাদের বাইরে নিয়ে গিয়ে সেপাইরা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিল। কিছুদিন বাদে লর্ড সিফোর্থ দেশে গিয়ে কানা ঘুষোয় সব জানতে পারলেন। রাগের মাথায় ঐভাবে তাঁর জমিদারির এক নিরীহ প্রজাকে ফাঁসি দেবার জন্য স্ত্রীকে যথেষ্ট গালিগালাজ করলেন তিনি। সব শুনে লর্ড জানালেন কইনিখ ঠিক দেখেছিল। ঐ দিন তিনি সত্যিই প্যারিসের এক বেশ্যার বাড়িতে গিয়েছিলেন। একটি বিশেষ কাজ তাকে দিয়ে করাতে। তিনি সত্যিই তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাত জোড় করে মিনতি করছিলেন।

স্বামীর মুখে এসব শুনে কৃতকর্মের জন্য লেডি সিফোর্থ অনুতপ্ত হলেন। কিন্তু তখন অনুতাপ করা অর্থহীন। পরবর্তীকাল সিফোর্থ বংশে সত্যিই বাতি দেবার কেউ ছিল না। কইনিখের অভিশাপও ফলে গিয়েছিল। সিফোর্থ জমিদার বংশের শেষ পুরুষ জন্মেছিল কালা ও বোবা হয়ে। বড় হবার পরে বাপ মা তার বিয়ে দেন। বিয়ের বহুবছর পরে তার স্ত্রী পরপর চারটি পুত্র প্রসব করেন, এদের মধ্যে প্রথম জন ছিল দাঁত উঁচু। দ্বিতীয়টির ওপরের ঠোঁট ছিল চেরা। তৃতীয়টি হাবাগবা। আর চতুর্থটি ছিল তোতলা। এরা বড় হবার পরে স্কটল্যাণ্ডে এক অদ্ভুত জ্বরের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। সেই জ্বরে আক্রান্ত হয়ে ঐ চারটি ভাই পর পর মারা যায়। ডাক্তার অনেক চিকিৎসা করেও তাদের সে জ্বর সারাতে পারেনি। হতভাগ্য দিব্যদ্রষ্টা কইনিখের অভিশাপ এইভাবে অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল।

ভূত দর্শনে উত্থান পতন

এবারের ঘটনা যাকে নিয়ে সেই ক্যাপ্টেন রবার্ট স্টুয়ার্ট লর্ড ক্যাসলরিখ ও সেকেণ্ড মার্কুইস অফ লণ্ডনডেরি। এ দু'টি রাজকীয় খেতাবের অধিকারী হন। এছাড়া ব্রিটেনের এক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারি হবার সৌভাগ্যও তিনি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু কর্মজীবনের শেষ ভাগে তিনি রোগে ভুগে মানসিক অবসাদে আক্রান্ত হন এবং শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে জীবনের জ্বালা জুড়োন। তার এই বিপুল সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির মূলে ছিল ভূত দেখার এক ঘটনা। ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের মৃত্যুর পরে তার জনৈক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ঘটনাটি যেভাবে উল্লেখ করেছেন হুবহু সেই ভাবে তা এখানে তুলে ধরলাম।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের কথা। ছুটি নিয়ে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট বেড়াতে এসেছিলেন উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের গ্রামাঞ্চলে। কিছু দূরে গভীর জঙ্গল। সেখান থেকে প্রচুর বনমোরগ আর বুনো শুয়োর জঙ্গলের বাইরে ছোট নদীর আশেপাশে চলে বেড়ায় শুনেই শিকারের নেশা চাপল মাথায়। শিকারের প্রয়োজনীয় বন্দুক, গুলিবারুদ আর একবেলার মত খাবার-দাবার ঝোলায় পুরে যে সরাইয়ে উঠেছিলেন তার মালিকের কাছ থেকে জায়গাটা সন্ধান জেনে নিলেন। তারপর পেট ভরে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

সরাইখানার মালিক যে পথ বাতলে ছিল, সেই পথ ধরে এগোলে দুপুরের ভেতর নদীর ধারে পৌঁছোনোর কথা। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। বেলা পড়ে সূর্য ঢলে পড়ল পশ্চিমে তখনও নদীর ধারে কাছে পৌঁছোতে পারলেন না ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট। তিনি যে ভুল পথে এগোচ্ছেন সে বিষয়ে তাঁর মনে সন্দেহ রইল না। ঘরে ফেরা পাখির ঝাঁকের চেঁচামেচি শুনে মুখ তুলতেই কয়েক ফোঁটা ঠাণ্ডা জল পড়ল তাঁর মুখে। দেখতে দেখতে শুরু হল প্রবল বৃষ্টি সেই সঙ্গে ঝড আগাগোড়াই ভুল রাস্তায় হাঁটছেন তাই উল্টোদিকে খুব জোরে পা চালালেও যে তাড়াতাড়ি সরাইখানায় পৌঁছোতে পারবেন না সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ ছিলনা তাঁর মনে। কাছেই গাছের জটলা দেখে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট দৌড়ে তার জড়ানো ডালপালার নিচে গিয়ে দাঁড়ালেন। গা মাথা এমনিতেই ভিজেছে তা নিয়ে তেমন চিন্তা নেই। চিন্তার কারণ সঙ্গের ঝোলা যার ভেতর আছে বেশ কিছু পরিমাণ গুলি বারুদ, সেগুলো ভিজে গেলে মুশকিল। এই দূর বিজনে জংলি জানোয়ার আর বদলোকের হাত থেকে বাঁচতে গেলে গুলি বারুদ অপরিহার্য। ভিজে গেলে তা কোনও কাজেই আসবে না।

সন্ধ্যে হতে তখনও অনেক দেরি। কিন্তু কালো মেঘে চারদিক গেছে ঢেকে, ঢাকা পড়েছে পড়ন্ত সূর্যের রক্তিমাভা। গাছের পাতার নীচে দাঁড়ালেও জলের ফোঁটা গায়ে ঠিকই পড়ে। অনেকক্ষণ সেখানে একভাবে দাঁড়িয়ে থেকেও ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট কোন পথে এগোবেন তা ঠিক করতে পারলেন না। দেখতে দেখতে আঁধার আরও গাঢ় হয়ে এল। দিগন্ত জোড়া কালো মেঘের সঙ্গে রাতের কালিমা মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল।

আচমকা আকাশের বুকে ঠিকরে পড়ল বিদ্যুতের উজ্জ্বল চাবুক। তার ক্ষণপ্রভায় আলো হয়ে উঠল চারদিক। আর সেই চকিত আলোয় বহু দূরে একটা গম্বুজের মত কিছু স্পষ্ট দেখতে পেলেন ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট।

গম্বুজ মানেই বড় বাড়ি, গির্জা বা প্রাসাদ। মনে মনে তাই ধরে নিয়ে সেই দিকে হুঁশিয়ার ভাবে দ্রুত পা ফেলে এগোলেন তিনি। যেতে যেতে মাঝখানে আরও কয়েকবার বিদ্যুতের চমকে সেই গম্বুজ তাঁর চোখে পড়ল। দূরত্ব যে কমে আসছে তা তিনি বুঝতে পারলেন।

একসময় পথ শেষ হয়ে সত্যিই এক বিশাল অট্টালিকার সামনে এসে পৌঁছোলেন ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট। বৃষ্টির জলে ভিজে তাঁর ....পোষাক ভিজে সপসপ করছে। ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট বেশ বুঝলেন তাঁর ঝোলার ভেতরে গুলি বারুদও আর শুকনো নেই। আর কিছু ভাবার মত মানসিক অবস্থা তাঁর সেই মুহূর্তে ছিল না। এগিয়ে এসে যেই বাড়ির সদর দরজার গায়ে ঝোলানো ঘন্টার রেশমি দড়ি ধরে টানলেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে কানে এল টুং টাং আওয়াজ। ওপরে তলায় ঘন্টা বাজছে। খানিক বাদে সদর দরজার পাল্লা খুলে বাড়ির মালিক দেখা দিলেন। ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের অবস্থা দেখে ব্যস্ত হয়ে দরজা খুলে তাঁকে ওপরে নিয়ে এলেন। তিনি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর অফিসার। ছুটি নিয়ে বেড়াতে এসেছেন এবং আজ শিকার করতে বেরিয়ে পথ ভুল করে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে পড়েছেন। গৃহস্বামী সবই মন দিয়ে শুনলেন। তারপর বললেন এই দুর্যোগের রাতে বলে দিলেও আপনি পথ চিনে ফিরতে পারবেন না। তার চেয়ে আমি বলি কি, এসেই যখন পড়েছেন তখন আজকের রাতটা অন্তত আমার এখানেই কাটান। আমার অবস্থা একসময় খুব ভাল ছিল। আমার পূর্বপুরুষেরা ছিলেন এই এখানকার জমিদার। এখন থাকার মধ্যে এই সাবেক বসতবাড়িটুকু ভাড়া আর কিছুই বলতে গেলে নেই। এ বাড়িতে প্রচুর ঘর আছে। কাজেই আপনার রাত কাটানোর কোনও অসুবিধে হবেনা। তবে আপনার মত মাননীয় অতিথির উচিত সমাদর হয়ত করতে পারব না।

গৃহস্বামীর বিনয়ে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট মুগ্ধ হলেন। রাত কাটানোর মত একটা জায়গা পাওয়ায় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।

ডিনার খেয়ে গৃহস্বামীব সঙ্গে তিনি কিছুক্ষণ গল্পগুজব করলেন। তারপর খাস আর্দালি তাঁকে পথ দেখিয়ে পৌঁছে দিয়ে গেল একটি ঘরে।

বড় বড় দুটি মোমবাতির আলোয় ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট দেখলেন একখানা পুরু গদিওয়ালা বড় কৌচ ছাড়া আর কোনও আসবাব ঘরের ভেতরে নেই। কোণে ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। দিন ভর হেঁটে তিনি এমনিতেই ক্লান্ত হয়েছিলেন। তারপর বৃষ্টির জলে গা ম্যাজম্যাজ করছিল। ফায়ারপ্লেসের কাঠগুলো ততক্ষণে খুব ধরে গেছে। ঘরের ভেতরটা যথেষ্ট গরম হয়ে উঠেছে। পাছে কোন কারণে আগুন লাগে এই ভেবে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট কয়েকটা জ্বলন্ত কাঠ টেনে বের করে আগুনের পরিমাণ কমিয়ে দিলেন। তারপর থেকে খানিকটা রাম গলায় ফেলে শুয়ে পড়লেন সেই কৌচে। অল্প কিছুক্ষণের ভেতর গভীর ঘুমের অতলে তিনি তলিয়ে গেলেন। বাইরে ঝড় বৃষ্টির বেগ ততক্ষণ অনেকটা কমে এসেছে।

একটানা অনেকক্ষণ ঘুমোনোর পরে একসময় কেমন অস্বস্তি হতে জেগে উঠলেন ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট। চোখ মেলতে দেখলেন সোনালি আলোর দ্যুতিতে ঘর ভরে গেছে। সকাল হয়ে গেছে তাই সূর্যের আলো ঘরে ঢুকেছে ভেবে পাশ ফিরতে যাবেন এমন সময় তাঁর চোখ পড়ল পায়ের দিকের জানালার দিকে। ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট দেখলেন জানালা বন্ধ। বন্ধ পাশের জানালাটিও। তাহলে বন্ধ ঘরে সূর্যের আলো আসছে কি করে এই প্রশ্ন হানা দিল তাঁর মগজে। মুখ তুলে ঘাড়

অল্প ঘোরাতেই তিনি চমকে উঠলেন দেখলেন ফায়ারপ্লেসের আগুন নিভু নিভু হয়ে জ্বলছে। তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে এক সুদর্শন কিশোর। তার সারা গা দিয়ে ঠিকরে বেরোচ্ছে জ্যোতির মত অদ্ভুত সোনালি আলোর আভা। যার আলোয় ঘরখানা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে দিনের আলোর মত। ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট চমকে গেলেও ভয় পেলেন না। কৌচ থেকে নেমে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন সেই দিব্য মূর্তির দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সেই মূর্তি অদৃশ্য হল। ঘরখানা আবার আগের মত আঁধারে ডুবে গেল। ফায়ারপ্লেসের নিভু নিভু আগুনের আঁচে পকেট ঘড়ি দেখলেন ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট—রাত চারটে। ভোরের আলো ফুটতে এখনও তিন থেকে চার ঘন্টা বাকি। লাগোয়া বাথরুমে ঢুকে প্রাকৃতিক কর্ম সেরে চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে তিনি ফিরে এসে আবার কৌচে টানটান হলেন। খানিক আগে দেখা দৃশ্য তাঁর মনে তোলপার হতে লাগল। তিনি যে ভূত দেখেছেন তাতে সন্দেহ নেই, এই ঘরটিতে বাইরের কেউ এলে নিশ্চয়ই ঐ বাচ্চা ভূত তাকে ভয় দেখাতে আসে। সোনালি আলোর ছায়া ছড়িয়ে অচেনা লোকটির ঘুম ভাঙ্গায়। গৃহস্বামী নিশ্চয়ই এসব জানেন। এবং জেনেশুনেই ভূতের ভয় দেখাতে এই ঘরে তাঁর রাত কাটানোর ব্যবস্থা করেছেন। ভেতরে ভেতরে গৃহস্বামীর ওপর রেগে গেলেন ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট। ঠিক করলেন সকাল হলেই এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন।

যথাসময় ভোরের আলো আকাশে ফুটল। খাস আর্দালি গরম চায়ের পট ট্রেতে সাজিয়ে বাইরে থেকে দরজায় টোকা দিয়ে বলল, 'ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট স্যার, মর্ণিং টি এনেছি আপনার জন্য।'

'অনুগ্রহ করে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।' ভেতর থেকে চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন রবার্ট, "মর্ণিং টি খাবার অভ্যেস আমার নেই।"

গৃহস্বামী ড্রেসিং গাউন গায়ে চাপিয়ে চুরুট মুখে বাড়ির সামনে পায়চারি করছিলেন। ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টকে ঝোলা কাঁধে বেরোতে দেখে তিনি চমকে গেলেন। এগিয়ে এসে জানতে চাইলেন, "ক্যাপ্টেন আপনি এখনই চলে যাচ্ছেন আমাদের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করবেন না?"

"ধন্যবাদ", ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট বললেন, 'এক রাতের জন্য আশ্রয় দেবার বিনিময়ে যে ভদ্র ব্যবহার করেছেন তাতেই আমি কৃতার্থ হয়ে গেছি। এরপরে আর ব্রেকফাস্ট খাবার প্রবৃত্তি নেই।"

"কি ব্যাপার বলুন ত ক্যাপ্টেন", গৃহস্বামী বললেন, "আমি ত সাধ্যমত আপনার আপ্যায়ন করেছি। তবে যদি কিছু ত্রুটি হয়ে থাকে তা খুলে বললে শোধরানোর চেষ্টা করতে পারি।" গৃহস্বামীর গলায় আন্তরিকতার ছোঁয়া পেয়ে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের মনে হল তাঁকে সব কথা জানানো দরকার। শেষ রাতের অভিজ্ঞতার কথা তিনি তাঁকে শোনালেন। তারপর বললেন, 'এই ঘটনার পরে আমি যদি ধরে নিই যে আপনি জেনে শুনে আমায় ঐ ভুতুড়ে ঘরে থাকতে দিয়েছিলেন তাহলে কি খুব ভুল হবে?'

"একটু অপেক্ষা করুন, ক্যাপ্টেন" গৃহস্বামী চেঁচিয়ে খাস আর্দালিকে ডেকে জানতে চাইলেন। "কাল রাতে কোন ঘরে ক্যাপ্টেনের শোবার ব্যবস্থা করেছিলে?"

"আপনার অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের ঘরে, হুজুর", খাস আর্দালি সবিনয়ে জানাল।

"কেন, আর কোন ঘর খালি ছিল না?"

"না হুজুর, আপনার শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়রা বাকি ঘরগুলো আগেই দখল করেছেন তাই আর কোথাও জায়গা পাইনি।"

"ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট," আর্দালিকে চলে যাবার ইশারা করে গৃহস্বামী বললেন, "বিশ্বাস করুন, যে ব্যাপারটা ঘটেছে তার পেছনে আমার কোনও হাত ছিল না। নিজের কানেই শুনলেন এ-বাড়ির বাকি ঘরগুলো আমার শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়রা এসে দখল করে বসেছেন। তাই ক্যাপ্টেন আমার আর্দালি আর কোনও ঘর হাতের কাছে খালি না পেয়েই ও ঘরে আপনার থাকার ব্যবস্থা করেছিল।

'এবার আপনি যে বিদেহী মূর্তিকে দেখেছেন তার প্রসঙ্গে আসছি। আপনি যাকে দেখেছেন তিনি সম্পর্কে আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের ছোট ভাইয়ের পবিত্র আত্মা। ঐ ঘরেই উনি মারা যান। তারপর থেকে ও ঘরে আর কেউ থাকে না। তবে জানবেন উনি যাকে দেখা দেন সে মহা ভাগ্যবান। ওঁর দর্শন পাবার অল্প কিছুদিন পরেই তার সৌভাগ্যের সূচনা হয়। কাজেই আমার পূর্ব পুরুষদের পবিত্র আত্মা যখন আপনাকে দেখা দিয়েছেন তখন আপনার সেই ভাগ্যের সূচনাও যে শীগগিরই হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আশা করি এর পরে আর আমায় ভুল বুঝবেন না। অনুগ্রহ করে ওপরে চলুন। আমার সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করে তারপর রওনা হবেন। তাছাড়া আপনি ত পথ হারিয়েছেন একা পথ চিনে ফিরবেন কি করে? আমার ঘোড়ার গাড়ি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে সরাইখানায়। আমার আর্দালি যাবে আপনার সঙ্গে। আসুন, অনুগ্রহ করে ওপরে আসুন।"

প্রৌঢ় গৃহস্বামীর মুখ থেকে সবিস্তারে ঘটনার ব্যাখ্যা শোনার পরে ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের রাগ অবশ্যই জল হয়ে গিয়েছিল। গৃহস্বামীর কথা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সত্যে পরিণত হয়েছিল। সৌভাগ্যের প্রবল স্রোত ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের জীবনের গতিই দিল পাল্টে। প্রথমে লর্ড ক্যাসলরিক তারপব সেকেণ্ড মার্কুইস অফ লণ্ডনডেরির সম্মানিত খেতাব তিনি অর্জন করেন। তারও কিছুদিন বাদে সেনাবাহিনীব চাকরি ছেড়ে আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজনীতিতে তিনি যোগ দেন। এরপর প্রথমে যুদ্ধ সচিব এবং তারপর বিদেশ সচিবের পদ অর্জন করেন।

যৌবনে সাফল্যের চরম শিখরে উঠলেও তাঁর পরবর্তী জীবন কেটেছে অসুস্থতার মধ্যে। নানারকম ব্যাধিতে ভুগে একসময় জীবনের ওপর হতাশ হয়ে পড়েন ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট। শেষ কালে একদিন বাড়ির লোকের অন্যমনস্কতার সুযোগে দাড়ি কামানোর ক্ষুর নিজের গলায় বসিয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি। ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের জীবন কথা তাঁর যে আত্মীয় লিখেছেন তিনিই উল্লেখ করেছেন যে জ্যোতির্ময় আত্মার দর্শন পাবার ফলে তাঁর সৌভাগ্যের সূচনা হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু জীবনের শেষ ভাগে তাঁর মৃত্যু যে অস্বাভাবিক ভাবে ঘটবে একথা তাঁর কাছে সেদিন ঐ প্রেতের বংশধর গোপন করেছিলেন বা বলতে ভুলে গিয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট আত্মহত্যা করার পর তাঁর আত্মীয় তাঁর জীবনী লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে অতীতের ঐ ঘটনা সম্পর্কে নতুন করে খোঁজখবর নেন এবং তখনই জানতে পারেন। এর আগেও ঐ জ্যোতির্ময় কিশোরের প্রেত যাদের দর্শন দিয়েছে তাঁরা সবাই উন্নতির চরম শিখরে উঠেছেন কিন্তু তাঁদের প্রত্যেকের মৃত্যু ঘটেছে অস্বাভাবিক ভাবে। হয় দুর্ঘটনা, নয়ত আত্মহত্যার মাধ্যমে।

কর্টাচি প্রাসাদের অভিশপ্ত দামামা

স্কটল্যাণ্ডের কর্টাচি প্রাসাদ দুর্গের অধিকারী ছিলেন এয়ার্লির আর্ল। এঁদের পদবী ছিল অগিলভি। স্কটল্যাণ্ডের গ্রাম্য লোককথায় উল্লেখ করা হয়েছে কর্টাচি প্রাসাদ দুর্গে অতীতে মাঝে মাঝে এক অদ্ভুত দামামার আওয়াজ শোনা যেত, যা কানে গেলে অগিলভি পরিবারের লোকেদের মুখ ভয়ে যেত শুকিয়ে। কারণ তাঁরা লক্ষ্য করে দেখেছেন দামামার আওয়াজ হবার অল্প কিছুদিনের মধ্যে পরিবারের কেউ না কেউ মারা যায়।

মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক স্কটল্যাণ্ডে অনেক পাহাড়ি উপজাতি মাথা চাড়া দিয়েছিল। জমির দখল নিয়ে বাসিন্দাদের সঙ্গে এইসব উপজাতির প্রায়ই ছোটখাটো সংঘর্ষ বাঁধত যা পরে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের চেহারা নিত। দীর্ঘস্থায়ী এসব যুদ্ধে দু'পক্ষের প্রচুর লোক মারা পড়ত।

লোককথার বর্ণনায় দেখা যায় ঐরকম সংগ্রামে অগিলভি বংশ জড়িয়ে পড়েছিল। প্রাসাদের দামামাবাদক ছিল জন্মসূত্রে এক বেঁটে বামন, একদিন দুপুরবেলা প্রাসাদের সবাই খেতে বসার তোড়জোড় করছে এমন সময় সেই কখন ঘোর রাতে দামামা বাজাতে বাজাতে ফিরে এল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। তার দামামার আওয়াজে প্রাসাদের সবার কানের পর্দা ফাটে আর কি। কানে অসহ্য ঠেকতে একসময় তাকে বাজনা থামানোর হুকুম দেয়া হল। সেই সঙ্গে প্রশ্ন করা হল কি খবর বয়ে এনেছে সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। এতটুকু কুণ্ঠিত না হয়ে সেই দামামাবাদক জানাল অগিলভি পক্ষের প্রধান সেনাপতি যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। উপজাতিরা যুদ্ধে জিততে চলেছে। এই খবর সবাইকে জানানোর জন্যই সে জোরে দামামা বাজাচ্ছে।

তার জবাবের বহর শুনে প্রাসাদের বাসিন্দারা রেগে আগুন হয়ে উঠল। প্রধান সেনাপতির মৃত্যু সংবাদ এইভাবে দামামা বাজিয়ে সবাইকে জানানো এত বড় সাহস? সেনাপতির ছেলে তখনই তার সাজার হুকুম দিল—"তলোয়ারের খোঁচা মেরে হতচ্ছাড়ার বাজনার পর্দাটা ফাঁসিয়ে দাও। তারপর হাত পা বেঁধে ওকে দামামার ভেতর গুঁজে বুরুজের ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দাও।"

যুদ্ধক্ষেত্রে পদে পদে মরণের মাঝখানে সৈন্যদের মনোবল বাড়াতে যে দামামা বাজায় মৃত্যুকে সে ভয় করে না বলাই বাহুল্য, কিন্তু ঐ অন্যায় শাস্তির বিধান শুনে সেও ভীষণ মুষড়ে পড়ল। তার দামামার পর্দা ফাঁসানোর কাজ ততক্ষণে সুসম্পন্ন হয়েছে। হাত পা পিছমোড়া করে বেঁধে সেই হতভাগ্য বেঁটে বামনের তালগোল পাকানো শরীরটা প্রাসাদের শাস্ত্রীরা দামাদার ভেতর ঢোকাতে থাকে এমন সময় সে চেঁচিয়ে বলল। "শোন সবাই, অন্যায়ভাবে আমাকে মেরে তোমাদের অগিলভি বংশ খুব শান্তিতে থাকবে না। আমি আবার ফিরে আসব, ঘুরে বেড়াব এই প্রাসাদের আনাচে কানাচে। এতদিন যে মনিবদের হয়ে লড়াই করেছি তাদের পরিবারের লোকেদের মৃত্যুর আগে আমি আবার দামামা বাজাব। সে আওয়াজে তারা অস্থির হয়ে উঠবে। হয়ত সেই হতভাগ্য আরও কিছু বলতে চেয়েছিল কিন্তু সেপাইশান্ত্রীরা চড়থাপ্পড় মারতে মারতে তাকে দিয়েছিল থামিয়ে। তার তালগোল পাকানো খুদে শরীরটা দামামার বেড়-এর ভেতর ঢুকিয়ে সত্যিই কর্টাচি প্রাসাদ দুর্গের সবচেয়ে উঁচু বুরুজের ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

সেই থেকে কর্টাচি প্রাসাদ দুর্গের সেই দামামা বাদকের অভিশাপ ফলতে শুরু করল— প্রাসাদের আনাচে কানাচে দামামা বাজবার আওয়াজ হলেই অগিলভি পরিবারের হাত পা ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যায়, বেশ বুঝতে পারে পরিবারের কারও মরণ আসন্ন।

সামন্ততন্ত্রের যুগের অবসান ঘটেছে কতকাল আগে, বর্বর পাহাড়ি উপজাতির লোকেরাও মিশে গেছে স্কটল্যাণ্ডের মূলস্রোতে, কিন্তু কর্টাচি প্রাসাদ দুর্গের দামামা বাদকের সেই অভিশাপ যে অন্তত ত্রিশ বছর আগেও ফলবতী হয়েছে তার প্রমাণ এই ঘটনা সেটা ১৯৬৭ সাল, অগিলভি পরিবারের ছোট মেয়ের এক বান্ধবী বড়দিনের ছুটি কাটাতে এসেছে কার্টাচি প্রাসাদে। পরদিন বিকেলে আয়নার সামনে বসে সে সাজগোজ করছে এমন সময় জানালার বাইরে বেজে উঠল দামামা। সে আওয়াজ শুনে চমকে উঠল মেয়েটি—সৈন্যদল কুচকাওয়াজ করার সময় তাদের পা ফেলার তালে তালে দামামা যেমন বাজে এ-আওয়াজ অবিকল সেরকম। মেয়েটি ভাবল জমিদারি চলে গেলেও ঠাট ঠমক বজায় রাখতে এখনও হয়ত প্রাসাদে পতাকা তোলা আর নামানোর রেওয়াজ আছে। আর তাই হয়ত দিনের শেষে পতাকা নামানোর সময় দামামা বাজছে। কৌতূহলবশে যে ঘর থেকে বেরিয়ে এল কিন্তু ধারে কাছে কাউকে দেখতে পেল না। ঘরে ঢুকে জানালা দিয়ে ঘাড় ঝুঁকিয়ে আশেপাশে তাকাল মেয়েটি কিন্তু এখানেও কাউকে তার চোখে পড়ল না। যার আমন্ত্রণে সে অতিথি হয়ে এসেছে তার সেই বান্ধবী গেছে সাদরে আসন্ন বড়দিনের উৎসব উপলক্ষে কেনাকাটা করতে। তার মা কাকিমা যে যার মহলে ডিনারের আগে নিজের নিজের সাজগোজ নিয়ে ব্যস্ত, এখন একটা ব্যাপারে প্রশ্ন করতে তাঁদের কাছে যাওয়া ঠিক হবে না বলেই তার মনে হল।

দামামার আওয়াজ তখনও শোনা যাচ্ছে। মেয়েটি কান খাড়া করে কিছুক্ষণ তা শুনল— অদৃশ্য দামামা বাদক ততক্ষণ মার্চের তালে তালে দামামা বাজাচ্ছিল। এবার বাজাচ্ছে রিট্রিট, দিনের শেষে পতাকা নামানো অথবা মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাতে যা বাজানোর আওয়াজ। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে সে আওয়াজ ক্ষীণ হতে হতে একসময় মিলিয়ে গেল।

সন্ধ্যের কিছু পরে ডিনার টেবলে পরিবারের সবাই এসে জড়ো হল। বান্ধবী অনেক আগেই শহর থেকে উৎসবের কেনাকাটা করে ফিরে এসেছে। সুপের চামচে চুমুক দিয়ে শহুরে মেয়েটি তাকে বলল, "বিকেলে সাজগোজ করছি এমন সময় জানালার বাইরে জোরে দামামা বেজে উঠল। মার্চের সময় যেমন বাজে। কিন্তু ধারে কাছে কাউকে চোখে পড়ল না। তার খানিক বাদে শুনলাম সুর তাল সব পাল্টে গেল। দামামার রিট্রিট বাজল অনেকক্ষণ ধরে। তোদের নিজেদের ব্যাণ্ড, তাই না? ভারি চমৎকার বাজাচ্ছিল। কিন্তু এই প্রাসাদের ফ্ল্যাগস্টাফ কোনদিকে? আমি ত বাইরে এসে কিছুই খুঁজে পেলাম না।"

বান্ধবীর বাবা বসেছিলেন উল্টোদিকে। মেয়ে জবাব দেবার আগে তাঁর হেঁচকি উঠল। হাতে ধরা চামচে যতটা সুপ তুলেছিলেন তার সবটাই পড়ে গেল বাটিতেই। কাঁপা গলায় মেয়ের বান্ধবীকে তিনি প্রশ্ন করলেন। "দামামার আওয়াজ তুমি নিজে কানে শুনেছো?"

"হ্যাঁ কাকু", মেয়েটি বলল, "সূর্য ডোবার আগে পর্যন্ত বাজনা শুনলাম। কিন্তু ধারে কাছে কাউকে দেখলাম না বলেই অবাক লাগছে। টেপ রেকর্ডারে বাজছিল না ত?"

পাশে বসা বান্ধবীর মুখে একটি কথাও নেই। একমনে সে সুপ খেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু টেবলে পরিবারের বাকি যে ক'জন বসেছেন তাদের সবার মুখ যে কালো মেঘের মত থমথমে হয়ে

উঠেছে তা অতিথি মেয়েটির চোখ এড়াল না। মেয়েটি বুদ্ধিমতী তাই কারও কাছ থেকে জবাব না পেয়ে বুঝল এ-প্রশ্ন করা তার ঠিক হয়নি। রাতে বান্ধবীর পাশে শোবার পরে তার মুখ থেকেই দামামার ইতিবৃত্ত আদ্যোপান্ত জানল সে। জেনে শিউরে উঠল অজানা আশংকায়। পরদিন খুব সকালে ব্রেকফাস্ট না খেয়েই মেয়েটি চলে গেল। যাবার আগে বান্ধবীর কাছ থেকে বিদায় পর্যন্ত নিল না। শহরে ফিরে টেলিফোনে বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলে এই ব্যবহারের জন্য মাফ চাইল সে। আর ক'দিন পরেই খবরের কাগজের পাতায় বিমান দুর্ঘটনার খবর তার চোখে।

নিহত যাত্রীদের তালিকায় চোখ বোলাতে গিয়েই চমকে উঠল সে। তালিকার গোড়াতেই তার বান্ধবীর বাবার নাম আর পাশে কর্টাচি প্রাসাদের ঠিকানা। ডিনার টেবলে মুখোমুখি বসা ভদ্রলোকের শান্ত মুখখানা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। কর্টাচির দামামা বাদকের অভিশাপ যে শীগগির ফলে তা এখনও তার বিশ্বাস হচ্ছে না। দামামার আওয়াজের প্রসঙ্গ তোলায় ডিনার টেবলে পরিবারের বাকি সদস্যদের মুখ কেন সেদিন থমথমে দেখাচ্ছিল সেই রহস্য তার কাছে সেই মুহূর্তে স্পষ্ট হল।

প্রেতের প্রতিহিংসা

ইংল্যাণ্ডে ব্রাডফোর্ড থেকে আন্দাজ চার মাইল দূরে ক্যালভার্লি। ইয়র্কশায়ার জেলাব এই শান্ত গ্রামটি বাইরে থেকে দেখলে অজ পাড়াগাঁ বলে মনে হলেও এখানকার পশমেব পোষাক তৈরির অসংখ্য কাবখানা একে ব্রিটেনেব কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্ব ও খ্যাতি এনে দিয়েছে।

ক্যালভার্লিতে এমন মানুষ খুঁজলে পাওয়া যাবে না যে সেখানকার ওল্ড হল প্রাসাদ দেখেনি বা তাব নাম শোনেনি। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের এক বীভৎস হত্যাকাণ্ড চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর স্থাপত্য রীতিতে গড়া এই প্রাসাদের সব সৌন্দর্যকে ঢেকে দিয়েছিল।

১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দেব ২৩ শে এপ্রিল। ওল্ড হল প্রাসাদের মালিক ওয়াল্টার ক্যালভার্লি বনেদী জমিদার বংশের ছেলে হলেও ছিল ভয়ানক বেপরোয়া ও হঠকারী ধাতের মানুষ। এও জানা যায় তার মা ছিল মানসিক রোগী, সম্ভবত মায়ের কাছ থেকে পাওয়া ঐ মানসিক ব্যাধি তাকে হিতাহিত জ্ঞানশূণ্য করে তুলত একেক সময়। সংসারে ওয়াল্টারের ছিল সুন্দরী স্ত্রী। আর ছিল ফুলের মত সুন্দর চারটি ছেলেমেয়ে। কিন্তু এদের ভবিষ্যতের কথা না ভেবে সে খেয়াল খুশিমত দু'হাতে টাকা ওড়াত।

সময় কাউকে ছেড়ে কথা বলে না। এই অপরিবর্তনীয় নিয়মে একদিন ওয়াল্টার ক্যালভার্লি দেখল বাজারে তার প্রচুর দেনা হয়েছে। পাওনাদারদের কেউ না কেউ রোজই বাড়িতে আসছে তাগাদা দিতে। সে যে ক্রমেই অনিবার্য ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে তা উপলব্ধি করে ওয়াল্টারের মাথা গরম হয়ে উঠল। একদিন বৌয়ের সঙ্গে তুচ্ছ সাংসারিক ব্যাপারে কথা কাটাকাটি হতে গিয়ে খুন চাপল তার মাথায়। রান্নাঘর থেকে একটা মাংসকাটা ছুরি জোগাড় করে ওয়াল্টার রেগেমেগে ঢুকে পড়ল শোবার ঘরে। চারটি ছেলেমেয়ে তখন শুয়েছিল, সেই অবস্থাতেই তাদের সবাইকে খুন করল সে। বৌ গিয়েছিল বাথরুমে তাই তখনকার মত তার প্রাণ বাঁচল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে শোবার ঘরে ঢুকতেই বৌ দেখল ধারে কাছে যে যেখানে

ছিল এসে হাজির হল। ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে যাবার আগেই ওয়াল্টার ধরা পড়ে গেল তাদের হাতে। শোবার ঘরে ঢুকে সেই বীভৎস দৃশ্য দেখে আঁতকে উঠল সবাই। ওয়াল্টারকে মজবুত দড়ি দিয়ে বেঁধে তারই ঘোড়ায় চেপে প্রতিবেশীদের কয়েকজন গিয়ে খবর দিল দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা শেরিফকে, শেরিফ সব শুনে সেপাই পাঠিয়ে সে-রাতেই ওয়াল্টার ক্যালভার্লিকে গ্রেপ্তার করে জেল হাজতে পুরলেন।

যথা সময় শুরু হল বিচার। খুনের আসামি হিসেবে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ওয়াল্টাব বিচারককে জানাল তার উকিলের প্রয়োজন নেই। নিজের চারটি ছেলেমেয়েকে খুন করার অভিযোগও স্বীকার করল সে। তখনকার আইনে এই নৃশংস অপরাধের সাজা ছিল যন্ত্রণাদাযক প্রাণদণ্ড। আসামিব হাত পা বেঁধে টানটান অবস্থায় চিত কবে শুইয়ে তার বুকের ওপর পরপর ভারি ওর্জন চাপিয়ে দমবন্ধ করে প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হত। বিচারক ওয়াল্টার ক্যালভার্লিকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলেন এবং ঐভাবেই বুকে ভারি ওজন চাপিয়ে দমবন্ধ করে প্রাণদণ্ড কার্যকর করার নির্দেশ দিলেন। নির্দিষ্ট দিনে ইয়র্ক দুর্গে ওয়াল্টারের বুকে ভারি পাথর চাপিয়ে প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হল। মৃত্যুর পরে কালভার্লি গির্জার লাগোয়া পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে তার মৃতদেহ কবর দেয়া হল।

এর কিছুদিন বাদে ক্যালভার্লি গ্রামে শুরু হল ভূতের উপদ্রব। সন্ধের কিছু পরে এক পাল কবন্ধ ঘোড়ায় চেপে কোথা থেকে চড়াও হয়। তাদের ঘোড়াগুলোও কবন্ধ, একটারও ধড়ে মাথা নেই। কবন্ধ ঘোড়ায় ওপর কবন্ধ ভূতেদের দিকে যে তাকায় সেই-ই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জ্ঞান হারায়। তার জ্ঞান আর ফেরেনা। গ্রামের লোক লক্ষ করত সেই কবন্ধ ভৌতিক বাহিনীর আগে আগে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে ওয়াল্টার ক্যালভার্লি স্বয়ং, শুধু তারই ধড়ের ওপর আছে আস্ত মাথা। ভয় দেখিয়ে চেঁচামেচি করে একসময় সেই কবন্ধ ফৌজ ঢুকে পড়ত গ্রামের শেষপ্রান্তে গভীর বনে। সে রাতের মত আর তাদের দেখা যেত না।

ওয়াল্টার ক্যালভার্লির অতৃপ্ত আত্মা নরকের অভিশপ্ত একখানা কবন্ধ জুটিয়ে এনে গ্রামে তাণ্ডব চালাচ্ছে। লোকজন মেরে ফেলছে শুনে স্থানীয় গির্জার প্রবীণ পাদ্রি বেভারেণ্ড বার্ডসল বিচলিত হলেন, ওয়াল্টারের আত্মার মুক্তির জন্য এক শনিবার রাতে তিনি এসে হাজির হলেন ওল্ড হল প্রাসাদে। যে শোবার ঘরে ওয়াল্টার তার চার ছেলেমেয়েকে খুন করেছিল সেই ঘরে সেই খাটে বিছানা পেতে শুলেন তিনি। শোবার আগে ধূপধূনো আর গুগগুল জ্বালিয়ে জর্ডন নদীর পবিত্র জল ছিটিয়ে চারপাশ শুদ্ধ করে নিতেও ভুললেন না।

কিন্তু এত করেও পাদ্রি সাহেব সেরাতে দু' চোখের পাতা এক করতে পারলেন না, যতবার ঘুম এল ততবার অনুভব করলেন তাঁর বুকের ওপর কে যেন খুব ভারি ওজন চাপিয়ে দিয়েছে। সেই চাপে ধীরে ধীরে তাঁর দম প্রায় বন্ধ হয়ে এল। কিন্তু জ্ঞান হারাবার মুহূর্তে অশরীরী শক্তি তাঁকে বিছানা থেকে তুলে আবার ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝেতে। একবার দু'বার নয়। গোটা রাতে পর পর চারবার একই ঘটনা ঘটল। চারবারের বার মেঝেতে ছিটকে পড়ার পড়ে সাহস হারিয়ে ফেলেন পাদ্রি বার্ডসল। ওয়াল্টারের ভূতের রোষ থেকে বাঁচতে দৌড়োতে দৌড়োতে বেরিয়ে এলেন প্রাসাদ থেকে। বাইরে ঘোড়া দাঁড়িয়েছিল। তার পিঠে চেপে সেই রাতে গিয়ে হাজির হলেন গির্জায়। এরপর পাদ্রি বার্ডসল ওয়াল্টার ক্যালভার্লির বিক্ষুব্ধ প্রেতাত্মার মুক্তির জন্য আর কখনও আগ্রহ দেখান নি। তবে এই ঘটনার পরে ওয়াল্টার ক্যালভার্লির বন্ধু ফৌজ আর যে গ্রামে হানা দেয় নি।

পর পারে মিলন

ইংল্যাণ্ডের প্রেস্টন ও ব্ল্যাকবার্ণ এর মাঝ বরাবর চওড়া হাইওয়ের পাশে স্যামলেসবেরি হল প্রাসাদ কয়েকশ বছরের প্রাচীন ঐতিহ্য বুকে জড়িয়ে আজও দাঁড়িয়ে।

নানারকম পার্থিব ও সামাজিক বাধাবন্ধন আর ভেদাভেদের দরুন দুটি নরনারী যদি ইহুদী বলে মিলিত হতে না পারে তবে পরপারে তাদের মিলনে কেউ বাধা দিতে পারে না একথা অনেকের মুখে শোনা যায়। দেশী বিদেশী বহু পুরাণকাহিণী ও লোকগাথায় এই জাতীয় অনেক ঘটনাও দেখা যায়।

এক সময় স্যামলেসবেরি হল প্রাসাদেও অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল যা সেখানকার পরিবেশে রচনা করেছে ভৌতিক পরিমণ্ডল ও আবহ।

রাণী প্রথম এলিজাবেথের শাসনকালে স্যামলেসবেরি হল প্রাসাদের অধিকারী ছিলেন স্যার জন সাউথওয়ার্থ। রাণীর সেনাবাহিণীতে কিছুসময় তিনি উচ্চপদস্থ সেনাণীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে ল্যাংকাস্টারের শেরিফের দায়িত্বও সুষ্ঠুভাবে তিনি পালন করেন। কিন্তু তিনি ছিলেন রোম্যান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত সনাতনী অর্থাৎ গোঁড়া খ্রীষ্টান। এই জাতীয় একজন মানুষের কাছে সেই আমলের যাবতীয় প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মাবলম্বী যে ছিল দু'চোখের বিষ তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু নিয়তির পরিহাস একাধারে যেমন বিচিত্র তেমনই করুণ ও নির্মম। স্যাব জন সাউথওযার্থের আদরের ছোট মেয়েটি এমন এক যুবকের সঙ্গে মন দেয়া নেয়ার খেলায় মাতল যে প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ভুক্ত। শুধু এই ধর্মীয় মতাদর্শগত বিভেদ ছাড়া আর সব দিক থেকে ছেলেটি ছিল তার প্রেমিকার স্বামী হবার উপযুক্ত।

বাড়ির লোকের চোখ যতদূর সম্ভব এড়িয়ে মেলামেশা করলেও একসময় সে খবর এসে পৌঁছোল স্যার জন সাউথওয়ার্থের কানে। শুনে তিনি তেলেবেগুণে জ্বলে উঠলেন। মেয়েকে বাড়িতে আটকে না রাখলেও তাকে ডাকিয়ে এনে সরাসরি বললেন তিনি কোনোও একজন প্রোটেস্ট্যান্টের সঙ্গে তার বিয়ে দেবেন না। তা সে পাত্র যতই যোগ্য হোক না কেন। সেই সঙ্গে স্যার সাউথওয়ার্থ মেয়েকে এই বলে হুঁশিয়ার করে দিলেন যাতে ভবিষ্যতে সে তার প্রোটেস্ট্যান্ট মনের মানুষটির সঙ্গে যেন আর দেখা সাক্ষাৎ না করে। ধুরন্ধর রাজকর্মচারী ও প্রশাসক স্যার সাউথওয়ার্থ জানতেন হাজার ধমকালেও ছেলেটির সঙ্গে তাঁর মেয়ের মেলামেশা বন্ধ করার ক্ষমতা তাঁর নেই তাই নিজের ছেলেদের মধ্যে যে ছিল তাঁর সবচেয়ে অনুগত তাকে গোপনে ডেকে বোনের গতিবিধির ওপর লুকিয়ে নজর রাখার নির্দেশ দিলেন।

মেয়েটির ভালবাসায় খাদ ছিল না তাই বাবার কাছে প্রচণ্ড ধমক খেয়েও সে আবার তার প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করল এবং বাপ যে তাদের বিয়ে কখনোই মেনে নেবেন না তা জানিয়ে দিল। দু'জনেই ততদিনে প্রেমের প্রাথমিক পর্যায়ে মন দেয়া নেয়া পর্ব কাটিয়ে উঠেছে। বিয়ে করে কবে ঘর বাঁধবে সেই আশায় উন্মুখ হয়ে আছে দু'জনেই।

মেয়ের বাবার মনোভাব জেনে দুঃখ পেলেও ছেলেটি তা কাটিয়ে উঠল। প্রেমিকাকে বলল যে এক্ষেত্রে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে বহুদূরে ঘর বাঁধা ছাড়া আর কোনও পথ

খোলা নেই। কঠোর, অনমনীয় অভিভাবকের হাত থেকে প্রেমিক তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করুক তা দুনিয়ার সব মেয়েই চায়। প্রেমিকের প্রস্তাব তাই মেয়েটির পছন্দ হল। দু'জনে বাড়ি থেকে পালাবার দিনক্ষণও স্থির করল। কিন্তু মেয়েটির ভাই যে কাছেই আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের পরিকল্পনার কথা মন দিয়ে শুনছে তা মেয়েটি জানতে পারে নি। নির্দিষ্ট দিনে কনেব সাজে সেজে মেয়েটি বাড়ি থেকে কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে এল। নির্দিষ্ট জায়গায় অপেক্ষা করতে লাগল তার প্রেমিকের জন্য। খানিক বাদে প্রেমিক এল তৈরি হয়ে দু'জন বিশ্বস্ত বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে। এদিকে মেয়েটির ভাইও লোকজন নিয়ে ততক্ষণে হাজির হয়েছে। তলোয়ার খুলে সে এগিয়ে এল, বোনের প্রেমিককে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করল। বেগতিক দেখে মেয়েটির প্রেমিকও তলোয়ার বের করে এগোল। কিন্তু প্রবল আক্রমণের মুখে টিকতে পারল ন। প্রেমিকার ভাইয়ের তলোয়ার একটু বাদেই তার কলজে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল। তার সঙ্গীদের হাতে প্রাণ দিল ছেলেটির বন্ধু দু'জন। শত্রুনাশ করে চুলের মুঠি ধরে বোনকে তার ভাই হিড় হিড় করে টানতে টানতে ফিরিয়ে নিয়ে গেল বাড়িতে। মেয়ে যে পালিয়েছে সে খবর ততক্ষণে বাড়িতে কারও জানতে বাকি নেই। খানিক বাদে মেয়েটিকে তার ভাই ফিরিয়ে নিয়ে এল বাড়িতে। নির্মম বাপ চরিত্র সংশোধনের জন্য এবার তাকে বহুদূরের এক কনভেন্টে পাঠালেন। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বাপের ইচ্ছায় বলি হয়ে ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনীদের মঠে রওনা হল সে। কিন্তু চার দেয়ালের বেড়াজালে আটকে প্রেম ভালবাসার বিরুদ্ধে রাশি রাশি জ্ঞান অকাতরে বিলিয়েও মেয়েটির মগজ মঠের মুণ্ডিত মস্তক সন্ন্যাসিনীরা ধোলাই করতে পারলেন না। দিন রাত প্রেমিকের কথা ভাবতে ভাবতে একসময় কঠিন অসুখের পড়ল মেয়েটি। সে অসুখ আর ভাল হল না। স্যামলেসর্বেরি হল প্রাসাদেব আশপাশের মানুষ বলে আজও পূর্ণিমার রাতে সেই প্রেমিক ও প্রেমিকার বিদেহী আত্মাদের প্রাসাদের বাগানে হাতে হাত ধরে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। জীবন তাদের যে বাসনা পূরণ করে নি মরণ তাই তাদের উপহার দিয়েছে। কোনও ধর্মমত, কোনও সংকীর্ণতা আজ তাদের পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।

সাইক্‌স বুড়ির পেত্নি ও গুপ্তধন

রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড ও সপ্তম হেনরির আমলে ইংল্যাণ্ডের সেলর ব্রুক গ্রামে ছিল সাইকস লাম্ব ফার্ম নামে এক খামার। ঐ খামারের মালিক মিঃ সাইকস তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে খামারের কাছেই থাকতেন। চাষবাস করে, গোরুর দুধ, মুর্গির ডিম আর শুয়োর বিক্রি করে তাঁরা দু'জনে প্রচুর টাকাকড়ি জমিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সাইকস দম্পতি ছিলেন নিঃসন্তান। অনেকেই তাঁদের জমানো টাকায় ওপর আত্মীয়কুটুমদেব নজর ছিল। আত্মীয় কুটুমরা সেসব নিজেদের ভোগে লাগানোর উদ্দেশ্যে তাঁরা মাঝেমাঝেই এসে জুটতেন, অনেকে আবার থেকেই যেতেন। আত্মীয়দের মনোভাব সাইকস দম্পতির অজানা ছিল না। তাঁরা নানাভাবে তাদের এড়িয়ে চলতেন এবং হাবেভাবে বুঝিয়ে দিতেন যে নিঃসন্তান হলেও নিজেদের কষ্টে জমানো টাকাকড়ি তাঁদের পেছনে খরচ করার বিন্দুমাত্র আগ্রহ তাঁদের নেই।

সে আমলে ব্যাঙ্ক ছিল না। ছিল না শেয়ার বাজারে টাকা লগ্নি করার ব্যবস্থা। সাইকস দম্পতি তাই অনেক ভেবে বড় বড় মাটির কলসিতে তাঁদের টাকাকড়ি পুরে সেগুলো বসতবাড়ির লাগোয়া বাগানে গাছের নিচে পুঁতে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। পাছে ভুলে যান এই ভয়ে গাছের গায়ে ছুরি দিয়ে একটা দাগও দিয়েছিলেন তাঁরা।

একবার গ্রামে কলেরায় মড়ক লাগল। সেই মড়কে গ্রামের বহু লোক মারা গেল। বহু পরিবার রাতারাতি ধ্বংস হয়ে গেল। তখনকার আমলে কলেরার চিকিৎসা মানুষের জানা ছিল না, ডাক্তার হাসপাতালেরও নামগন্ধ ছিল না। গাদাগাদা লোক মরতে মরতে গ্রাম একেবারে উজাড় হয়ে গেল। আজ যে লোক তার প্রতিবেশীকে কবর দিয়ে এল কাল তারই কবব খোঁড়ার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে অবস্থা এমনই দাঁড়াল। সাইকস দম্পতিও এই মড়কের হাত থেকে রেহাই পেলেন না। একই দিনে তাঁরা দু'জনেই মারা গেলেন।

কিছুদিন কেটে গেল। গ্রামে যে ক'জন বেঁচে ছিল তারা আবার আগের মত মেতে উঠল চাষবাসের কাজে। সাইকস দম্পতির মৃত্যুসংবাদ শুনে দূর থেকে আত্মীয়স্বজনেরা এসে এবার হামলে পড়ল।

স্বামী স্ত্রী এতদিন ধরে যে টাকাকড়ি জমিয়েছে সেগুলো নিশ্চয়ই বাড়িতেই আছে ধরে নিয়ে বাড়ির প্রত্যেকটি কোণ, আনাচ কানাচ হাতড়ে বেড়াল তারা, গোয়ালের মাটি খুঁড়ে তছনছ করল। কিন্তু কোনও হদিশ না পেয়ে মুখ চুণ করে খালি হাতে ফিরে গেল।

সময় বয়ে যেতে লাগল। সাইকস দম্পতির মৃত্যুর পরে তাদের পোষা গোরু মুর্গি শুয়োব অনেকদিন আগেই প্রতিবেশীরা নিজেদের কাছে রেখেছিল। এবার যত্ন আর দেখাশোনার অভাবে তাদের পুরোনো বসত বাড়িখানাও ভেঙ্গে পড়তে লাগল। সব ফুলগাছ শুকিয়ে গোটা বাগানটা ন্যাড়া হয়ে গেল। সেটা হয়ে দাঁড়াল গ্রামের ছেলেদের খেলার মাঠ। অবস্থা একসময় এমন দাঁড়াল তখন একখানা আধভাঙ্গা দেয়াল ছাড়া সাইকস দম্পতির বাড়ির আর চিহ্নমাত্র রইল না।

ছেলের দল খেলাধূলো সেরে বাড়ি ফেরার মুখে রোজই দেখে একটা থুত্থুরে বুড়ি সেই আধভাঙ্গা দেয়ালের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর আপনমনে কি যেন বিড়বিড় করছে। কথাটা

বয়স্ক অভিভাবকদের কানে যেতে তারা তাদের ছেলেদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলল। "ওটা সাইকস বুড়ির পেত্নি। খবরদার, ওর ধারে কাছে যাস না।" ছেলেদের কেউ ভয় পেল, কেউ পেল না।

যারা ভয় পেল না তাদের মধ্যে ছিল পল নামে এক সাহসী ছোকরা। কি হয় দেখার জন্য একদিন সে সেই সাইকস বুড়ির পেত্নির কাছে গিয়ে দাঁড়াল, হেসে জানতে চাইল। "ও দিদিমা, তুমি নিজের মনে কি বলছ গা?"

শুনে বুড়ি হাত নেড়ে তাকে কাছে ডাকল। তারপর সেই আধভাঙ্গা দেয়ালের পাশে একটা পুরোনো এল্‌স গাছের গুঁড়ি আঙ্গুল নেড়ে দেখিয়ে আচমকা মিলিয়ে গেল। পলের মাথায় বোখ চাপল। রাতের বেলা বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়লে একখানা কোদাল নিয়ে চুপি চুপি সে হাজির হল সেখানে, তারপর যা থাকে কপালে ভেবে সেই এল্‌স গাছের গোড়ার মাটি খুঁড়ল। কয়েকবার কোদাল মারতেই ঢিপ ঢিপ আওয়াজ কানে এল। কোদাল রেখে হাতের আলো কাছে এনে পল দেখল কোপানো জমির ভেতর থেকে মাটির কলসি উঁকি দিচ্ছে। সাহসে ভর করে সেই কলসি তুলে আনল সে। মুখের ঢাকা সরিয়ে আলো কাছে আনতেই ভেতরেরের একগাদা সোনার মোহর মোমবাতির আলোয় ঝিকমিক করে উঠল। কোপানো মাটি আবার আগের মত বুঁজিয়ে ফেলল পল, তারপর সেই কলসি কাঁধে নিয়ে জোরে পা চালিয়ে চলে এল বাড়িতে, কলসিখানা সোজা বাপের সামনে এনে বলল, "নাও, সাইকস বুড়ো বুড়ির জমানো টাকাকড়ি এতে আছে।"

বলে কলসির ভেতর থেকে একমুঠো মোহর তুলে বাপের হাতে দিল পল।

"যাক্," পলের বাবা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল," এত দিনে তাহলে সাইকস বুড়ো বুড়ির টাকার হদিশ পাওয়া গেল।

সাইকস বুড়ির প্রেতাত্মাকে এবপরে আর দেখা যায় নি।

সাইক্‌স ল্যাম্ব ফার্ম

হোয়াইট হাউসের ভূত ঃ লিংকণের প্রেতাত্মা

ইংলণ্ডের পরে এবার আমেরিকা। ভাবা যায়, সেই কবে ১৮৬৫ তে আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকণ, তারপরেও তাঁর আত্মা হোয়াইট হাউসের মায়া কাটাতে পারে নি? পরবর্তীকালে আমেরিকায় যারা প্রেসিডেন্ট হয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই লিংকণের প্রেতাত্মাকে হোয়াইট হাউসে দেখেছেন।

তবে লিংকণ একা নন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি জন অ্যাডামসের পত্নী শ্রীমতী অ্যাবিগাইলের প্রেতাত্মাকেও প্রায়ই হোয়াইট হাউসে দেখা যায়। বেঁচে থাকতে মহিলা দিনের বেশিরভাগ সময় হোয়াইট হাউসের ইস্টরুমে জামাকাপড় ইস্ত্রি করে কাটাতেন, আজও তাঁর প্রেতাত্মাকে সেই ইস্টরুমের দিকেই যেতে দেখেছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। তবে বিদেহী অবস্থায় ইস্ত্রি করাও যুক্তি বুদ্ধির দিক থেকে সম্ভব নয়। তাই ইস্ট রুমের মায়া কাটাতে না পারলেও শ্রীমতী অ্যাবিগাইল অ্যাডামসের প্রেতাত্মা সেখানে ঢুকে কি করেন তা এখনও জানা যায় নি।

নেদারল্যাণ্ডের মহারাণি উইলহেলমিনা একবার যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি সফরে এসে হোয়াইট হাউসে কিছুদিন অতিথি হয়েছিলেন। একদিন রাতে শুতে যাবার আগে বাইরে থেকে তাঁর দরজায় টোকা দেয়ার অদ্ভুত আওয়াজ হয়। আওয়াজ শুনে রাণি উইলহেলমিনা দরজা খুলে দেখেন রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকণের প্রেতাত্মা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। এতদিন লিংকণের যে চেহারা ফোটোতে দেখে এসেছেন তাঁর বিদেহী প্রেতাত্মার সেই এমন চেহারা—তেমনই ভীষণ রোগা পাতলা ছিপ ছিপে গড়ন, ব্যাকব্রাশ করা একখানা কোঁকড়ানো কালো চুল, চওড়া কপাল। পাখির ঠোঁটের মত সামান্য বাঁকা খাড়া সেমেটিক নাক, গোঁফের সঙ্গে সুন্দরভাবে মেলানো কুচকুচে কালো চাপ দাড়ি, মনের ভেতরের সব কিছু ধরা পড়ে এমনই অন্তর্ভেদী চাউনি দু'চোখে. সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সেই মহান আমেরিকান ব্যক্তিত্বের বিদেহী সত্বাকে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রাণি উইলহেলমিনা ভয় পেলেও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেন, ভদ্রতা বশত তাঁকে সসম্মানে ভেতরে আসতে বলার কথাও তাঁর মাথায় এলনা। কিছুক্ষণ একভাবে রাণির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে লিংকণের প্রেতাত্মা একসময় মিলিয়ে গেলেন, রাণিও দরজা এঁটে ভেতরে এসে শুয়ে পড়লেন। সেই সময় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট্ ছিলেন ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট। পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট টেবলে বসে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টকে রাণি তাঁর আগের রাতের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বললেন। শুনে রাষ্ট্রপতি হেসে বললেন,"ইওর হাইনেস, আপনার বক্তব্য আমি অবিশ্বাস করছি না, শুনে অবাকও হচ্ছি না. কারণ এর আগে আমার স্ত্রীর সামনেও লিংকণ আবির্ভূত হয়েছেন, একই রকম কিছুক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে আচমকা মিলিয়ে গেছেন। আপনার মতই আমার স্ত্রীও যতবার ওঁকে দেখেছেন ততবার এত অভিভূত হয়েছেন যে ওঁর আবির্ভাবের কারণটুকু জিজ্ঞাসা করার কথা ভুলে গেছেন। লিংকণের প্রেতাত্মা অদৃশ্য হবার পরে সেকথা ওঁর মাথায় এসেছে। আপনি এই ব্যাপারকে মোটেও গুরুত্ব দেবেন না। লিংকণ হোয়াইট হাউসের মায়া আজও কাটাতে পারেন নি। এখানকার অনেককেই মাঝেমাঝে উনি দর্শন দিয়ে ধন্য করেন।" রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের এই

বক্তব্যকে সমর্থন করে তাঁর স্ত্রী একাধিক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছেন। রাষ্ট্রপতি লিংকণের শোবার ঘরটিকে তিনি স্টাডি বানিয়েছেন। ঐখানে বসে পড়াশুনো বা লেখাপড়া করতে গিয়ে তিনি বহুবার লিংকণের প্রেতাত্মাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। মাঝেমাঝেই শ্রীমতী রুজভেল্ট অনুভব করতেন স্টাডিতে বসে কাজকর্ম করার সময় লিংকণের প্রেতাত্মা চুপিসাড়ে এসে দাঁড়ান তাঁর পেছনে। অনেক সময় ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখেন তিনি কি পড়ছেন বা লিখছেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই, পেছনে দাঁড়িয়ে থাকতে তাকতে একসময় আচমকা বাতাসে মিলিয়ে যান তিনি। লিংকণের প্রেতাত্মা কোনওদিন শ্রীমতী রুজভেল্টের পড়াশোনা বা লেখালেখির কাজে ব্যাঘাত ঘটান নি। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলার সময় রাষ্ট্রপতি লিংকণ হোয়াইট হাউসের ওভ্যাল রুমে তাঁর অবসর সময় কাটাতেন। সচিব ও পার্শ্বচরেরা লক্ষ্য করতেন খোলা জানালার সামনে দাঁড়িযে বিশাল ব্যক্তিত্বের মানুষটি তাকিয়ে আছেন দূরে ভার্জিনিয়ার দিকে। গৃহযুদ্ধ কবে থামবে এই চিন্তাই যে ঐসময় তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে রাখত তাতে সন্দেহ নেই। লিংকণের আমলের সেই সচিব আর পার্শ্বচরেদের দিনও ফুরিয়েছে বহু আগেই। কিন্তু হোয়াইট হাউসে এখন যাঁরা একালের মার্কিণ রাষ্ট্রপতিদের সঙ্গে দিনরাত ওঠাবসা করেন তাঁরা দেখেছেন লিংকণের প্রেতাত্মা আজও ওভ্যাল রুমে খোলা জানালার এপাশে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছেন বাইরের দিকে। পাছে সামান্যতম শব্দেও ভাবুক রাষ্ট্রপতির বিদেহী সত্ত্বা অদৃশ্য হন একথা ভেবে তারা নিঃশব্দে সরে যায়, কেউ তাঁকে ঘাটায়না।

প্রেতাত্মা কি শুধু মানুষ আর পশুপাখিরই হয়, নিষ্প্রাণ জড়ের কি প্রেতাত্মা হয় না? একশোবার হয়। কয়লার এঞ্জিনে টানা রেলগাড়ি ত আমাদেরও আগে বাতিল হয়ে গেছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে, তবু এপ্রিল মাসে লিংকণের মৃত্যুদিবসে আজও দু'টি ভৌতিক কয়লার এঞ্জিনকে সেদেশের বিভিন্ন রেলপথে চলতে দেখা যায়। এঞ্জিনের বাইরের অংশ চকচকে পেতলের, চিমনি থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায় কিন্তু ভেতরে ড্রাইভার বা ফায়ারম্যান কাউকে চোখে পড়ে না। দু'টি ট্রেনের একটির এঞ্জিন বাদে বাকিটা সাদা কাপড়ে এমনভাবে মোড়া যা দেখলে চলন্ত শবাধার বলে মনে হয়। ট্রেন চলার সময় সেই শবাধারের ভেতর শোকবাদ্য বাজছে স্পষ্ট কানে আসে। দ্বিতীয় এঞ্জিনটির সঙ্গে থাকে শুধু একটি চাকাযুক্ত প্ল্যাটফর্ম। তার ওপর শোয়ানো থাকে সাদা কাপড়ে মোড়া একটি কফিন। কালজয়ী মার্কিণ কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান যাঁকে মার্কিণ জাতিরূপী এক বিশাল জাহাজের ক্যাপ্টেন বলে উল্লেখ করেছিলেন। তাঁরই গুলিবেঁধা মৃতদেহের কফিন নিয়ে ১৮৬৫-তে সাবেক কালের এক কয়লার এঞ্জিন মার্কিণ মুলুকের বিভিন্ন রেলপথে ঘুরে বেরিয়েছিল। লিংকণের মৃত্যুদিবসের প্রতিবছর সেই দৃশ্যেরই পুনরাভিনয় করে বাতিল হয়ে যাওয়া অতীতের সেই কয়লার এঞ্জিনের প্রেতাত্মা। শোনা যায় লিংকণ বেঁচে থাকতে বহুবার স্বপ্নে নিজের আসন্ন মৃত্যুদৃশ্য দেখেছিলেন। দেখেছিলেন একটি কফিনে তাঁর মৃতদেহ শোয়ানো আছে, আর চারপাশে বহু নরনারী অসহায়ভাবে বুক ফাটা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে। স্বপ্নের ভেতর জনগণের মিলিত কান্নার আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলেন তিনি।

লিংকণ রাষ্ট্রপতিপদে থাকাকালীন তাঁর ছোটছেলে উইলি মারা যায়। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি গ্র্যান্টের জমানায় বহুবার উইলির প্রেতাত্মা আবির্ভূত হয়েছে তার জীবিত অবস্থার

আকারে। হোয়াইট হাউসের কর্মচারীদের আর কেউ না চিনলেও রাষ্ট্রপতি গ্রান্টের স্ত্রীর চিনতে ভুল হয় নি। ইশারায় সেই বালকের প্রেতমূর্তিকে দেখিয়ে কান্না জড়ানো গলায় স্বামীকে বলেছেন, "দ্যাখো, এ যে আমাদের উইলি! আহা, বেচারা এখনও ঐটুকুই আছে, বয়স এতটুকু বাড়ে নি।"

রাষ্ট্রপতি গ্র্যান্টের মৃত্যুর পরে দশদিন পূর্ণ হবার আগেই মারা যান তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী গ্র্যান্ট। শ্রীমতী গ্র্যান্ট মারা যাবার পরে তাঁর ননদ শ্রীমতী মেরি গ্র্যান্ট ক্র্যামারের লেখা পড়ে জানা গেছে মারা যাবার আগে তাঁর ভাইয়ের বউ শ্রীমতী গ্র্যান্ট সূক্ষ্ম দেহে স্বপ্নের ভেতর তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন। শ্রীমতী ক্র্যামারের ভাষায়। .....আমি তখন নিউ জার্সির ইস্ট অরেঞ্জ-এ আমার বোন ভার্জিনিয়া গ্র্যান্ট করবিনের কাছে ছিলাম। একদিন রাতে স্বপ্নে দেখলাম আমার বৌদি আমার খাটের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমার কাঁধে হাত রেখে আবেগ ভরা গলায় বলছেন "মেরি, আমি আর বেশি দিন তোমাদের মধ্যে থাকব না। তাই যাবার আগে তোমায় দেখতে এলাম, আমায় হাসি মুখে বিদায় দাও।"

শ্রীমতী ক্র্যামারের বোনের বাড়িতে ঐ সময় শ্রীমতী ক্যাথরিন লরেন্স নামে এক অতিথিও ছিলেন। সকালবেলা ব্রেকফাস্ট খেতে বসে এসব কথা বলাবলি করছিলেন তাঁরা। অতিথি শ্রীমতী লরেন্সও সেখানে ছিলেন। শ্রীমতী ক্র্যামারের মুখ থেকে স্বপ্নের বিবরণ শুনে তিনি জানালেন, কাল রাতে আমিও ঐরকম স্বপ্ন দেখেছি। স্পষ্ট দেখলাম রাষ্ট্রপতির সমাধিস্থলের পাশে আপনি আর আপনার বোনের পাশে আমি দাঁড়িয়ে আছি। প্রচুর লোক সেখানে ফুলের মালা হাতে ভিড় করেছে, কাছেই আরেকটা কবর খোঁড়া হচ্ছে। খানিক বাদে একাট ঢাকা গাড়িতে চেপে একটা কফিন এসে পৌঁছোল সেখানে, শুনলাম সবাই বলাবলি করছে ঐ কফিনের ভেতর আছে শ্রীমতী গ্র্যান্টের মৃতদেহ।"

দু'জনের এই স্বপ্ন দেখার ঠিক সাতদিন বাদে শ্রীমতী গ্র্যান্ট হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তাঁর কবর দেবার সময় তাঁর দুই ননদের সঙ্গে শ্রীমতী লরেন্সও উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী লরেন্স স্বপ্নে যেমনটি দেখেছিলেন ঠিক সেইমতন রাষ্ট্রপতির সমাধিস্থলের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা।

লিংকনের পরে হোয়াইট হাউসে বিচরাশীল প্রেতাত্মাদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতি কুড়িয়েছেন ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি ম্যাক্সিনের স্ত্রী ডলির .প্রেতাত্মা। ডলি ছিলেন সৌখিন বাগান বিশারদ, হোয়াইট হাউসের ভেতরের সবকটি লন আর ফুলের বাগান নিজের পছন্দমত গড়েছিলেন তিনি। ডলির মৃত্যুর পরে রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনের জমানায় তাঁর দ্বিতীয় পত্নী হোয়াইট হাউসে এসেই ডলির বাগান দেখে নাক কোঁচকালেন।

উনবিংশ শতাব্দীর রুচি অনুযায়ী সুসজ্জিত বাগান তাঁর পছন্দ হল না। মালিদের ডেকে কেটে ছেঁটে বাগানের হাল পাল্টানোর হুকুম দিলেন তিনি। বিশ্বাস করা না করা যার যার ইচ্ছা, তবে শোনা যায় মালিরা রাষ্ট্রপতির স্ত্রীর সেই হুকুম তামিল করতে যেতেই সেইসব বাগানের রূপকার ডলি ম্যাডিসনের আত্মাকে দেখা দেন, তাঁর সৃষ্টি ধ্বংস করতে মালিরা প্রবৃত্ত হয়েছে দেখে বকুনি দিয়ে ধমকে তাদের তুলোধোনা করেন। প্রেতাত্মার ধমক খেয়ে মালিরা কাজ বন্ধ করে শ্রীমতী উইলসনকে জানায় তাঁর ঐ হুকুম তারা কোন মতেই তামিল করতে পারবে না।

ডলির প্রেতাত্মা এসে মালিদের ধমকেছেন শুনে তিনি নিজেও ঘাবড়ে যান। পাছে তাঁর ওপর প্রেতাত্মা ক্রুদ্ধ হন এই ভয়ে মালিদের বলেন তারা যেন বাগান যেমন ছিল তেমনই রেখে দেয়।

শ্রীমতী পার্কস নামে এক যুবতী হোয়াইট হাউসে দরজির কাজ করতেন। গ্রেট ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ ফার্মি যুক্তরাষ্ট্র সফরে আসার কিছুদিন আগে ওপরওয়ালা তাঁকে ডেকে রানির বিছানায় পাতার জন্য একটি নতুন চাদর তৈরি করার হুকুম দেন।

একা নিজের ঘরে বসে নতুন চাদরের কোণে সেলাইয়ের নকসা তুলছিলেন শ্রীমতী পার্কস, এমন সময় স্পষ্ট অনুভব করলেন ঘরে তিনি একা নন কে যেন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে পেছন থেকে। ঐ অনুভূতি হবার সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে তাঁর ঘাড়ে কার ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস পড়ল। সেই নিঃশ্বাসের ছোঁয়ায় তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভয়ে কেঁপে উঠল থরথর করে। ঘাড় তুলে পেছন দিকে তাকানোর সাহস সেই মুহূর্তে তাঁর ছিল না। হাতের কাজ বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে শ্রীমতী পার্কস দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। সেবার ঐ চাদর রানির বিছানায় আর পাতা হয় নি। হাতের সে কাজ শেষ করতে তাঁর পুরো লেগেছিল পুরো তিনটি বছর।

শ্রীমতী পার্কস-এব মত হোয়াইট হাউসে আরও প্রচুর নিচুস্তরের আবাসিক কর্মচারি আছেন যাদের অনেকেই সেখানকার একেকটি ঘরে কাজ করতে গিয়ে ফিসফাস কথাবার্তা নরনারীর প্রেমালাপ, নয়ত ছাদফাটানো অট্টহাসি। শুনে চমকে উঠেছেন। অথচ ঘরের ভেতর যে ছিল না সেবিষয়ে নিশ্চিত তাঁরা সবাই।

মাদাম জুমেলের ভুতুড়ে বাড়ি

নিউইয়র্কেব হাল ফ্যাশনের হাইরাইজ অ্যাপার্টমেন্টের ফাঁকফোকরে সাবেক কালের যেসব সুশ্রী গড়নের বাড়ি এখনও গা বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাদের একটির নাম লোকের মুখে মুখে হয়ে গেছে মাদাম জুমেলের বাড়ি। অনেকেই বলে বেড়ায় প্রথম মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াশিংটনের এক অবৈধ কন্যা ছিল, পরবর্তীকাল সমাজে হয়েছিল পরিচিত মাদাম জুমেল নামে। ভূতবিশ্বাসীরা বলে বেড়ায় মারা যাবার পর মাদাম জুমেলের অতৃপ্ত প্রেতাত্মা তার বাড়িতেই ঘুরে বেড়ায় এবং কখনও কখনও তাকে দেখাও যায়। মাদাম জুসেল মারা যাবার পরে ইতিহাস প্রেমীদের উদ্যেগে মার্কিণ সরকার বাড়িটি নিজেদের দখলে আনেন এবং ইতিহাস-প্রেমীদের উৎসাহপূর্ণ মদতে সেখানে মার্কিণ বিপ্লবের সংগ্রহশালা গড়ে তোলেন।

ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাতে জেনারেল ওয়াশিংটন ফরাসিদের সঙ্গে যুগ্মভাবে বা প্রচণ্ড ভাবে স্বাধীনতার যুদ্ধ লড়েছিলেন তার বিস্তারিত সুখপাঠ্য বিবরণ সেখানে আছে সেই সঙ্গে আছে স্বাধীনতার যুদ্ধে ব্যবহৃত নানারকম আগ্নেয়াস্ত্র, গোপন কূটনৈতিক চিঠিপত্রের প্রতিলিপি, জেনারেল ওয়াশিংটনের সেনাবাহিনীর পোষাক পরিচ্ছদ, এইসব ১৯১৪ সালের ৭ই জানুয়ারি তারিখে স্থানীয় এক স্কুলের একদল ছাত্রীকে ঐ সংগ্রহশালা দেখাতে নিয়ে আসেন শ্রীমতী ফিট্‌্ডজেরাও নামে স্কুলের জনৈক শিক্ষিকা।

সংগ্রহশালার দরজা খোলা হয় সকাল এগারোটায়। ঠিক সময় জানা ছিল না তাই শিক্ষিকা ছাত্রীদের নিয়ে অনেক আগেই পৌঁছেছিলেন সেখানে। এগারোটা বাজতে তখনও দেরীছিল

তাই মেয়েরা সংগ্রহশালার লাগোয়া বাগানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে অপেক্ষা করছিল। দশটা চল্লিশ নাগাদ সংগ্রশালার কিউরেটর শ্রীমতী এমা ক্যাম্পবেল এস পৌঁছোলেন। গাড়ি থেকে নেমে মেয়েদের লক্ষ করে তিনি বললেন, "তোমাদের আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, বাছারা। এ-বাড়ির সব চাবি থাকে বাগানের মালি জন ডাফির কাছে, ও না এসে পৌঁছোনো পর্যন্ত বাড়ির ভেতরে ঢোকা যাবে না। তোমরা এতক্ষণ বসে আছো, আরেকটু সময় অপেক্ষা করো। ডাফি খানিক বাদেই আসবে।"

"মালিকে দিয়ে কি দরকার," মেয়েদের মধ্যে একজন বলে উঠল। "দোতলায় যে বুড়ি ভদ্রমহিলা থাকেন ওঁর কাছে চাবি নেই? উনিও ত নিচে এসে দরজা খুলে দিতে পারেন।"

বুড়ি ভদ্রমহিলা! "শ্রীমতী ক্যাম্পবেল অবাক হলেন," কার কথা বলছ তোমরা?

'কেন,' দোতলার ঘেরা বারান্দা ইশারায় দেখাল মেরেটি, "খানিক আগে ওখানে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন?"

"ভুল" ছেলেমেয়েদের শ্রীমতী ক্যাম্পবেল বললেন, "এটা সংগ্রহশালা, এখানে কোনও বুড়ি বা বুড়ো থাকে না।" মেয়েটি আর কথা না বাড়িয়ে তখনকার মত চুপ করে গেল। কিন্তু চুপ করলেও সে সত্যিই একজন বুড়িকে দোতলার ঝুল বারান্দায় দাঁড়াতে দেখেছে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না শ্রীমতী ক্যাম্পবেলের মনে। বুঝলেন, মেয়েটি শ্রীমতী জুমেলো প্রেতাত্মাকে দেখেছে। বেঁচে থাকতেও জীবনের ওপর মাদাম জুমেলের ছিল বড্ড মায়া। যে মায়ার বাঁধনে বাঁধা পড়ে তিনি তিরানব্বই বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। সুখে শান্তিতে জীবন কাটাবেন এই স্বপ্নের রেশ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চোখে লেগে থাকলেও জীবনে কোন দিন শান্তির মুখ দেখেন নি তিনি। শোনা যায় সদ্যগঠিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উপ রাষ্ট্রপতিকে বিয়ে করায় পথ সুগম করতে আহত স্বামীর গায়ের ব্যাণ্ডেজ তিনি ছিঁড়ে ফেলেছিলেন যাতে খোলা হাওয়ার সংস্পর্শে এসে তাঁর ক্ষতস্থানে বীজাণু সংক্রমণ হয়। হ্যাঁ, ঐভাবে নিজের স্বামি স্টিফেন জুমেলাকে দ্রুত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিলন মাদাম জুমেল। স্বামীর মৃত্যুর পরে অ্যারণ বারকে বিয়ে করেন তিনি। অ্যারণের বয়স তখন আটাত্তর আর মাদাম জুসেলের আটান্ন। দ্বিতীয় বিয়েও প্রবৃত্তিতাড়িত। এই মহিলার দ্বিতীয় বিয়েও যে সুখের হয়নি তা বলাই বাহুল্য। স্বামীর বিষয় সম্পত্তি হাতিয়ে মুক্ত জীবন কাটানোর উদ্দেশ্যে ব্যভিচারের মিথ্যে অভিযোগ এনে তিনি দ্বিতীয় স্বামীর বিরুদ্ধে ডিভোর্সের মামলা রুজু করেন। আদালত ডিভোর্সের আবেদন মঞ্জুর করার এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁর দ্বিতীয় স্বামী অ্যারণ বার হৃদরোগে মারা যান। ভূতপূর্ব মার্কিণ উপরাষ্ট্রপতির বিপুল সম্পত্তি এরপর আসে মাদাম জুমেলের হাতে। আসে খ্যাতি আর প্রতিপত্তি। কিন্তু এসবের মধ্যে ডুবে থেকেও যার হদিশ তিনি পাননি তার নাম শান্তি। ১৮৬৮ সাল নাগাদ তিরানব্বুই বছর বয়সে মাদাম জুমেল মারা যান। মারা যাবার পরেও ঐ বাড়ির মায়া কাটাতে পারেনি তাঁর প্রেতাত্মা। দিনেরাতে যখন তখন বাড়ির যেকোন প্রান্তে তাঁর আবির্ভাব আজও ঘটে।

ওল্ড স্ট্র প্লেস

ইংরেজিতে স্ট্র মানে খড় হলেও যে বাড়ির কথা বলছি তা কিন্তু খড়ের তৈরি নয়, ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে যিনি বাড়িটি তৈরি করেছিলেন তাঁর নাম গিডিয়ন স্ট্র, তাঁরই পদবি অনুযায়ী বাড়ির নামকরণ। যুক্তরাষ্ট্রের মেইন-এর নিউফিল্ড এলাকায় অবস্থিত ঐ বাড়িতে যে গিডিয়ন স্ট্র-র মেয়ে হান্নার প্রেতাত্মা আজও ঘুড়ে বেড়ায় তা স্থানীর লোকদের কারও অজানা নয়।ওল্ড স্ট্র হাউস বাড়িটির রান্নাঘরের ফলকে খোদাই করা কয়টি শব্দের বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ার এখানে ঘুমিয়ে আছে হান্না মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে যে পৃথিবীর মায়া কাটিয়েছে ২রা মার্চ, ১৮২৬।"

ফলকটি দেখে সমাধি ফলক বলে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আর তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে ঐ ফলকের নিচেই হান্না নামে এক যুবতীর মৃতদেহ কবর দেয়া হয়েছিল।

সাধারণত গির্জার লাগোয়া বা আশপাশের সমাধিক্ষেত্রেই কবর দেবার রীতি, কিন্তু এক্ষেত্রে সে রীতি কেন লঙঘন কবা হয়েছিল সে প্রশ্ন মনে ওঠা খুব স্বাভাবিক। এ প্রশ্নের উত্তরে প্রাকৃতিক দুর্যোগকেই দায়ী করতে হয়, ধরে নিতেই হয় হান্নার মৃতদেহ কবর দেবার সময় প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি আর তুষাড় ঝড়ে গোটা এলাকা গিয়েছিল ঢেকে। হয়ত সেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ দীর্ঘস্থায়ী হবার ফলে মৃতদেহ সংরক্ষণ করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় মৃতদেহ সংরক্ষণ করার পদ্ধতি নিয়ে সাধারণ মানুষের মাথা ঘামানো সম্ভব ছিল না এও সত্যি। এইসব অনুমানের কথা মনে রেখেই ধরে নিতে হয় হান্নার অভিভাবক ও নিকটাত্মীয়েরা তার মৃতদেহ বাড়ির ভেতরে সমাধিস্থ করেছিল। হয়ত রান্নাঘরটি ছিল হান্নার খুবই প্রিয়, সুস্থ অবস্থায় দিনের বেশির ভাগ সময় সেখানেই কাটাত সে, তাই সেখানেই তার মৃতদেহ সমাধিস্থ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বাড়ির লোকেরা। খুব বেশি আগের কথা নয়। ১৯৫৮ সালে ড্যারেল ম্যাকফলিন নামে একটি লোক ওল্ড স্ট্র হাউস কিনে ফেলল। ড্যারেলের লেখা ডায়েরি থেকে পরে জানা গেছে রান্নাঘরটি ছিল তার শোবার ঘরের মুখোমুখি। ড্যারেল তার ডায়েরিতে সুস্থ মাথায় যা লিপিবদ্ধ করেছে তার মর্ম হল, রোজ রাতে সে দেখত রান্নাঘরের ভেতর কোথা থেকে খানিকটা সাদা ধোঁয়া এসে ঢুকে পড়ত। দেখতে দেখতে সেই ধোঁয়ার পুঞ্জ এক রূপবতী যুবতীতে পরিণত হল। লঘু পায়ে সেই যুবতী রান্নাঘরে হাঁটাচলা করত। কখনও মুখ তুলে তাকাত আর সেই মুহূর্তে বন্ধ কাঁচের জানালার ওপাশে ড্যারেলের চোখে তার চোখ পড়ে যেত। যুবতী যে হান্নার প্রেতাত্মার সে সম্পর্কে কোনও সন্দেহ ছিল না ড্যারেলের মনে। চোখে চোখ পড়তেই সে কম্বলে মাথা পর্যন্ত ঢেকে শুয়ে পড়ত চোখ বুঁজে। হয়ত যুবতী অবস্থায় পৃথিবীর মায়া কাটানোর ফলেই রসবোধের অভাব তার প্রেতাত্মার ছিল না। ড্যারেল তাকে দেখে ভয় পেয়েছে টের পেয়ে সে এসে ঢুকে পড়ত শোবার ঘরে। ড্যারেলের মুখ থেকে কম্বল সরিয়ে সরু সরু ঠাণ্ডা আঙ্গুলে সুড়সুড়ি দিত তার নাকে কানে। কখনও বা দু'আঙ্গুলে তার নাক টিপে দিত। গোড়ায় ভয়ে আধমরা হয়ে পড়ে থাকলেও ধীরে ধীরে এই ভৌতিক রসিকতা ড্যারেলের গা-সওয়া হয়ে গেল। ডায়েরিতে ড্যারেল লিখেছে আহা বেচারি, কত অপূর্ণ সাধ আহ্লাদ নিয়ে অকালে পৃথিবীর মায়া কাটাতে হয়েছে। আমার চোখে মুখে গায়ে হাত বুলিয়ে সে যদি কিছু শান্তি পায় তাতে

আমিই বা ভয় পাচ্ছি কেন? এত রীতিমত বোকামি? ড্যারেলের ভাষা পড়ে মনে হয় সুযোগ পেলে হান্নার প্রেতাত্মার সঙ্গে প্রেম ভালবাসার সম্পর্ক পাতাতে পিছু হটত না সে। কিন্তু হান্নার প্রেতাত্মা তার সঙ্গে একদিনও বাক্য বিনিময় করেছে কিনা ডায়েরিতে তা উল্লেখ করেনি ড্যারেল। যাই হোক, ড্যারেলের দুর্ভাগ্য শেষ পর্যন্ত যুবতী হান্নার প্রেতাত্মার সঙ্গে তার রোমান্স জমে ওঠেনি। সে নিজে ছিল খনি বিশারদ। এক বন্ধুর সঙ্গে অংশীদারি ভিত্তিতে টিনের খনি কিনতে সে চলে যায় বলিভিয়ায়। যাবার আগে ওল্ড স্ট্র হাউস বিক্রি করে দেয়। ড্যারেলের কাছ থেকে বাড়িটি কেনেন মার্থা লুইস নামে জনৈক শিক্ষিকা। তাঁর একমাত্র ছেলের বিয়ে হয় ঐ বাড়িতে, বিয়ের কিছুদিন পরে আবার শুরু হয় ভৌতিক উপদ্রব। শ্রীমতী লুইসের ছেলের বউ আয়নার সামনে বসে সাজগোজ করার সময় অন্য একটি মেয়ের মুখ প্রায়ই দেখতে পেত। অথচ ঘাড় ফিরিয়ে ঘরের ভেতর আর কাউকেই তার চোখে পড়ত না। পুত্রবধূটি বেশি দিন বাঁচেনি, বিয়ের বছর খানেক বাদে টাইফয়েডে ভুগে সে মারা যায় ঐ বাড়িতেই। মৃত্যুর পরে বৌটির স্বামী আর শাশুড়ি দু'জনেই লক্ষ্য করেন তার চেহাবা পাল্টে গেছে। চোখ, নাক, ঠোঁট সব পাল্টে এক অচেনা যুবতীর চেহারা নিয়েছে। বৌটির মৃতদেহ নিয়ে সমাধিক্ষেত্রের দিকে সবাই রওনা পড়ে। শ্রীমতী লুইস স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলেন রান্নাঘরে কে যেন ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সারারাত ধরে সেই কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন তিনি।

ভার্জিনিয়ার বাচ্চা ভূত

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের অন্যতম বীর সেনানী জেনারেল হেনরি লী-র বিশাল বাড়িটি ভার্জিনিয়ার আলেকজান্দ্রিয়ার এক ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য। ১৮৬২ সালে বিখ্যাত ব্যাংকার হেনরি কথ্ সপরিবারে থাকবেন বলে বাড়িটি কিনে নেন। ঐ বছরেরই ১০ই জুন স্ত্রী আর একমাত্র ছেলে উইলিয়ামকে নিয়ে মিঃ কথ্ নতুন বাড়িতে এসে ওঠেন। উইলিয়ামের বয়স মাত্র সাত. স্কুলে যেতে তার এখনও দেরি আছে, নতুন বাড়ির প্রশস্ত পরিবেশে হৈচৈ আর দৌড় ঝাঁপ করেই দিনের বেশির ভাগ সময় কাটায় সে।

নতুন বাড়িতে আসার পর ঘটতে লাগল অদ্ভুত সব ঘটনা। ছোট ছোট পায়ে জোরে বাচ্চা ছেলের দৌড়ে আসার শব্দ শুনে মিঃ কথ্ আর তাঁর স্ত্রী ভাবেন এ নিশ্চয়ই তাঁদের ছেলে উইলিয়ামের পায়ের আওয়াজ। কিন্তু সামনের দিকে তাকিয়ে কাউকে তাঁদের চোখে পড়ে না। খানিক বাদে দেখেন উইলিয়াম অন্যদিক থেকে হাঁটতে হাঁটতে আসছে, নয়ত চুপটি করে বসে আছে শোবার ঘরে। অবাক হয়ে মিসেস কথ্ জানতে চান, "খানিক আগে তুই দৌড়োচ্ছিলি?"

'কই, না ত,' জবাব দেয় উইলিয়ম, তার চোখের দিকে তাকিয়ে মিসেস কথ্ বুঝতে পারেন সে সত্যি কথাই বলছে।

ছেলের জবাব শুনে ধন্দে পড়ে যান মিসেস কথ্, উইলিয়াম না হলে পায়ের আওয়াজ আর কার হতে পারে ভেবে-পাননা তিনি ; বাড়িতে ত ছোট বাচ্ছা আর কেউ নেই।

নতুন বাড়িতে আসার ক'দিন বাদে সকালে দুধ দিতে এসে গোয়ালা জানতে চাইল, "আপনারা এ বাড়ি কিনেছেন?"

"হ্যাঁ," মিসেস কখ্ বললেন, "বাড়িটা দেখেই আমার কর্তার খুব পছন্দ হল তাই কিনে ফেললেন,"

"কিনেছেন খুব ভাল কথা," গোয়ালা বলল, "ভাল, শুধু—"

"শুধু কি?" তার কথার ধরনে ভাবনায় পড়লেন মিসেস কখ্।

"বলছিলুম এই ক'দিন কোনও বাচ্চার দৌড়ঝাঁপ আর হাসির আওয়াজ শোনেন কি?"

"শুনেছি বই কি," মিসেস কখ্ বললেন, "ঘরের কাজকর্ম করতে গিয়ে কতবার যে শুনি তার ঠিক নেই, আমার নিজের একটাই ছেলে। মাঝেমাঝে মনে হয় এসব ওরই কাজ। কিন্তু আওয়াজ শোনার পর ছেলেকে খুঁজতে গিয়ে দেখি সে অন্য কোথাও বসে নয়ত শুয়ে আছে। বাড়িতে ত আর কোনও বাচ্চাকে দেখিনি তাই ঐ পায়ের আওয়াজ আর হাসি কার ভেবে পাইনা।"

"ভয় পান নি ত, তাহলেই হল," বলতে বলতে গোয়ালা এগোয়, "বাচ্চাটা খুব ভাল, কাউকেই কিছু বলে না। ভয়ও দেখায় না। আপন মনে দিনভর গোটা বাড়িতে শুধু দৌড়ঝাঁপ করে বেড়ায়।" আপনাদেরও ঘরের ছেলের মতই হয়ে যাবে।" বলে সে আর দাঁড়ায় না, সাইকেল চালিয়ে উধাও হয় সামনে থেকে।

পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার না হওয়ায় খচখচানির একটা অস্বস্তি রয়েই গেল মিসেস কখের মনে। গোয়ালা লোকটাও কেমন যেন, ঝেড়ে কাশতে জানে না। যা কিছু বলল সব ভাসাভাসা।

প্রতিবেশী মহিলাদের মুখ থেকে মিসেস কখ্ শুনেছেন জাতির জনক জেনারেল জর্জ ওয়াশিংটন স্বাধীনতার যুদ্ধ চলাকালীন এই বাড়িতে ফরাসি জলদস্যু সর্দার মঁসিয়ে লাফায়েতের সঙ্গে একাধিকবার গোপনে বৈঠক করেছেন, ব্রিটিশ রাজশক্তি টেরও পায়নি। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে জেনারেলে ওয়াশিংটনের সৈনিকদের পাশে দাঁড়িয়ে ফরাসি জলদস্যুরাও ইংরেজদের বিরুদ্ধে লডাই করেছে এই বিচিত্র খবর জানে ক'জনে! প্রতিবেশী মহিলাদের মুখ থেকেই মিসেস কখ্ শুনেছেন আজও নির্দিষ্ট দিনে রাতের বেলা জেনারেল ওয়াশিংটন আর মঁসিয়ে লাফায়ের অশরীরীর আত্মার আবির্ভাব ঘটে এ বাড়িতে। অতীতের গোপন বৈঠকের পুনরাভিনয় করেন তাঁরা। তাঁদের বৈঠক যতক্ষণ চলে ততক্ষণ ওয়াসিংটনের বাহিনীর পোষাক পরা দু'জন দেহরক্ষিকে বসার ঘরের দরজায় বাইরে আর জানালায় নিচে পারদারের মূর্তির মত পাহারা দিতে দেখা যায়—তাদের হাতে সেকেলে গাদা বন্দুক, পরনে জীর্ণ উর্দি তারাও অশরীরী। বৈঠক শেষে ভোজবাজির মত সবাই একসঙ্গে উধাও হয়। এসব শুনে মিসেস কখ্ পুলকিত হন। কল্পনায় দেখতে পান তাঁর মুখ থেকে এসব শোনার পর তাঁর ব্যবসায়ী বুদ্ধি সম্পন্ন পতি দেবতাটি জর্জ ওয়াসিংটনের প্রেতাত্মা দেখিয়ে প্রচুর টাকা কামানোর বুদ্ধি বের করবেন। কিন্তু কথা প্রসঙ্গে বাড়ির ভেতর বাচ্চা ছেলের আওয়াজ প্রসঙ্গে প্রতিবেশী মহিলাদের কোনও প্রশ্ন করতে তিনি বেমালুম ভুলে গেছেন সেজন্য আক্ষেপও হয় নিজের ওপর।

খেয়ে দেয়ে দুপুরবেলা কৌচে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন মিসেস কখ্, ছেলে নার্সারি ঘরে কাঠের ঘোড়ার পিঠে চেপে দুলছে আপনমনে এমন সময় জোরে বেজে উঠল কলিংবেলের ঘন্টা।

মিসেস কখের দু'চোখ ঘুমে জুড়ে এসেছিল ঘন্টায় আওয়াজে সে ঘুম বিদেয় হল। কৌচ থেকে নেমে সদরে দরজার দিকে যাবার সময় নার্সারি ঘরে উঁকি দিয়ে দেখেন ছেলে কখন

নেমে পড়েছে কাঠের ঘোড়ার পিঠ থেকে, খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে কি যেন বলছে সে বিড়বিড় করে। পা চালিয়ে বারান্দায় এলেন মিসেস কখ্, কয়েক পা এগিয়ে ফটক খুলেই অবাক। বাইরে কোথাও কেউ নেই, পথঘাট নির্জন একটি লোকও ধারে কাছে নেই, তাহলে কে বাজাল কলিংবেল? ফটক বন্ধ করে ঘরে ফিরে এলেন মিসেস কখ্, এ যে আশপাশের বাড়ির কোনও দুষ্টু ছেলের কাজ তাতে সন্দেহ নেই। শোবার ঘরে ঢুকতে যাবেন এমন সময় উইলিয়াম এসে দাঁড়াল সামনে, যেন তাঁকে শুনিয়ে আপন মনে বলে উঠল "ভারি দুষ্টু ছেলে, ভারি বজ্জাত!"

"ওমা! কার কথা বলছিস?" অবাক হয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকালেন মিসেস কখ্।

"ঐ টিমের কথা বলছি," উইলিয়াম বলল।

"খানিক আগে জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে আমার বলল, দ্যাখ, ঘন্টা বাজিয়ে তোর মার কাঁচা ঘুম এখুনি ভাঙ্গিয়ে দিচ্ছি। আমি মানা করলুম, কিন্তু ও শুনল না, ছুটে হাওয়ার বেগে গেটের বাইরে চলে গেল, দড়ি টেনে ঘন্টা বাজিয়ে আবার ফিরে এল। আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে কোথায় যেন চলে গেল।"

"কাদের ছেলের কথা বলছিস?" ছেলের কথা শুনে উদ্বিগ্ন হলেন মিসেস কখ্, "কে টিম্, কাদের ছেলে? কোন বাড়িতে থাকে?"

"টিম এ বাড়িতেই থাকে।" আচমকা গম্ভীর হলায় বলল উইলিয়াম, "যখন তখন একটা পুঁচকে বাচ্চা দৌড় ঝাঁপ করে বেড়ায় শুনতে পাওনা?"

"টিমের বাবার নাম কি?"

"জেনারেল হেনরি লী।" একই বকম গম্ভীব গলায় জবাব দিল উইলিয়াম। "বুঝেছি কাব কথা বলছিস," অদৃশ্য শিশুর নামধাম ছেলের কাছ থেকে জানতে আগ্রহী হলেন মিসেস কখ্, "কিন্তু তাকে আমরা দেখিনি কখনও, তুই দেখলি কি করে?"

"কেন, টিম ত সবার সামনেই ঘুরে বেড়ায়," উইলিয়াম বলল, "আমি ত স্পষ্ট দেখি ওকে, খুব ছোটবেলার সিঁড়ি দিয়ে. নিচে পড়ে গিয়ে ওর মাথা ফেটে গিয়েছিল, তাতেই ও মাবা যায়। সেই থেকে টিম এ বাড়িতে আছে। ওর কপালের পাশে একটা কাটা দাগ আছে।" তাহলে এই ব্যাপার যে দৌড়ঝাঁপ করে বেড়ায় আসলে একটা বাচ্চাভূত। আর সেই বাচ্চাভূতের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছে উইলিয়াম? কথাটা মনে হতেই আতংকে মিসেস কখের বুকের ভেতরটা হিম হয়ে এল। ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে তার কপালে আর বুকে আঙ্গুল দিয়ে পবিত্র ক্রস চিহ্ন আঁকলেন। শোবার ঘরের এককোণে টাঙ্গানো মেরি মাতার ছবির সমানে এসে ছেলেকে কোলে নিয়ে আকুল প্রার্থনা জানালেন যাতে অশরীরী উপদ্রবের ছিটেফোঁটা তার গায়ে না লাগে। প্রার্থনা সেরে ছেলেকে এক কৌচে শুইয়ে দিলেন, পাশে বসে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন তার গায়ে মাথায়। খানিক বাদে ঘুমিয়ে পড়ল উইলিয়াম। ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্যের নামে স্বামী শেষকালে একগাদা টাকা খরচ করে একটা ভূতের বাড়ি কিনেছেন বলে ভারি রাগ হল তাঁর ওপর।

সন্ধের পর ব্যবসার কাজকর্ম চুকিয়ে মিঃ হেনরি কখ্ বাড়ি ফিরে এলেন রাতে, খেতে বসে দুপুরের ঘটনা তাঁকে শোনালেন মিসেস কখ্, দেরি না করে গির্জার থেকে একজন পাদ্রি এনে বাড়ির সবখানে ঝাড়ফুঁক করাতে বললেন স্বামীকে, সেই সঙ্গে ছেলের গলায় কবচ তাবিজ

ঝোলানোর অনুরোধ করলেন। মিঃ কথ্ ব্যবসায়ী মানুষ ভূতপ্রেতে তাঁর বিশ্বাস তেমন নেই, তাই বৌয়েব কথার খুব একটা গুরুত্ব দিলেন না। মিসেস কথ্ কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজে উড়িয়ে দিলেন না। পরদিন তিনি নিজেই গির্জা থেকে একখানা মন্ত্রপুত ক্রস-এর লকেট জোগাড় করে হার সমেত পরিয়ে দিলেন ছেলের গলায়।

ভূতপ্রেতেব ব্যাপার নিয়ে অযথা মাথা ঘামানোর সদুপদেশ দিয়ে পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে মিঃ কথ্ কাজে বেরিয়ে গেলেন। ছেলের কথা যাচাই করতে মিসেস কথ্ ফটকে তালা এঁটে এলেন এক প্রতিবেশী মহিলার বাড়িতে, একথা সেকথার পর জেনারেল হেনরি লী-র প্রসঙ্গ তুললেন, জানতে চাইলেন টিম নামে তাঁর কোনও ছেলে ছিল কিনা।

"টিমের ভাল নাম ছিল টিমথি," প্রতিবেশী মহিলা অবাক হয়ে বললেন, "কিন্তু ওর কথা আপনি জানলেন কি করে? ছেলেটা দেখতে ছিল সুন্দর ফুটফুটে, স্বভাব ছিল খুব চঞ্চল। যতক্ষণ জেগে থাকত শুধু দৌড়ঝাঁপ করে বেড়াত বাড়ির ভেতর। জেনারেল লীর স্ত্রী ছিলেন নিত্যরুগি, দিনের বেশিরভাগ সময় শুয়েই কাটাতেন। তাঁর একমাত্র সন্তান টিম মানুষ হত নিগ্রো আয়ার কাছে। একবার আয়ার চোখ এড়িয়ে টিম সিঁড়ির রেলিং বেয়ে ওঠানামা করছিল, টাল সমলাতে না পেরে দোতলার সিঁড়ির ওপর থেকে তার কচি শরীরটা একতলার সানে আছড়ে পড়ে। কপাল কেটে ঘিলু বেরিয়ে আসে। রক্তে চারদিক ভেসে যাচ্ছিল, তার মধ্যে বেচারার শরীরটা অসহায়ভাবে পড়েছিল। চিকিৎসার কোনও ত্রুটি হয় নি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব প্রচেষ্টাকে হার মানিয়ে টিম মাত্র তিন চার বছর বয়সে পৃথিবীর মায়া কাটাল, তার মার বাচ্চকাচ্চা হবার আর সম্ভাবনা ছিল না। আদরের ছেলেকে হারিয়ে জেনারেল পাগলের মত অস্থির হয়ে উঠলেন, সামারিক বিভাগ থেকে অবসর নিয়ে বাড়ি বেচে বৌকে নিয়ে চলে গেলেন ব্রাজিলে, বড় ভাইয়ের কাছে। জীবনের শেষ দিন গুলো সেখানেই কাটিয়েছেন তিনি।" এইটুকু বলে প্রতিবেশী মহিলা থামলেন, মিসেস কথের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জানতে চাইলেন, "ব্যাপার কি বলুন ত, মিসেস কথ্? আপনি টিমের নাম জানলেন কিভাবে? যদি অস্বাভাবিক কিছু ঘটে থাকে ত নিঃসংকোচে খুলে বলতে পারেন। আমরা আপনাদের প্রতিবেশী, সাধ্যমত উপকার করার চেষ্টা করব।"

প্রতিবেশীর মুখ থেকে আশ্বাস পেয়ে মিসেস কথ্ টিম ভূতের বজ্জাতির কথা খুলে বললেন। সব শুনে মহিলা বললেন, "টিমের আত্মা যে এখনও ঐ বাড়িতেই ঘোরাফেরা করছে তা আমরাও জানি, তবে নতুন এসেছেন বলে আগের দিন এ-প্রসঙ্গ তুলি নি। এটুকু ভরসা দিতে পারি যে টিম আর যাই করুক আপনাদের কোনরকম ক্ষতি সে করবেনা। কথায় বলে স্বভাব যায় না মলে। বেঁচে থাকতে এক মুহূর্ত তাকে চুপ করিয়ে রাখা যেত না। মরার পরে সেই স্বভাব যাবে কোথায়! তার ওপর আপনার ছেলেকে নিশ্চয়ই ওর পছন্দ হয়েছে, তাই ওকে দেখা দেয়, কথা বলে। আহা বেচার টিম, সে যে আর বেঁচে নেই। মানুষের মধ্যে নেই একথা বোঝে না। তাই এখনও মানুষের বাচ্চার সঙ্গে মেলামেশা করতে চায়। টিমের দুষ্টুপনা একটু ক্ষমা ঘেন্না করে নেবেন আর কি, ভাববেন ও আপনার আরেকটা ছেলে। উইলিয়ামের ভাই। বিশ্বাস করুন, টিম খুব ভাল ছেলে খুব লক্ষ্মী ভূত, ও আপনাদের ক্ষতি হয় এমন কিছু ও কখন ও করবে না।"

প্রতিবেশী মহিলার কথায় টিমের ওপর মিসেস কখের সত্যিই মায়া পড়ে গেল। সেদিন বিকেলে মিসেস কখ্ রান্নাঘরে মন দিয়ে রাতের খাবার তৈরি করছেন এমন সময় টের পেলেন পেছন থেকে কেউ তাঁকে খোঁচাচ্ছে।

"বিল!" ছেলের উদ্দেশে ধমকে উঠলেন মিসেস কখ, "ভাল হচ্ছে না বলে দিচ্ছি, রান্নার সময় বিরক্ত করলে আমি কেমন রেগে যাই জানিস ত? যা বেরো এখান থেকে খেলতে যা! আমি ধরলে কিন্তু আর আস্ত রাখব না!"

বিল ঃ উইলিয়ামের সংক্ষিপ্ত রূপ

সঙ্গে সঙ্গে আবার খোঁচা সেইসঙ্গে বাচ্চা ছেলের গলায় খিলখিল হাসি তাঁর কানে ভেসে এল। ঘুরে দাঁড়িয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে মিসেস কখ্ বুঝলেন কে তাঁকে খোঁচচ্ছে।

"এবার আমার পেছনে লাগতে এসেছো?" বাচ্চা ভূতকে এই প্রথম ধমকালেন মিসেস কখ্, "দেখতে পাচ্ছিনা বলে তোমায় শাসন করতে পারব না যেন ভেবো না। মানুষ বাচ্চার মত একটু ভদ্র শান্ত হও ত। উইলিয়ামের ছবির বইগুলো নিয়ে পাতা ওল্টালেও ত পারো। বলি কথা কানে যাচ্ছে?"

রান্নাঘরে কারও কোনও সাড়া শব্দ নেই ; তাঁর ধমক শেষ হতে না হতে বাইরের দরজায় কলিংবেল আগের দিনের মত বেজে উঠল।

"যদি বাইরে কাউকে না দেখি ত তোরই একদিন কি আমারই একদিন!" বলে বড় বড় পা ফেলে মিসেস কখ্ রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে সদর দরজা খুললেন। বাইরে কেউ নেই দুপুরের পথঘাট শুনসান, ফটকের এক পাশে ঝালর আঁটা ঘন্টার দড়িটা লেজের মত ঝুলছে।

দরজা বন্ধ করে অদৃশ্য টিমকে লক্ষ্য করে গলা চড়ালেন মিসেস কখ্ "আসুক! আসুক উইলিয়ামের বাপ আজ বাড়িতে! কলিংবেলের দড়ি আরও উঁচুতে ঝুলিয়ে তবে আমার শান্তি হবে, দেখব তারপর কি করে তুই ঘন্টা বাজাস?" বলে নিজের মনে গজরাতে গজরাতে রান্নাঘরে ফিরে এলেন তিনি।

সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চা ছেলের খিলখিল হাসি ছড়িয়ে গেল গোটা বারান্দায়। অবাক হয়ে মিসেস কখ্ দেখেন তাঁর ছেলে উইলিয়াম হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছে তার নার্সারি থেকে।

"কিরে। হাসছিস কেন?" ছেলের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন মিসেস কখ্।

"হাসি পেল তাই হাসছি," হাসি মুখে জবাব দিল উইলিয়াম, "টিম তোমায় রাগাতে কলিংবেল বাজিয়েছিল? তুমি কলিংবেলের দড়ি আরও উঁচুতে তুলে দেবে বলে ওকে ভয় দেখিয়েছো?"

"হ্যাঁ বলেছি," মিসেস কখ্ বললেন, "তা এর মধ্যে হাসির কি আছে?"

"তোমার ধমক খেয়ে টিম বলছিল দড়ি উঁচু করে বাঁধলে ও চেয়ারে উঠে নয়ত আমার কাঁধে চেপে ফের ঘন্টা বাজিয়ে তোমার রাগাবে।"

বাচ্চা ভূতের বজ্জাতি বুদ্ধির বহর দেখে থ হয়ে যান মিসেস কখ্, তাঁর মুখে আর কথা জোগায় না।

কিছুদিন বাদে মিসেস কখের বোন ষ্টেলা বেড়াতে এল। কিছুদিনের জন্য তাঁর কাছে থেকে গেল সে। স্টেলার বয়স বছর ষোল। খুব ভাল গিটার বাজাতে শিখেছে। শ্যালিকার সম্মানে মিঃ কখ্ এক পার্টি দিলেন। সেখানে শহরের মেয়র, শেরিফ, উচ্চপদস্থ সরকারি আমলা আর রাজনৈতিক দলের নেতারা আমন্ত্রিত হলেন। পার্টি চলার ফাঁকে মিঃ কখের অনুরোধ স্টেলা গিটার হাতে ঘরের এককোণে বসে বাজাতে শুরু করল। দু-একটা গৎ বাজানোর পরেই আচমকা তার মুখ গেল শুকিয়ে, ষ্টেলা দেখল তার গিটারের সবকটা তার একসঙ্গে ছিঁড়ে গেছে। লজ্জায় মুখ নিচু করে বসে রইল সে। সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেল কানের কাছে কার চাপা গলা "মুখ ব্যাজার না করে গিটারটা বাজানোর ভঙ্গিতে ধরে থাকো, আমি বাকিটা ম্যানেজ করে দিচ্ছি।" কিছু বুঝতে না পেরে এদিক ওদিক তাকাল স্টেলা, সঙ্গে সঙ্গে গিটারের বাজনা আবার শুরু হল। এবারের গৎ আরও সুরেলা। অতিথিদের ততক্ষণে যথেষ্ট নেশা হয়েছে, তাঁরা ধরে নিলেন গৃহকর্তা মিঃ কখের শ্যালিকাই গিটার বাজাচ্ছে। স্টেলা তার মুখ রক্ষা হয়েছে দেখে স্টেলা ততক্ষণ পরিস্থিতি সামলে নিয়েছে, একটু কাত হয়ে অকেজো গিটারটা বাজানোর ভঙ্গিতে দু'হাতের আড়ালে ধরে রইল সে।

পার্টি শেষ হলে গৃহকর্তা অতিথিদের সবাইকে চুরুট বিতরণ করলেন। চুরুট দাঁতে চেপে শহরের মেয়র পড়লেন মুশকিলে, পকেট হাতড়ে দেশলাই খুঁজে পেলেন না তিনি। দেশলাই নেই মিঃ কখের হাতেও। রীতিমত লজ্জায় পড়ে গেলেন তিনিও। আচমকা একটা ক্ষুদে ট্রে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে এসে থেমে গেল মিঃ কখ্ আর মেয়রের মাঝখানে, দুজনেই দেখলেন সেই ট্রের ওপর পড়ে আছে একখানা আনকোরা নতুন দেশলাই। সময় নষ্ট না করে মিঃ কখ্ সেই দেশলাই জ্বেলে মেয়রের চুরুট ধরিয়ে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে ট্রে-খানা হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে অদৃশ্য হল, "সত্যিই মিঃ কখের জবাব নেই," হালকা গলায় মেয়র বললেন, "চমৎকার খানাপিনা, শ্যালিকার গিটার, সবশেষে ম্যাজিকেরও ব্যবস্থা করেছেন। না, আপনার দেশলাইয়ের এই খেলাটা সত্যিই তাক লাগিয়ে দেয়ার মত। আমি আপনার এই আয়োজনে খুব খুশি হয়েছি মিঃ কখ্, মিউনিসিপ্যালিটি টাউন হল বানানোর যে পরিকল্পনার করেছে সে কন্ট্রাক্ট যাতে আপনিই পান তা আমি দেখব কথা দিচ্ছি," বলে ত মিঃ কখের হাত নিজের হাতে নিয়ে উষ্ণ করমর্দন করলেন।

পার্টি শেষ অতিথিরা একে একে বিদায় নিলেন। খানিক বাদে ছেলের নার্সারিতে এসে ঢুকলেন মিসেস কখ্। মেয়রের প্রতিশ্রুতি স্বামীর কাছ থেকে শুনেছেন তিনি। গিটারের তার ছিঁড়ে যাবার পরে যে অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে তারও বিবরণ শুনেছেন বোনের মুখ থেকে।

উইলিয়াম আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে, ঘরের ভেতর আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ছাদের দিকে মুখ তুলে মিসেস কখ্ বললেন, 'টিম আমি জানি তুই কাছাকাছি আছিস, আমার কথা নিশ্চয়ই তোর কানে যাচ্ছে। ভূত হলেও আজ তুই আমার যে উপকার করলি তা মরে যাবার সময় পর্যন্ত আমি মনে রাখব। আজ থেকে আমি ধরে নেব বিলের মত তুই আমার আরেকটি ছেলে। এ বাড়ি তোর বাবার তৈরি, যতদিন মন চায় তুই থাক এখানে, আমাদের সঙ্গে। কথা দিলাম তোকে এবাড়ি থেকে তাড়াতে আমি পাদ্রি ডাকিয়ে কোনও ঝাঁড়ফুঁক আর করব না।

একটাই অনুরোধ বিপদে আপদে আমাদের দেখিস। বিলের যাতে কোনও ক্ষতি না হয় সেদিকে চোখ রাখিস।”

তাঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল বাচ্চা ছেলের ছোট ছোট পায়ে দৌড়োনোব আওয়াজ, সেই সঙ্গে খিলখিল হাসি, এই প্রথম মিসেস কথ্ নিজেও সেই হাসির সঙ্গে গলা মিলিয়ে প্রাণ ভরে হাসলেন।

মিঃ হেনরি কথ্ ও তাঁর স্ত্রী দু'জনেই পরিণত বয়সে পৃথিবীর মায়া কাটিয়েছেন তাঁদের একমাত্র ছেলে উইলিয়াম আজ কি অবস্থায় আছে কেউ জানে না। ছোটবেলার অশরীরী সঙ্গি টিমথি ওরফে টিমই বা কেমন আছে তাও কেউ বলতে পারে না। সে কি আজও তার বাবার তৈরি সেই বিশাল বাড়ীর মায়া কাটাতে পারে নি, আজও তেমনই দৌড়ঝাঁপ করে বেড়াচ্ছে নাকি মুক্তি পেয়েছে অশরীরী জীবন থেকে? এসব প্রশ্নের জবাব দেবে এমন কেউ আমার জানা নেই।
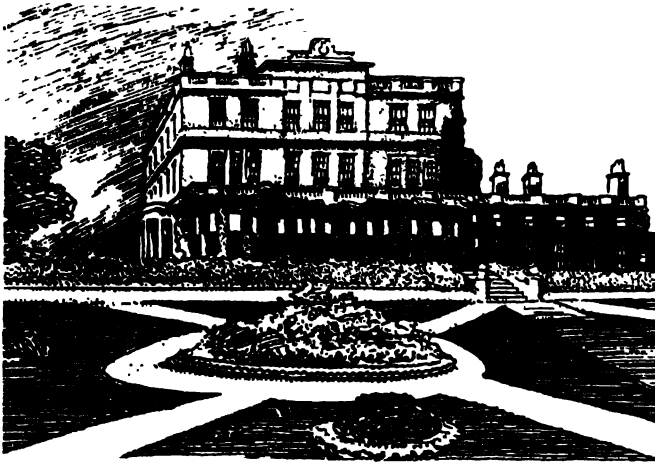
নতুন কেনা বাংলোর ভূত

নতুন বাড়িখানা বব্ আর তার বৌ ক্যানি দু'জনের ভারি পছন্দ হয়েছে শহরের চেঁচামেচি, হৈ-হট্টগোল থেকে অনেক দূরে ল্যাংকাশায়ারের প্রেস্টন-এ গ্রামের দিকে এমনিই একখানা বাগান-ঘেরা মাঝারি বাংলোর স্বপ্ন অনেকদিন ধরে দেখেছে তাবা দু'জনেই। শহরে আসবে কাজ করতে, রোজগারের ধান্দায় কিন্তু থাকবে শহর থেকে অনেক দূরে গাঁয়ে। শুধু বব্ নয়, খাঁটি ইংরেজ বলতে যাদের বোঝায় তাদের সবার একই মত।

বব্ ছোট ব্যবসায়ী, তার বেট ক্যানি শিক্ষিতা গৃহবধূ। ভূতপ্রেতে তাদের দু'জনের কারও বিশ্বাস নেই আগ্রহও নেই। কিন্তু নতুন বাড়িতে আসার পর এমন কিছু ঘটনা পরপর ঘটতে লাগল যার পরে ব্যাখ্যায় অতীত কিছু নেই, এই বিশ্বাসের মজবুত ভিতটাই তাদের গেল নড়বড়ে হয়ে।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পুরো দাম মিটিয়ে দেবার পব অক্টোবরেব গোড়াতেই নতুন বাড়িতে উঠে এসেছিল তাবা। তারপব ক'দিন যেতে না যেতেই এক অচেনা রহস্যময় পুরুষের আবির্ভাব ঘটতে লাগল বাড়ির লাগোয়া জমিতে।

রান্নাঘরটা বাংলোর পেছনে। আসবাবপত্র সব সাজিয়ে গুছিয়ে ঘরসংসার পেতে বসার দিন সাতেক পরে এক সকালে প্রথমবার তার উদয় হল। সকালবেলা রান্নাঘরে মন দিয়ে ব্রেকফাস্ট তৈরি করছে ক্যাথি আচমকাই তার মনে হল জানালায় কাঁচের ওপাশ দিয়ে কে যেন চলে গেল। মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে স্টোভের পাশ থেকে সরে এল সে, জানালার সামনে এসে কাঁচের পাল্লার এপাশ থেকে স্পষ্ট দেখল সত্যিই একটি লোক বাইরে লনের লাগোয়া নুড়ি বিছানো হাঁটাপথ ধরে এগিয়ে চলেছে। কে লোকটা? স্টোভের আঁচ কমিয়ে দ্রুতপায়ে খিড়কির দরজা খুলে বেরিয়ে এল ক্যানি, প্রবল কৌতূহলের তাড়নায় তার পিছু নিল সে। খানিকদূর যাবার পর লোকটির আকার আগের চেয়ে স্পষ্ট হল, ক্যানি বেশ বুঝতে পারল যার পিছু নিয়ে সে এসেছে সামানের সেই লোকটি নেহাৎই এক কমবয়সী যুবক। তার গায়ে পুরোনো ময়লা জ্যাকেট, পরনে বাদামি রঙের ট্রাউজার্স, পায়ের জুতোজোড়া ছেঁড়াখোঁড়া। একনজরে দেখলে তাকে খেতমজুর বলেই মনে হয়। এদিকে যারা চাষবাস করে তাদের বাড়ির চ্যাংড়া ছেলেগুলোকে এমনি সৃষ্টিছাড়া জামাকাপড় পরে দিনরাত ঘোরাঘুরি করতে দেখেছে ক্যানি। কিন্তু তাদের জামাকাপড় ত এমন ভেজা সপসপে থাকে না। প্যাচপেচে কাদায় মাখামাখিও নয়। ছেলেটা কি তাহলে পা পিছলে খানাখন্দে পড়ে গিয়েছিল? কিন্তু তা হলেও ও বাংলোর আঙ্গিনায় ঢুকল কোনপথে? তাদের ঢোকার ফটক ত এখন বন্ধ, তাহলে? এমনই হাজারও প্রশ্ন উঁকি দিল ক্যানির মনে। বব ঘুমোচ্ছে, ব্রেকফাস্ট তৈরি হলেই তাকে ডেকে তুলবে ক্যানি। কিন্তু এই একটা সাধারণ ব্যাপারে তার ঘুম ভাঙ্গাতে মন চাইল না। ছেলেটা এখনও একভাবে এগিয়ে চলেছে, খুব ধীর পা ফেলে যেন দারুণ কোনও ভাবনায় পড়েছে এমনই ভাবে ঘাড় কাত করে আছে একপাশে।

"এই যে, শোন!" পেছন থেকে ছেলেটাকে লক্ষ করে চেঁচিয়ে উঠল ক্যানি, "থামো, বলছি!" কিন্তু থামা দূরে থাক, তার ডাক আদৌ ছেলেটির কানে পৌঁছেছে বলে মনে হল না।

পথটা খানিকদূর গিয়ে বাঁয়ে মোড় নিয়েছে, সেখানে ছোট পুকুরের ধারে ঝোপের কাছে আসতে না আসতে সে যেন হাওয়ার মিলিয়ে গেল তার চোখের সামনে থেকে। ব্যাপার কিছুই আঁচ করতে না পারলেও একটা সন্দেহজনিত খটকা স্বাভাবিক কারণেই উঁকি দিল ক্যানির মনে—মোড় ঘুরতে না ঘুরতে লোকটা কিভাবে উধাও হল অনেক মাথা ঘামিয়েও এই প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেল না সে। যাইহোক তখনকার মত ব্যাপারটা জোর করে মন থেকে সরিয়ে পা চালিয়ে ক্যানি বাড়ি ফিরে এল। ববের মুখোমুখি বসে ব্রেকফাস্ট খেতে গিয়ে ইচ্ছে করে প্রসঙ্গ টা চেপে গেল তখনকার মত।

অনেকগুলো হপ্তা কাটল, তার মাঝে আরও বেশ কয়েকবার সেই রহস্যময় আগন্তুক একইভাবে হাজির হল। তার আবির্ভাবের কোনও ধরাবাঁধা দিনক্ষণ বা সময় নেই। কখনও রান্নাঘরে, কখনও বাথরুমে দাঁড়িয়ে ক্যানি তাকে দেখতে পেল। জানালার ওপাশে লনের লাগোয়া হাঁটাপথে তার হাঁটার ধরন একই রকম—মাথা একপাশে কাত করে মাটির দিকে তাকিয়ে যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন প্রত্যেকবারই লোকটির পরণে প্রথমদিনের সেই মত এক জলে ভেজা কাদামাখা পুরোনো জ্যাকেট আর কর্ডের ট্রাউজার্স, সেইসঙ্গে পায়ে সেই ছেঁড়াখোঁড়া জুতোজোড়া। ক্যানির মনে প্রশ্ন হয়ে দেখা দিল, হতে পারে ছেলেটা অভাবী, ভাল জামাকাপড় হয়ত বেশি নেই, কিন্তু যা আছে তা কেচে ধুয়ে শুকিয়ে পরতে বাধা কোথায় তবে কি ছেলেটার বাড়িতে এমন কেউ নেই যার চোখে তার জামাকাপড়ের খুঁত ধরা পড়তে পারে? রোজরোজ কাদামাখা ভেজা জামা প্যান্ট পরার মানেও খুঁজে পেল না সে। কৌতূহলের বশে পরপর আরও ক'বার ছেলেটার পিছু নিল ক্যানি। কিন্তু তাতে লাভ হল না। ছেলেটা একবারও মুখ ফিরিয়ে তাকাল না তার দিকে ; আগের মতই আপনমনে মাথা নামিয়ে ঘাড় কাত করে কি ভাবতে ভাবতে মোড় পেরিয়ে পুরোনো পুকুরের ধারে ঝোপের কাছে এসে মিলিয়ে গেল। বারবার নির্দিষ্ট একটা জায়গায় এসে লোকটা ঐভাবে বাতাসে মিলিয়ে যেতে ক্যানি ভয় পেল, কিন্তু সেকথা বাড়িতে কাউকে জানাল না। না বললেও কৌতূহল চেপে রাখার অস্বস্তি বেশিদিন সইতে পারল না ক্যানি, তাই একদিন ববকে খোশমেজাজে পেয়ে পুরো ঘটনা তাকে শোনাল। ভৌতিক ও অলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাসী না হলেও বব্ তার কথা পুরো উড়িয়ে দিতে পারল না। কিন্তু ক্যানির দুর্ভাগ্য বব্ নিজে একবারও সেই রহস্যময় আগন্তুকের দর্শন তখনও পায় নি তার আচমকা উদয়কালে বব্ হয় ব্যবসার হিসেবপত্তর দেখে, নয়ত স্টিরিওতে ক্যাসেট চালিয়ে গান শোনে একমনে নয়ত নতুন কোনও প্ল্যান প্রোগ্রামের খসড়া তৈরি করে। ক্যানির হাঁকডাক শুনে জানালার কাছাকাছি যাবার আগেভাগেই সেই রহস্যময় আগন্তুক তাদের দৃষ্টির আওতা থেকে উধাও হয়।

ক্যানি আর বব্ পুরো ব্যাপারটা অনেক চেষ্টা করেও বেশিদিন গোপন রাখতে পারল না। এক রবিবারের বিকেলে ক্যানির বাব-মা এলেন মেয়ে জামাইয়ের বাড়িতে। খোলা ফটক দিয়ে জমির ভেতরে ঢুকে স্পিড কমিয়ে লনের লাগোয়া পিচঢালা পথ ধরে গাড়ি নিয়ে এগোচ্ছিলেন দু'জনে। খানিকদূর এগোতে আচমকা একটা লোক যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে দাঁড়াল সামনে, তারপর মাথা নিচু করে একপাশ ধরে আপন মনে কি ভাবতে ভাবতে হাঁটতে লাগল। গাড়ি চালাচ্ছিলেন ক্যানির বাবা, পাশে তাঁর মাঝবয়সী স্ত্রী, বলা নেই, কওয়া নেই আচমকা ঐভাবে

একটা লোকের রহস্যময় আবির্ভাব দেখে দু'জনেই বেশ ঘাবড়ে গেলেন। কৌতূহলের বশে স্পিড্ খানিকটা বাড়িয়ে তার অনেকটা কাছে চলে এলেন তাঁরা আর তখনই তার গায়ের কাদা প্যাচপেচে ভেজা জামা প্যান্ট দেখে স্বামি স্ত্রী একে অপরের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন। কে লোকটা? জামাই নতুন বাড়ি কেনার পরে আগেও কয়েকবার এসেছেন তাঁরা কিন্তু তখন লোকটিকে চোখে পড়েনি। ক্যানি কি নতুন কাজের লোক রেখেছে, নাকি লোকটা এখানকার সিকিউরিটি গার্ড? খানিকদূর যাবার পবে লোকটা যেমন আচমকা এসেছিল তেমনই আচমকাই মিলিয়ে গেল। গাড়ি ঘুরিয়ে এবার তাঁরা এলেন বাংলোর পেছনে, দেখলেন খিড়কির দবজা খোলা। গাড়ি পার্ক করে কর্তা গিন্নি দু'জনে নেমে এলেন, ভেতরে ঢুকে দেখেন মেয়ে জামাই নাতি নাতনিদের নিয়ে বিকেলেব জলখাবার খাচ্ছে। মা-বাবাকে কাছে পেয়ে খুশি হল ক্যানি, আব একসময় ববের শাশুড়ি বেটি মেয়েকে ডেকে বললেন, "আসার পথে একটা নতুন লোককে দেখলুম মানা নিচু করে আপনমনে হাঁটছে। বয়স খুব বেশি নয়। কিন্তু ওর জামা প্যান্ট জলেকাদায় মাখামাখি। যেন খানিক আগে জল থেকে উঠে এসেছে। কে লোকটা?"

"হায় কপাল!" বব্-এর কান এড়িয়ে ক্যানি আক্ষেপ করল, "শেষকালে তোমরাও দেখলে?"

মেয়ের মুখ থেকে ঘটনাব বিববণ শুনে ক্যানির বাবা এবিষয়ে নিশ্চিত হলেন যে তাঁর যাকে দেখেছেন সে কারও অতৃপ্ত বিদেহী আত্মা। সংস্কাবেব বশে তাঁরা এবার কাছাকাছি কোনও গির্জার পাদ্রিকে ডাকিয়ে এনে গোটা বাড়ি ঝাড়ফুঁক করানোর সদুপদেশ দিলেন। বব্ শুনে ভেতরে ভেতবে চটলেও মুখে কিছু বলল না, কিন্তু ক্যানি তার মা-বাবার কথার সায় দিয়ে ঝাড়ফুঁক করানোর প্রসঙ্গ তুলতেই এক ধমকে সে তাকে চুপ কবিয়ে দিল। জামাইয়ের মেজাজ দেখে শ্বশুর শাশুরি আর এ ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করলেন না। তবে আভাসে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন পাদ্রি ডেকে ভূত খেদানোর ব্যবস্থা না করলে নাতি-নাতনিদের অসুখ বিসুখ করতে পারে, এমনকি জামাইয়ের ব্যবসায়ে আচমকা কোনও ক্ষতি হয়ে যাওয়াও বিচিত্র হবে না। বব্ বলাবাহুল্য এ-নিয়ে বৃথা কথা বলে সময় নষ্ট করতে রাজি হল না।

সেদিনের মত চা জলখাবার খেয়ে বব্-এর শ্বশুর-শাশুড়ি বিদায় নিলেন। যাবার আগে ঐ অপ্রিয় প্রসঙ্গ ইচ্ছে করে আর তুললেন না তাঁরা।

বাবা-মা চলে যাবার পরে ক্যানি ধমক খাবার ভয়ে ইচ্ছে করেই বব্-এর সামনে আর বিদেহী আত্মার প্রসঙ্গ তুলল না। রাত পেরোলে আবার সংসারের কাজ কর্ম নিয়ে মেতে উঠল সে। সেই রবিবারের পর অনেকগুলো মাস কেটে গেল। কিন্তু ক্যানি অনেক চেষ্টা করেও ঐ রহস্যময় আগন্তুকের দেখা আর পেল না, সে যেন বরাবরের মত উধাও হয়েছে।

দেখতে দেখতে কেটে গেল পুরো একটা বছর ; এই সময়ের মধ্যে স্বামী সংসার আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে এত ব্যস্ত রইল ক্যানি যে সেই রহস্যময় আগন্তুকের কথা প্রায় ভুলেই গেল সে।

আবার ফিরে এল অক্টোবর। ক্যানির মেয়ে এখন অনেকটা বড় হয়েছে। ছুটি ছাটায় বাড়িতে থাকলে পড়ার অবসরে মাকে ঘর সংসারের কাজে সাহায্য করে সে। এক শনিবারের সকাল। স্কুল ছুটি তাই মেয়ে সকালে রান্না ঘরে ঢুকে মাকে ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে এটা সেটা

এগিয়ে দিচ্ছে, একমনে ডিম ফাটাচ্ছিল ক্যানি, আচমকা মুখ তুলতেই চোখ পড়ল জানালার দিকে, দেখল কাঁচের পাল্লায় ওপাশে সেই মূর্তি চোখ মাটির দিকে ঘাড় কাত করে গভীরভাবে কিছু ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলেছে আপনমনে।

আবার সে এসেছে ফিরিয়া। বারান্দার বসে বব্ খবরের কাগজ পড়ছিল। মেয়েকে পাঠিয়ে তাকে রান্নাঘরে ডাকিয়ে আনল ক্যানি, ভিতু ভিতু গলায় বলল, "ও আবার ফিরে এসেছে।"

বব্ কিছু না বলে এগিয়ে এল, জানালার কাঁচে মুখ চেপে তাকাল বাইরের দিকে। তারপর একটা লাঠি হাতে নিয়ে খিড়কির দরজা খুলে দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। ক্যানির মেয়ে বোকার মত কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে। তারপর জানতে চাইল, "মামা, হু ইজ হি—লোকটা কে?

"আই কান্ট সে, ডিয়ার,—বলতে পারব না সোনা," এর বেশি আর কিছু বলতে পারল না ক্যানি।

বব্ হতাশ হয়ে ফিবে এল খানিকক্ষণ বাদে, ক্যানি কোনও প্রশ্ন করার আগে নিজেই বলল, "ধরতে পারলাম না, ব্যাটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।" ক্যানি কোনও জবাব দিল না, তবে তার স্বামীর মুখ যে লাল হয়ে উঠেছে তা তার চোখ এড়াল না। লজ্জা আর চাপা উত্তেজনাই এর কারণ তা বুঝতে পারল সে।

"পাপা," বব্-এর গা ঘেঁষে তার মেয়ে আদুরে গলায় জানতে চাইল, "হু ইজ হি? ও কে? "হিম?" মুচকি হেসে মেয়ের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বব্ জবাব দিল, "হি ইজ নো বডি, মাই চাইল্ড—"ও কেউ নয়।" "ইজ হি এ গোস্ট?" মেয়ে আবার প্রশ্ন করল, বব্ এ প্রশ্নের জবাব দিল না।

এবার বব্ সত্যিই ভাবনায় পড়ল। সে ভূত বিশ্বাস করুক চাই না করুক তার বৌ এতদিন যে ভুল দেখেনি সে বিষয়ে আজ পুরোপুরি নিশ্চিত হল সে। সেদিন আর শহরে গেল না বব্, ক্লাবে এসে এক বিশ্বস্ত বন্ধু সঙ্গীকে দেখতে পেয়ে তার সমস্যার কথা খুলে বলল। ভদ্রলোক নিজে প্রেততত্ত্বে বিশ্বাসী, সব শুনে বললেন, "তুমি যে জায়গাটা কিনেছো আগে সেখানকার পুরোনা ইতিহাস আমার খুঁজে বের করতে দাও।"

পুরোনো খবরের কাগজ কেটে আর স্থানীয় বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ভদ্রলোক জানতে পারলেন বব্-এর বাংলো তৈরি হবার আগে স্থানীয় এক সমৃদ্ধ কৃষকের খামারবাড়ি ছিল সেখানে। সেই কৃষকের বেশি বয়সে একটি ছেলে হয়েছিল। নিজে লেখাপড়া শেখার সুযোগ পায় নি বলেই হয়ত ছেলেকে চাষী না বানিয়ে উচ্চশিক্ষিত করতে চেয়েছিল সে, তাকে বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল।

কৃষকের ছেলেটি ছিল মেধাবী, একে একে স্কুলের সব পরীক্ষা পাশ করে একদিন সে ভর্তি হল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক স্তরে, মন দিয়ে লেখাপড়া ও করতে লাগল। কিন্তু এবার ভাগ্যদেবী তাকে নিয়ে বা কালের নির্মম খেলায় মাতলেন। শহুরে কৃত্রিমতায় মোড়ক থেকে উঠে আসা এক রূপসী সহপাঠিনীকে ছেলেটির ভাল লেগে গেল। তাকে নিয়ে ধরণীতে স্বর্গ খেলনা রচনা করার স্বপ্নে সে বিভোর হয়ে উঠল। মেয়েটি কিন্তু তার প্রেমে আদৌ পড়োনি। অন্তরঙ্গ ভাবে মেলামেশা করার সুবাদে কিছুদিন তার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে গেল। পড়াশুনোয় ঘাটতি

পড়তে ছেলেটি পরীক্ষায় কৃতকার্য হল না। তারপর মেয়েটির প্রত্যাখ্যান সইতে না পেরে ভাঙ্গা মন নিয়ে ফিরে এল বাড়িতে। কিছুদিন দরজা বন্ধ করে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করার চেষ্টা করল সে। তারপর জীবনের মুখোমুখি হতে না পেয়ে খামারবাড়ির পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করল। অক্টোবরে এক রবিবারের বিকেলবেলা তার জলে ভেজা কাদা প্যাচপেচে লাশ ভেসে উঠেছিল।

একমাত্র ছেলের অকালমৃত্যুর পরে সেই কৃষক আর তার স্ত্রীও বেশিদিন বাঁচেনি, পরে তাদের খামাব বাড়ি বিক্রি হয়ে যায়, স্থানীয় এক ডেভেলপার সেই জমি কিনে সেখানে বাংলো বানায়।

এত খবর জানার পরে বব্ আর দেরি করেনি, খদ্দের ডেকে অর্দ্ধেক দামে তার সাধের বাংলো বিক্রি করে বৌ ছেলেমেয়েকে নিয়ে চলে এসেছিল লণ্ডনের কাছে, সেখানে কম দামের এক পুরোনো ফ্ল্যাট কিনেছিল। গ্রামে থাকার সাধ তার মিটে গিয়েছিল।

দ্যাখো কাকে নিয়ে এসেছি

"ন্ নাঃ! এ কক্ষনো হতে পারে না!" স্থান, কাল ভুলে শরীরে সবটুকু শক্তি জড়ো করে প্রাণপণে আর্তনাদ করে উঠল মেরি। "হে ঈশ্বর, যা দেখলাম তা যেন নিছকই দুঃস্বপ্ন হয়!"

এদিক ওদিক তাকিয়ে চাপাগলায় আপন মনে বলে উঠল সে। গ্রিটিংস কার্ডের দোকানের ভেতরে কাউন্টারে দাঁড়ানো সেলসম্যানেরা ততক্ষণে ঘাড় ফিরিয়েছে। খানিক আগের চাপা আর্তনাদ কানে যেতে কৌতূহল মেশানো চাউনিতে তারা জরিপ করছে তার আগা-পাশ-তলা। র‍্যাকে সাজিয়ে রাখা হরেকরকম কার্ড ঘাঁটতে ঘাঁটতে যুবতী মেয়েটি কেন আর্তনাদ করে উঠল তাই তারা ভেবে পাচ্ছে না। মৃগি না হিস্টিরিয়া? না কি কিছুতে কামড়াল? আর্তনাদের কারন জানতে না পারলেও এগিয়ে এসে কেউ তা জিজ্ঞেস করার সাহসও পাচ্ছে না, হয়ত মেরি এখনও সুস্থভাবে দাঁড়িয়ে আছে দেখেই।

কিন্তু ভয়েরও বুঝি এক অদ্ভুত আকর্ষণ আছে, আর সেই আকর্ষণের তাড়নায় গ্রিটিংস কার্ড বাছাই থামিয়ে মুখ ফিরিয়ে জানালার কাঁচের পাল্লার দিকে আবার তাকাল মেরির, সঙ্গে সঙ্গে ছবিটা আবার ভেসে উঠল চোখের সামনে—জানালার ওপাশে গির্জার লাগোয়া সমাধিক্ষেত্র, অনেকখানি তফাতে অগুণতি কাঠের ক্রস আর সমাধিফলক। খানিক আগে ঝরে পড়া তুষার কণা এখনও লেগে আছে তাদের গায়ে। মেরি স্পষ্ট দেখল সেইসব ফলকের একটির ওপর বসে ডেভিড তার স্বামী, হাসি মুখে তাকিয়ে আছে তার দিকে, কবর দেবার সময় আর্মি ট্রান্সপোর্ট কোরের ড্রাইভার সার্জেন্ট-এর হালকা খাকি উর্দি ইউনিফর্ম যা তার পরনে ছিল এইমুহূর্তে তাই পরে আছে সে, বুকের বাঁদিকে শার্টের সঙ্গে আঁটা মেডেলগুলো ঝকঝক করছে বিকেলের পড়ন্ত আলোর। সামনেই বড় দিন, কিছু গ্রিটিংস কার্ড কিনবে বলে এই দোকানে ঢুকেছিল মেরি তাও অন্ততঃ আধঘন্টা আগে কার্ড বাছতে গিয়ে হঠাৎই মনে পড়ে গিয়েছিল পাশের সমাধিক্ষেত্রেই ডেভিড ঘুমিয়ে আছে। কথাটা মনে হতেই মেরির চোখ পড়েছিল পাশের জানালার দিকে তখনই দেখেছিল ডেভিডকে। ডেভিডের গা ঘেঁষে আরও একজনকে

বসে থাকতে দেখেছিল সে, দেখেই চমকে উঠেছিল, দারুণ ধাক্কা খেয়ে বুকের ভেতরের কলজের ধুকপুকুনি প্রায় বন্ধ হতে বসেছিল, জোহান মেরির বড় বোন জেন-এর একমাত্র ছেলে। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠেছিল প্রচণ্ড আতংকে। জানালা বন্ধ থাকলেও অনেক অনেক দূর থেকে ডেভিডের চেনা গলা আছড়ে পড়েছিল মাথায় ভেতরে—এই দ্যাখো কাকে নিয়ে এসেছি। "তবে কি জোহান....? না, না, তা কি করে হবে, আজ সকলেই ত জোহান কাজে বেরোবার সময় এল তার কাছে তাকে বাইকের পেছনে বসিয়ে নিয়ে গেল নিজেদের বাড়িতে। জোহানের মা মেরির বড় বোন জেন ও তার মতই বিধবা। প্রায় বাইশ তেইশ বছর আগে স্বামীকে হারিয়েছে জেন. জোহান কাজে বেরোবার সময় এল তার কাছে, তাকে বাইকের পেছনে বসিয়ে নিয়ে গেল নিজেদের বাড়িতে। জোহানের মা মেরির বড় বোন জেন ও তার মতই বিধবা। প্রায় বাইশ তেইশ বছর আগে স্বামীকে হারিয়েছে জেন, জোহান তখন বছর খানেকের বাচ্চা, তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েই নিজের কাজে চলে গিয়েছিল জোহান দেখে খুব খুশি হয়েছিল তার দিদি জেন লাঞ্চ খাবার পরে অনেকক্ষণ দু'বোন গল্প করেছিল এক সঙ্গে। জোহানের জন্য ভাল পাত্রীর খোঁজ কোথায় মিলবে তা নিয়েও কথাবার্তা বলেছিল। খানিক বাদে জেন ঘুম পাবার অজুহাতে শুয়ে পড়তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল মেরি, ক্রিসমাসের কেনাকাটা করবে বলে ঢুকেছিল বড় দোকানে সেখান থেকে গ্রিটিংস কার্ডের এই বিশাল আড়তে।

তিন বছর আগের সেই দিনের কথা এখনও জ্বলজ্বল করছে মেরির মনে আগুনের মত। নিজের ইউনিটের সঙ্গে প্লেনে চেপে বেলফাস্ট পৌঁছোল ডেভিড, সেখান থেকে ট্রাকে মালপত্র নিয়ে রওনা হল ডাবলিন সিটির দিকে। কিন্তু পৌঁছোনোর আগেই মাঝপথে আইরিশ গেরিলাদের পেতে রাখা মাইন ফাটল সশব্দে. সেই বিস্ফোরণে ট্রাকের সঙ্গে ডেভিডের দেহ ছিন্ন ভিন্ন হল। সামরিক কর্তৃপক্ষ তার সেই ছিন্ন ভিন্ন মৃতদেহই কালো কফিনে পুরে নিয়ে এসেছিলেন লণ্ডনে, কবর দেবার আগে স্বামীর মুখখানা শেষবারের মত দেখতে পায়নি মেরি।

ইস্ট এণ্ড গির্জার বুড়ো পাদ্রি ফাদার সালিভ্যান অলৌকিক শক্তি বলে ভবিষ্যৎ দেখতে পেতেন। সংকটের সময় আসছে বলে একখানা রূপোর ক্রুস ডেভিডকে তিনি রূপোর হারে ঝুলিয়ে গলার পরতে দিয়েছিলেন। কিন্তু জেদী আর বেপরোয়া স্বভাবের সৈনিক ডেভিড দেয়নি। তাঁর হুঁশিয়ারিতে কান দেয় নি। ক্রুসখানা বাড়িতে এনে রেখে দিয়েছিল শোবার ঘরে মা মেরির ফোটোর শেলফে তারপর দু'মাসও কাটেনি—

এবার কি তাহলে জোহানের পালা, আর সেই কথাটাই তাকে এভাবে আগেভাগে জানিয়ে হুঁশিয়ার করে দিল ডেভিড? সম্ভাবনাটা মনে উঁকি দিতে আবার একটা আর্তনাদ মেরির কলজে ছিঁড়ে উঠে আসতে আসতে গলার কাছে দলা পাকিয়ে গেল। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিল সে। ডেভিডকে দেয়া ফাদার স্যালিভ্যানের সেই রূপোর ক্রুসখানা এখনও তার কাছেই পড়ে আছে। মেরি ঠিক করল কার্ড কিনে বাড়ি ফিরে ক্রুসখানা নিয়ে জেন-এর কাছে যাবে সে, ক্রিসমাসের আগেই জোহানের গলায় ওটা পরাবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ঘুরে ঘুরে অচল লিফট্ সারায় জোহান, বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে। পেনসানের টাকায় মেরির বাকি জীবন ভালভাবেই কাটবে কিন্তু ঈশ্বর না করুন, আজ জোহানের ভালমন্দ কিছু হলে জেনকে দেখার

কেউ থাকবে না। জুটবে না খাওয়া, দেখব না দেখব না করেও জানালা দিয়ে আবার বাইরের দিকে তাকাল মেরি। দেখল আবার তুষার পড়া শুরু হয়েছে, তার মধ্যে ডেভিড বা তার গা ঘেঁষে বসা জোহান, দু'জনের কাউকেই দেখা যাচ্ছে না।

দাম মেটানোর পরে গ্রিটিংস কার্ডগুলো ভাল করে খামে পুরে দোকানের সুপারভাইজার তার হাতে তুলে দিল। ধন্যবাদ জানিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল মেরি। ওয়াটার প্রুফের কলার তুলে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসে দাঁড়াল স্ট্যাণ্ডে খালি ট্যাক্সি পেয়ে তাতে চেপে বসল মেরি।

বাইশ-তেইশ বছর আগে এমনি এক ডিসেম্বরের বিকেলে হেনরি এসেছিল জেন-এর জীবনে, যে দোকানে সেলসগার্লের কাজ করত জেন সেখানেই এসেছিল সে খদ্দের হয়ে, প্রথমদিনই জেনকে হেনরির ভাল লেগেছিল, তেমনই জেন-এরও ভাল লেগেছিল হেনরিকে মনে হয়েছিল স্বপ্নের রাজকুমার। এক অসামরিক বিমান সংস্থার সিনিয়র মেকানিক হেনরি স্মিথের ছ'ফিট লম্বা তাগড়াই পুরুষালি চেহারা, লম্বাটে মুখে নীল দুটি চোখ আর সিঁথি কেটে আঁচড়ানো একমাথা চুল জেন-এর বয়সী যেকোন যুবতীর হৃদয়ে ঝড় তোলার পক্ষে ছিল যথেষ্ট। বাস্তবে হলও তাই। এরপর থেকে হেনরি এটা সেটা কেনার ছুতোয় ঘনঘন দোকানে যাওয়া আসা শুরু করল। খদ্দের হয়ে জেন-এর কাছাকাছি এসে একদিন সে সরাসরি তাকে প্রেম নিবেদন করে বসল। জেন-এর যুবতী হৃদয়ও অনেকদিন ধরে মজবুত ভিতের একটা আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছিল, হেনরির চেহারা, ব্যক্তিত্ব আর সাহসী প্রেম নিবেদনের মধ্যে সেই আশ্রয়কে খুঁজে পেল সে। হেনরির প্রেম-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেদিনই রাতের শোয়ে তার সঙ্গে সিনেমায় গেল জেন। জেন আর মেরির মা তখনও বেঁচে, হেনরিকে তাঁর খুব ভাল লেগেছিল তাই বড় মেয়ে জেন তাকে বিয়ে করতে চায় জেনে তিনি আপত্তি করেন নি। মেরি সে সময় বারো বছরের কিশোরী।

কিন্তু সুন্দরের আড়ালেই যে ভয়ংকরের বীজ লুকিয়ে থাকে সেকথা হয়ত জেন জানত না, তাই বিয়ে করার পরেই যখন হেনরির তলপেটে ক্যানসার ধরা পড়ল তখন জেন-এর মনে হয়েছিল তার পায়ের নীচের মাটি সরে তৈরি হয়েছে এক বিশাল ফাটল। ডাক্তার সময় দিয়েছিলেন তিন মাস, হয়ত জীবনীশক্তি বেশি থাকার জন্য আরও তিন মাস টিকে রইল হেনরি। মারা যাবার পরে তার মৃতদেহের দিকে অবাক চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিল জেন, সুপুরুষ হেনরির বিশাল দেহখানা মাত্র বছর দেড়েকের মধ্যে শুকিয়ে কুঁকড়ে কেমন ম্যমির আকার নিয়েছে তাই দেখে অবাক হয়েছিল সে।

জোহান তখন মাত্র এক বছরের শিশু, তাছাড়া মেকানিকের চাকরি করে তার নিশ্চিন্ত ভবিষ্যৎ গড়ার মত প্রচুর টাকা হেনরি জমিয়ে যেতে পারে নি, তাই স্বামী মারা যাবার পর চারটে পেট চালানোর তাগিদে দোকানের চাকরিতে জেনকে ফিরে যেতে হল। তার এবার রোজগারের টাকায় আবার সংসারের অচল চাকাটা চলতে শুরু করল, মেরি লেখাপড়া শিখে বিয়ে করল ডেভিডকে। একমাত্র সন্তান জোহানও একদিন টেকনিক্যাল ডিপ্লোমা নিয়ে ঠিকে লিফট মেকানিকের জীবন শুরু করল।

মেরির বেশ মনে আছে ডেভিডের সঙ্গে বিয়ের আগে জোহান একদিন তার গায়ে হাত তুলেছিল। দোকান ছুটি হবার পরে জেনকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছিল মেরি, আচমকা

মাঝপথে ডেভিডের সঙ্গে দেখা। তার পরনে তখন সাদারণ অসামরিক পোষাক, মেরি জানত সে ছুটিতে আছে। জেন সেদিনই প্রথম দেখেছিল ডেভিডকে, আলাপ করিয়ে দেবার পরে হেসে কথা বলার ভঙ্গিতে মেরি জেনকে বোঝাতে চেয়েছিল তাকেই ভবিষ্যতে সে জীবন সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছে। আচমকা ধূমকেতুর মতই কোথা থেকে জোহান এসে ছুটেছিল সেখানে। এক অচেনা স্বাস্থ্যবান লোক তার মাসির সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে কথা বলতে দেখে রেগে আগুন হয়ে উঠেছিল জোহান, ছেলের সঙ্গে ডেভিডের পরিচয় করিয়ে দেবার সুযোগ পায়নি জেন, তামাশার ছলে মেরির পাছায় ডেভিড চাপড় মারতে জোহান ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তার ওপর। কলার চেপে ধরে এক ঘুঁষি মেরেছিল চোয়ালে। নিমেষে আগুন জ্বলে উঠেছিল জোহানের দু'চোখে, দাঁতে দাঁত পিষে শপথ করে বলেছিল। "তোকে আমি ছাড়ব না! বেঁচে থাকতে না পারি মৃত্যুর পরে হলেও তোকে আমি দেখে নেব! এমন ধোলাই দেব যে নিজের মাও তোর লাশ দেখে চিনতে পারবে না! জেন আর মেরি বেগতিক দেখে ব্যাপারটা সেই মুহূর্তে সামলে নিয়েছিল, ডেভিডের আসল পরিচয় জানার পরে জোহান নিজেই মাফ চেয়েছিল। তার দু'হাত ধরে তখনকার মত জোহানের হাতে হাত মেলালেও ডেভিড যে রাগ পুষে রেখেছে তা তার লাল চোখ দেখেই আঁচ করেছিল মেরি।

অতীতের এসব ঘটনা পর্দার বুকে ফুটে ওঠা ছবির মত মেরির স্মৃতির মণিকোঠায় উঁকি দিচ্ছিল। পুরোনো দিনের কথা ভাবতে ভাবতে একসময় নিজের অজান্তে গভীর ঘুমের অতলে তাকিয়ে গিয়েছিল মেরি। টেলিফোনের আওয়াজে মেরির ঘুম ভাঙ্গল, চোখ মেলতেই নজব পড়ল দেয়াল ঘড়ির গায়ে, রাত সাড়ে বারোটা। ডিভান থেকে ধড়মড় করে লাফিয়ে নেমে রিসিভার তুলল সে। 'হেলো। মেরি', বড় বোনের গলা চিনতে মেরির ভুল হল না, "জেন বলছি, তুই সেই যে কেনাকাটার নাম করে বেরোলি তারপর আর ফিরে এলি না। হেলো মেরি, শুনতে পচ্ছিস?"

"বলছি জেন", নিজেকে যতদূর সম্ভব শান্ত রেখে মেরি বলল, "বাড়ি থেকে বলছি, কি হয়েছে?"

"আমার মহা সর্বনাশ হয়ে গেছেরে। কি করব কিছুই মাথায় আসছে না।"

"কি হয়েছে খুলেই বলো না?" বলতে গিয়ে নিতান্ত অনিচ্ছায় নিষ্ঠুরভাবে বলল মেরি, "মহা সর্বনাশ ত তোমার অনেক আগেই হয়েছে। আজ আর নতুন করে..।" এটুকু বলেই নিজেকে সামলে নিল মেরি, জানতে চাইল। "জোহান কোথায়, ও বাড়ি ফেরে নি?"

"জোহান" কান্নায় ভেঙ্গে পড়া জেন-এর গলা ওপাশ থেকে আছড়ে পড়ল কানের পর্দায়। "জোহানের অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে রে" বেডফোর্ডের এক অ্যাপার্টমেন্টে মাটির নিচে বসে লিফট সারাচ্ছিল জোহান, এমন সময় আচমকা কি করে যেন লিফট চালু হয়ে যায়। লোক বইবার বড় খাঁচাটা তার ছিঁড়ে আছড়ে পড়েছে ওর ওপর। ফায়ারব্রিগেডের লোকেরা এসে খাঁচার নিচ থেকে অনেক কষ্টে জোহানকে টেনে বের করে নিয়ে গেছে হাসপাতালে। জোহান কেমন আছে জানি না, গিয়ে কি দেখব তাও জানি না। তুই বরং একবার যা এমার্জেন্সিতে গিয়ে ওর অবস্থা দ্যাখ তারপর টেলিফোন করে আমায় বল্। তোর টেলিফোন পেলে তারপর আমি যাব।"

"তুমি শুয়ে থাকো আমি এখুনি যাচ্ছি," বলে রিসিভার নামিয়ে রখল মেরি।

হাসপাতালের একজন নার্স মেরিকে নিয়ে এল। মর্গের খাটের ওপর সাদা চাদরে ঢাকা দেহটা দেখিয়ে নার্স বলল, "চাদর তুলে মুখটা দেখে বলুন আপনি এর খোঁজেই এসেছেন কিনা।"

চাদর তুলে একবার তাকাতে চমকে উঠল মেরি। এটা কি? সত্যিই জোহানের মৃতদেহ না তালগোল পাকানো একটা মাংসপিণ্ড। লাশের ঘাড়ের ওপর মাথাটা কে যেন ভারি হাতুরির এক ঘায়ে চেপে থেঁতলে দিয়েছে। নাক, চোখ, ঠোঁট এমন থেঁতলে গেছে যে কিছুই আলাদাভাব চেনা যাচ্ছে না। রক্ত আর মগজের ঘিলুর সঙ্গে টুকরো হাড় মিলেমিশে একাকার হয়ে বীভৎস দেখাচ্ছে। কাঁধের কাছে জরুলটা দেখে মেরি নিশ্চিত হল যে এটা সত্যিই জোহানের লাশ। কিন্তু লাশের গলার ওটা কি ঝুলছে। অবাক হয়ে মেরি দেখল ফাদার সালিভ্যানের দেয়া সেই রূপোর ক্রস, লকেটের মত জোহানের গলায় ঝুলছে যা তিনি ডেভিডকে গলার পরতে বলেছিলেন। এতদিন এটা ত মেরির শোবার ঘরে মা মেরির ফোটোর নিচে ছিল। সেখান থেকে জোহানের গলায় এটা এল কি করে? দেবার কথা একবার মনে এলেও সে নিজে হাতে দেয়নি এ বিষয়ে মেরি নিশ্চিত।

"ডেভিড" মৃত স্বামীর উদ্দেশ্যে মনে মনে বলল মেরি, "তোমার শপথ পূর্ণ হল। আমার বোনপোকে এমন মেরেছো যে লাশ দেখে ওর মা-ও ছেলেকে চিনতে পারবে না।"

হোটেলে ভূতের রসিকতা

"একটা কাজ করতে হবে," "কাউন্টারের ওপাশে দাঁড়ানো যুবতী রিসেপশনিস্টের দিকে তাকালেন পল কুমেদন," আমার মেয়েকে রোজ ভোর পাঁচটায় ইনসুলিন ইঞ্জেকসান নিতে হয়। ওকে ঐ সময় ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতে হবে, আর আর্লি মর্ণিং ব্রেকফাস্ট পৌঁছে দিতে হবে ওর কামরায়। আমার পাশের কামরাটাই ওর রুম, লিখে নিন, রুম নম্বর....।

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, স্যর, কামরায় নম্বর সামনে রাখা সাদা প্যাডে টুকে নিয়ে রিসেপশনিস্ট মিস্টি হাসল, "রাত আটটায় আমার ডিউটি শেষ হবে, তারপর নাইট শিফটে যিনি থাকবেন আমি তাঁর জন্য নোট লিখে যাব যাতে আগামিকাল ভোর পাঁচটায় টেলিফোনে আপনার মেয়েকে ডেকে ইঞ্জেকশন নেবার কথা মনে করিয়ে দেন। আমাদের রুম সার্ভিস চব্বিশঘন্টা চালু থাকে, আর্লি মর্ণিং ব্রেকফাস্ট ওরাই আপনার মেয়ের কামরায় পাঠিয়ে দেবে।"

"শুধু আগামিকাল আর পরশু" পল কুমেদন অনুণয়ের সুরে বললেন, "এই দুটো দিন। পরশুদিন দুপুরে লাঞ্চ সেরে আমরা হোটেল ছেড়ে দিচ্ছি।"

"এটা কোনও ব্যাপার নয়, স্যর" রিসেপশনিস্ট আশ্বাস দিল, "কথা দিচ্ছি দু'দিনই ভোর পাঁচটায় আপনার মেয়েকে টেলিফোন করে ইঞ্জেকশনের কথা মনে করিয়ে দেব।" কথা শেষ করতেই তার চোখ গিয়ে পড়ল কাউন্টারের ওপাশে খানিক তফাতে দাঁড়ানো যুবতীর গা ঘেঁষে দাঁড়ানো এক কিশোরীর দিকে—মেয়েটির বয়স বড়জোর দশ কি এগারো। কিন্তু চর্বির অস্বাভাবিক বাহুল্য এই বয়সেই বেশি মোটা করে তুলেছে। দেহের সব রক্ত যেন জমা হয়েছে মেয়েটির গোল গড়নের মুখে, টকটকে লাল রং ফেটে পড়বে মনে হয়। মেয়েটির মুখভর্তি

ছোটবড় অসংখ্য ফোঁড়া, কপাল, গাল, গলা, কোথাও ফাঁক নেই। মার হাত শক্ত মুঠোয় ধরে ঘনঘন এদিক ওদিক তাকাচ্ছে মেয়েটি, তার চাউনিও কেমন যেন অস্বাভাবিক। মেয়েটির প্রতি রিসেপশনিষ্টের সহানুভূতি হল। আহা, বেচারি, মনে মনে বলল সে, "এই বয়সেই ডায়াবেটিস ধরেছে! আপনারা কামরায় যান স্যর।" পল কুমেদনের দিকে তাকাল রিসেপশনিস্ট।

"পোর্টার আপনাদের মালপত্র এখুনি পৌঁছে দেবে।"

ব্রেকফাস্ট সেরে বৌ মেয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেলেন পল কুমেদন। এক বহুজাতিক সংগঠনের তিনি মার্কেটিং ডিরেক্টর, কানাডার আঞ্চলিক দপ্তরের বিভাগীয় ম্যানেজারদের সঙ্গে পরপর দু'দিনে অনেকগুলো মিটিং-এর প্রোগ্রাম নিয়েই তিনি এসেছেন। একমাত্র মেয়েটি ছোটবেলা থেকেই অসুস্থ, এই অসুখের দরুণ সে নিয়মিত স্কুলে যেতে পারে না। ডাক্তারের নির্দেশে তাই বাড়িতেই পড়াশোনা করে। মেয়ে তাঁর খুব ন্যাওটা, একদিনও তাঁকে ছেড়ে থাকতে পরে না, তাই কানাডায় আসার সময় তাকে সঙ্গে নিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন পল, আর মেয়েকে আগলানোর জন্যই স্ত্রীকেও নিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। একাধিক ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে পল বুঝেছেন যে তাঁর মেয়ে ডোনার আয়ু খুব বেশি নয়। যে ক'দিন বাঁচবে এইভাবে ইনসুলিন ইঞ্জেকশন নিতে হবে তাকে। মেয়েকে লেখাপড়া শেখানোর জন্য তাই তিনি তেমন উদগ্রীব নন, ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার জন্য যেটুকু বিদ্যে দরকার তার বেশি শেখানোর জন্য মেয়ের ওপর চাপ দিতে তিনি রাজি নন। চাপ দিয়েই বা কি হবে, মেয়ে ত কখনও মা হতে পরবে না। যে ক'দিন বাঁচবে সে ক'দিন তার দায়িত্ব তাঁকেই বইতে হবে! বেচারি! পল কুমেদন বেরোলেন। আশপাশের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ঘুরিয়ে দেখানোব জন্য হোটেলের বাস তৈরি ছিল। লাঞ্চ প্যাকেট নিয়ে দুজনে অন্যান্য যাত্রিদের সঙ্গে সেই বাসে চাপলেন। বেড়ানো সেরে হোটেলে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। মিঃ কুমেদন তার আগেই কাজকর্ম সেরে হোটেলে ফিরে এসেছেন, গরম কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে চোখ বোলাচ্ছেন সান্ধ্য দৈনিকের পাতায়।

গল্পগুজব করে সন্ধেটা কাটল, আটটা নাগাদ ডিনার খেয়ে তিনজনে যখন শুলেন তখন ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ন'টা। মেয়েকে ওষুধ খাইয়ে গলা পর্যন্ত কম্বলে ঢেকে নিজের কামরায় এসে শুলেন মিসেস কুমেদন।

টেলিফোনের একটানা আওয়াজে ডোনা কুমেদনের ঘুম গেল ভেঙ্গে। চোখ মেলে সুইচ টিপতেই ঘর ভরে গেল আলোয়। বালিশের তলা থেকে হাতঘড়ি বের করে চোখের সামনে আনতে দেখল ঠিক পাঁচটা। হাত বাড়িয়ে পাশের টেবলে রাখা টেলিফোনের রিসিভার তুলে কানে ছোঁয়াতেই ভেসে এল নাইট শিফটের রিসেপশনিস্টের সুরেলা গলা। "গুড মর্নিং," ম্যাডাম, দিস ইজ শীলা মর্টন ফ্রম রিসেপসান। ইট ইজ টাইম ফর ইওর ইনসুলিন ইঞ্জেকসান, ম্যাডাম। ইওর আর্লি মর্নিং ব্রেকফাস্ট ইজ ওয়েটিং আউটসাইড দ্য ডোর, থ্যাংক ইউ।"

সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গার পরেই ইঞ্জেকসান নিতে গেলে আগে ডোনার দু'চোখ ফেটে জল আসত। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে এই প্রভাতী সূঁচ ফোঁড়ানোর সঙ্গে অভ্যস্ত করে তুলেছে। এখন তাই সকাল হলে আর তার কান্না পায় না, শুধু মেজাজটা বিগড়ে যায়। নিজের হাতে ইঞ্জেকসান নিয়ে খাট থেকে নেমে পড়ল ডোনা। দরজা খুলতে দেখল মাঝারি ট্রলির

ওপর ঢাকা দেয়া তিন চার পদের আর্লি মর্ণিং ব্রেকফাস্ট,ধোঁয়া উঠছে। ট্রলিটা দু'হাতে টেনে ভেতরে নিয়ে এল ডোনা। চোখ মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে দাঁত মেজে গরম গরম ব্রেকফাস্ট খেয়ে বাইরে গিয়ে ঢুকে পড়ল পাশের কামরায়, দেখল তার বাবা মার দু'জনেরই ঘুম ভেঙ্গেছে। আধ শোয়া হয়ে বেডটি-র পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছেন তাঁরা। গতকালের মতই ব্রেকফাস্ট খেয়ে পল কুমেদন কাজে বেরোলেন। গতকাল সারাদিনের ঘোরাঘুরির ফলে ডোনার গায়ে ব্যাথা হয়েছে সে তাই তার কামরায় শুয়ে রইল। তার মা হোটেলের কাছেই কিছু কেনাকাটা সেরে তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন। আগামিকাল লাঞ্চ খেয়েই তাঁদের হোটেল ছেড়ে দেবার কথা, তাই মেয়ের সঙ্গে হাত লাগিয়ে মালপত্র গুছিয়ে বেঁধে ফেললেন।

ম্যানেজারদের দেয়া পার্টিতে ছোটখাটো ভাষণ, হালকা মদ্যপান আর খাওয়া দাওয়া সেরে পল কুমেদন যখন হোটেলে ফিরে এলেন তখন সাড়ে আটটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি। রুম সার্ভিসে টেলিফোন করে রাতের ডিনার কামরায় পৌঁছে দিতে বললেন পল। খেয়েদেয়ে সাড়ে ন'টা নাগাদ তিনজনে শুয়ে পড়লেন।

ঘটনাটা ঘটল পরদিন ভোরে। গতকালের মতই টেলিফোনের আওয়াজে ডোনার ঘুম গেল ভেঙ্গে, ধড়মড় করে উঠে রিসিভার তুলে কানে ঠেকাতেই শুনতে পেল রিসেপশনিস্টের গলা, "গুড মর্ণিং, ম্যাডাম। সকাল সাড়ে পাঁচটা বেজেছে। আপনার ইঞ্জেকসানটা নিয়ে নিন। আপনার ব্রেকফাস্ট দরজার বাইরে ট্রলিতে সাজানো আছে।" অভ্যস্ত হাতে ইঞ্জেকসান নিয়ে খাট থেকে নামল ডোনা, দাঁতমেজে দরজা খুলে বাইরে আসতেই থমকে গেল, কোথায় ব্রেকফাস্টের ট্রলি? খালি করিডর সুনসান। ধারে কাছে একটি প্রাণীকেও চোখে পড়ছে না। পাশের কামরার দরজায় টোকা দেবার খানিক বাদেই দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে ডোনা দেখল বাবা মা দু'জনেরই গায়ে রাত পোষাক। বাবা দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। দরজা খুলে দিয়ে মাও গিয়ে শুয়ে পড়েছেন স্বামীর পাশে।

"বাবা, ওঠো!" পল কুমেদনের গায়ে হালকা ঠেলা দিল ডোনা। ঠেলল মাকেও, "ভোর হয়ে গেছে, সাড়ে পাঁচটা কখন বেজে গেছে, জলদি ওঠো।"

"কি হচ্ছে, ডোনা?" ঠেলাঠেলিতে পলের ঘুম গেল ভেঙ্গে, চোখ মেলে মেয়েকে দেখে তিনি চমকে উঠলেন। চোখের কাছে হাতঘড়ি এনে সময় দেখে বললেন, "ভোর হতে এখনও দেরি আছে। এত সকালে উঠেছো কেন? যাও, গিয়ে শুয়ে পড়ো।"

বাবার কথা শুনে নিজেও চমকে উঠল ডোনা। বাবার হাতঘড়ির দিকে চোখ পড়তে দেখে সবে সোয়া চারটে। তার মানে ভোর হতে এখনও দেরি আছে। একটি কথাও না বলে নিজের কামরায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। বেলা বাড়তে ভোরবেলায় টেলিফোনের কথা মা বাবাকে খুলে বলল। শুনে পল আর তাঁর স্ত্রী দু'জনেরই রেগে গেলেন। ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিচে এসে কর্তব্যরত রিসেপশনিষ্টকে ঘটনাটা জানিয়ে বললেন, "আমি জানতে চাই আমার অসুস্থ মেয়ের সঙ্গে এরকম রসিকতা আপনি কোন সাহসে করেছেন? সন্তোষজনক উত্তর দিন। নয়ত আমি ম্যানেজারের কাছে রিপোর্ট করব আপনার নামে।"

"আপনি মিছিমিছি আমার ওপর রাগ করছেন," রিসেপশনিস্ট সব শুনে বলল, "আজ রাত সাড়ে চারটেয় আমি ডিউটিতে ছিলাম না। তখনও হোটেলে আসিনি আমি।"

"তাহলে কে আমার মেয়েকে ফোন করল?" জানতে চাইলেন পল, "ভোর হয়ে গেছে বলে রাত সাড়ে চারটেয় কে তার ঘুম ভাঙ্গাল?"

"যে ভাঙ্গিয়েছে সে আর বেঁচে নেই, স্যার, " রিসেপশনিস্ট বলল, "কাজেই ইচ্ছে করলে আপনি ম্যানেজারের কাছে এ ব্যাপারে নালিশও করতে পারেন। তবে তাতে কোনও লাভ হবে না। আমাদের ম্যানেজার সবই জানেন।"

"আপনার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই ত বুঝতে পারছিনা, " পল কুমেদন বোকার মত বললেন, "বেঁচে নেই বলতে কার কথা বলছেন আপনি?"

"যার কথা বলছি তার নাম রিটা," বলতে বলতে রিসেপশনিস্ট যুবতীর গলা ভারি হয়ে এল। "রিটা অ্যান্ড্রুজ। এখানকার রুম সার্ভিসের সে ছিল একজন স্টাফ। হোটেলেরই এক স্টুয়ার্ডকে ভালবেসে ছিল সে। বিয়ে করে ঘর বাঁধার জন্য তৈরিও হচ্ছিল। কিন্তু শেষমুহূর্তে একদিন রিটা জানতে পারে তার প্রেমিক বিবাহিত। দু'টি সন্তানও তার আছে। খবর সত্যি প্রমাণিত হবার পরে রিটা আত্মহত্যা করে জীবনের জ্বালা জুড়োয়। কিন্তু মারা গেলেও পুরোনো কাজের জায়গার মায়া এখনও কাটাতে পারে নি বেচারি। রাতের শিফটে তার আত্মা মাঝেমাঝেই আসে এই কাউন্টারে। টেলিফোন অপারেটরের কাজ জানত রিটা, নাইট শিফটে কেউ না থাকলে ওর বিদেহী আত্মা বাইরের সব টেলিফোন কল অ্যাটেণ্ড করে। কেউ মেসেজ দিলে তা নোটও করে। কিন্তু বেঁচে থাকতে মেয়েটা ছিল বড্ড দুষ্টু, যখন তখন কাজের সময় আমাদের রুমাল, কলম, হাত ব্যাগ এসব লুকিয়ে রাখত। মারা যাবার পরেও ওর সেই দুষ্টুবুদ্ধি তখনও বজায় আছে আগের মতই। কাউন্টারে কেউ না থাকলে ইচ্ছেমতন যাকে খুশি তাকে টেলিফোন করে উল্টোপাল্টা খবর শুনিয়ে ঘাবড়ে দেয়। কিচেনে, নয়ত রুম সার্ভিসে ফোন করে একজনের খাবার আরেকজনের কামরায় পৌঁছে দেবার হুকুম দেয়। গতকাল রাতের শিফটে যে রিসেপশনিষ্ট ছিল আচমকা শরীর খারাপ হওয়ায় সে রাত দেড়টা নাগাদ ডিউটি অফ করে বাড়ি চলে গিয়েছিল। আমি নিশ্চিত সেই ফাঁকেই রিটার আত্মা এসে ঢুকেছিল কাউন্টারে। আপনাব মেয়ের সঙ্গে এই বাজে রসিকতা নিশ্চয়ই তার কাজ। মিঃ কুমেদন, রিটা বেঁচে থাকতে ছিল আমারই সহকর্মি, তাই এজন্য তার হয়ে আমি আপনার কাছে মাফ চাইছি।"

"বুঝতে পারছি আমার মেয়ের সঙ্গে রসিকতা করা হলেও গোটা ব্যাপারটাই দুঃখজনক," পল কুমেদন বললেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এ নিয়ে আমি আর এগোব না।"

"ধন্যবাদ, স্যার।"

"কিন্তু আপনি কি বলতে চান আজ ভোরে আমার মেয়েকে যে ফোন করেছিল সে মানুষ নয়, ভূত?" প্রশ্ন করলেন মিসেস কুমেদন।

"ঠিক তাই, ম্যাডাম," বলল রিসেপশনিস্ট।

ব্রাইটনের রেসর্টে ভূত

"তুমি যাই বলো না কেন, আমার মতে এ কাজে হাত দেয়া বাবার মোটেও উচিত হয় নি?" ড্যানি হাত নেড়ে তার মাকে বোঝাতে চাইল।

"কোন কাজের কথা বলছ ড্যান", ভুরু কুঁচকে ছোটছেলের মুখের দিকে তাকালেন তার মা, "ভুলে যেয়োনা তোমার বাবা ছিলেন সফল ব্যবসায়ী। কঠোর পরিশ্রম করে যে বিপুল সম্পদ তিনি সারাজীবন ধরে সংগ্রহ করেছেন মূলে ছিল একটিই অনুপ্রেরণা—স্ত্রী আর দুই ছেলের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানো আর তাদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ করা। আজ তিনি নেই বলে তুমি তাঁর কাজের সমালোচনা করছ। প্রতিদানের এই কিনা নমুনা।"

"মানছি তিনি আমাদের সুখের কথা ভেবেই সব করেছেন কিন্তু বিনিময়ে কাদের সর্বনাশ করেছেন সে খবর রাখো? ব্রাইটনে সমুদ্রের ধারে যে রিসর্ট বাবা করে গেছেন সেখানে আগে এক বৃদ্ধাবাস ছিল তা জানো? সন্তান, আর আত্মীয়স্বজনেরা যাদের খোঁজখবর নেয় না এমন কিছু অসহায় বুড়ো মানুষের ঠাঁই ছিল ওখানে। সেই অসহায় লোকগুলোকে তাড়িয়ে বাবা ওখানে গড়ে তুললেন সি সাইড রিসর্ট। আমাদের স্বার্থ দেখতে গিয়ে একদল অসহায় মানুষের স্বার্থহানি ঘটালেন এই ব্যাপারটাই আমি-মন থেকে মেনে নিতে পারছি না।"

"তুমি যা শুনেছো তার পুরোটা ঠিক নয়," এলিজা বললেন, "হ্যাঁ, ঐ বাড়িতে আগে নিরাশ্রয় বুড়ো মানুষদের ঠাঁই ছিল ঠিকই, কিন্তু তোমার বাবা ঐ বাড়ি কেনার অনেক আগে থেকেই তারা দলে দলে চলে যেতে শুরু করেছিল।

"কেন?"

"ওদের মধ্যে একজনের মাথায় গোলমাল ছিল সে একদিন গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। শুনেছি তারপর থেকে ওখানে শুরু হয় ভূতের উৎপাত। দিনে রাতে যখন তখন সেই মাথা খারাপ বুড়োর প্রেতাত্মা দেখা দিতে লাগল। তার উৎপাতে ভয় পেয়ে সবাই পালাল। সিস্টার ক্রিস্টিনা নামে মাঝবয়সী নার্স হাসপাতালের চাকরি থেকে অবসর নিয়ে ঐ বৃদ্ধাবাস গড়েছিলেন। সবাই পালিয়ে যাবার পরে তিনি দেখলেন ভূতের বদনাম এতদূর রটেছে যে থাকার লোক পাওয়া যাচ্ছে না। শেষকালে উনি খবরের কাগজে তোমার বাবার দেয়া বিজ্ঞাপন দেখে বাড়িটা বেচে দিলেন। কাজেই তোমার বাবা ঐ বাড়ির বাসিন্দাদের তাড়িয়েছেন তোমার এ ধারণা ভুল, তারা আপনিই চলে গেছে।"

"বাবা দেখেশুনে একটা ভুতুড়ে বাড়ি কিনলেন!" ড্যানি বড় বড় চোখে তাকাল। "খবর জানাজানি হলে কে আর বেড়াতে এসে উঠবে ওখানে?"

"ভূত না দেখেই তার ভয়ে আধমরা হওয়া লোকের স্বভাব, ড্যান।" মিসেস বার্কার হাসলেন, 'বাড়িটা কেনার পরে পুরো তিন মাস ধরে এত লোক দিনরাত সেখানে কাজ করল। কই তাদের কেউ ত একদিনের জন্য ভূত দেখেছে বলে শুনিনি। আর ভূত যদি থেকেই থাকে, তাহলে মিস্ত্রিরা ও বাড়ির ছালচামড়া ছাড়িয়ে নতুন চেহারা দেবার পরে সেও পালিয়েছে ও তল্লাট ছেড়ে। দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধের পরে এখন দুনিয়ায় আর ভূত আছে নাকি? রিচার্ডের কপাল মন্দ তাই বাড়িটা কেনার পরে পরেই হার্টফেল করে মারা গেল বেচারা। কিন্তু তোমরা তার দুই

ছেলে, তোমরা আছো। ব্রাইটনের সাগরপারে এত ভাল রিসর্ট আর একটিও নেই। এককে সিজনে অনায়াসে ঐ রিসর্ট থেকে দশ পনেরো হাজার পাউণ্ড লাভ তোমরা ঘরে তুলতে পারবে। দেড় দু'বছর এভাবে কাটাতে পারলে ঐ বাড়ির লাগোয়া জমিতে একটা বড় সড় ফাইভ স্টার হোটেল তৈরি করার পুঁজি তোমাদের হাতে এসে যাবে। সেই দিন ড্যানি, সেইদিন তুমি বুঝবে ঐ বাড়ি কিনে তোমাদের বাবা কতটা দুরদর্শিতায় পরিচয় দিয়েছিলেন। আমি সেই দিনটির অপেক্ষাতেই বসে আছি।"

"সব ত শুনলাম," ড্যানি চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে বলল, "তা আমায় কেন ডেকেছো তাই বলো।"

"তোমার দাদা জ্যাকের বিয়ের রিসেপশন পার্টিটা ঐ বাড়িতেই আমার দেবার ইচ্ছে, ড্যান," মিসেস বার্কার বললেন, "ব্যবসায় লাগানোর আগে পরিবারের একটা শুভকাজ ওখানে করিয়ে নিতে চাই। আর তাই তোমার নিজে ওখান যেতে হবে। পার্টির আগে বাড়িটা সাজাতে হবে। ইওরোপ আমেরিকা থেকে আমাদের আত্মীয়বন্ধুরা সবাই আসবেন, সপরিবারে দু'একদিন তাঁদের ওখানে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। ওখানে জোসেফ আছে। বৃদ্ধাবাসের পুরোনো কুক, সে তোমাকে সাহায্য করবে। কাজেই ড্যান, তোমার কোনও অসুবিধে হবে না। সময় নষ্ট না করে তুমি আজই রওনা হলে ভাল হয়। আর এই কথাটা বলব বলেই তোমাকে হোস্টেল থেকে ডাকিয়ে এনেছি। আমার বলা শেষ তুমি এবার যেতে পারো।"

খুব ব্যাজার মুখেই ড্যান বার্কার লণ্ডন ছেড়ে এসে হাজির হল ব্রাইটনে সমুদ্রের ধারে তাদের হালে কেনা পেল্লায় বাড়িটিতে। বাপের ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, বা ভুতুড়ে বাড়ি কেনার জন্য নয়, ইন্টার ইউনিভার্সিটি ফুটবল টুর্ণামেন্ট শুরু হতে আর দিনসাতেক বাকি, সাউদ্যাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ে রেডিও ফিজিকসে অনার্স নিয়ে বি এস সি পড়ছে ড্যান, থাকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের লাগোয়া হোস্টেলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল টিমের সে একাধারে গোলরক্ষক ও ভাইস ক্যাপটেন। টুর্নামেন্টের প্রথম দু'দিন লিড্সে আর কেমব্রিজ, দু'দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে খেলা। টিম হিসেবে দু'টি দলই প্রচণ্ড শক্তিশালী। যখন দিনরাত শুধু প্র্যাকটিস চালানোর কথা এমনই সময় মার হুকুমে সেই গুরুদায়িত্ব শিকেয় তুলে তাকে যেতে হচ্ছে বড় ভাই-এর বিয়ের আসন্ন পার্টি উপলক্ষে বাড়ি সাজাতে। জ্যাকটাও যেমন বিয়ে করার আর সময় পেল না।

রোগা পটকা, মাথার অর্দ্ধেক টাক, গাল বসা। এই হল জোসেফ টাটার। একসময় সে ছিল সিস্টার ক্রিস্টিনার বৃদ্ধাবাসের কুক্। হাতবদল হবার পরে বৃদ্ধাবাসের ঐ একটি কর্মচারীকে ড্যানের বাবা চাকরি দিতে রাজি হয়েছিলেন। এখন জোসেফ সি সাইড রিসর্টের কেয়ারটেকার। বড় ভাইয়ের আসন্ন ম্যারেজ পার্টি উপলক্ষে বাড়ি সাজানোর ব্যবস্থা করতে ড্যান এসেছে জেনে খুশি হল জোসেফ, সব জোগাড় যন্ত্রের দায়িত্ব তাকে দিয়ে ড্যান বিশ্রাম করতে পারে এই বলে তাকে আশ্বস্ত করল সে। নতুন বাড়িতে পেঁছোতে পৌঁছোতে ড্যানের সন্ধে পেরিয়ে গিয়েছিল। ইউনিভার্সিটিতে টেলিফোর করে নিজের অসহায় অবস্থায় কথা টিমের ক্যাপ্টেনকে জানিয়ে দেবার পরেই জোসেফ জানাল ঠিক আটটায় ডিনার দেবে।

ডিনার সেরে করিডরে সমুদ্রমুখী খোলা জানালার সামনে ডেক চেয়ার পেতে বসল ড্যান। জোসেফ গরম কপি করে এনেছে। পেয়ালায় আলতো চুমুক দিয়ে ড্যান জিজ্ঞেস করল। "জোসেফ, এখানকার বৃদ্ধাবাসে ক'বছর কাজ করেছো?"

"তা পনেরো কুড়ি বছর ত হবেই, তার কম নয়," এক গাল হেসে জবাব দিল জোসেফ।

"বৃদ্ধাবাস যিনি তৈরি করেছিলেন সেই সিস্টার ক্রিস্টিনা এখন কোথায় আছেন জোসেফ?"

"আজ্ঞে তিনি ত বেঁচে নেই, ছোটকর্তা," জোসেফ মাথা নামিয়ে বলল, " বাড়ি বিক্রি হবার দিন পনেরো বাদেই হার্টফেল করে মারা যান।"

"তোমায় একটা প্রশ্ন করছি, আশা করি সদুত্তর পাব," জোসেফের চোখে চোখ রেখে জানতে চাইল ড্যান, "শুনেছি এ বাড়িতে নাকি ভূত আছে, কথাটা সত্যি? এও শুনেছি ভূতের ভয়েই নাকি আগের বাসিন্দারা বৃদ্ধাবাস ছেড়ে চলে গিয়েছিল? সত্যিই এসব ঘটেছিল?"

"কিছু মনে করবেন না ছোটকর্তা," অতি বশম্বদ ভৃত্য জোসেফের গলা নিমেষে পাল্টে গেল, "আনন্দের দিনে সুখের মুহূর্তে এ প্রসঙ্গ না করলেই পারতেন। হ্যাঁ, আপনি তা শুনেছেন তাতে ভুল নেই, এ বাড়িতে সত্যিই ভূতের উৎপাত শুরু হয়েছিল, এখানে যারা থাকত তারাও সেই ভূতের ভয়েই একে একে চলে যেতে শুরু করেছিল।"

"ভূতের উৎপাত কি গোড়া থেকেই এখানে ছিল?' জোসেফ এ প্রসঙ্গ পছন্দ করছে না জেনেও আবার প্রশ্ন করল ড্যান।

"আজ্ঞে না," জোসেফ বলল, "আমি এতদিন কাজ করেছি এখানে, তেমন কিছু কখনও দেখিনি কানেও আসেনি। ঝামেলা বাঁধাল বুড়ো জেমস, পুরো নাম জেমস ম্যাকেঞ্জি। লোকটা যখন প্রথম এসেছিল তখন তার কোনও অসুখ ছিল না। এখানে আসার বছর চার পাঁচ বাদে ওর ব্যাঙ্ক ফেল পড়ল, প্রচুর টাকা তার ফলে লোকসান হল। সেই টাকার শোকে বুড়ো জেমসের মাথাটাই গেল খারাপ হয়ে। পেটপুরে খেত না, রাতে ঘুমোতনা। নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে একনাগাড়ে পায়চারি আর আপনমনে বিড় বিড় বকা, এই হয়ে দাঁড়াল তার দিনরাতের কাজ। বোর্ডারদের মধ্যে ডাঃ পিটার্স নামে এক ডায়াবেটিসের রুগি, সিস্টার ক্রিস্টিনার অনুরোধে তিনি মাঝে মাঝে ওষুধ দিয়ে জেসম বুড়োকে শান্ত রাখতেন।

ঘুমপাড়ানি ইঞ্জেকশনও দিতেন। সুগার অস্বাভাবিক বেড়ে মারা যাবার আগে পর্যন্ত ডঃ পিটার্স সাধ্যমতন জেমস বুড়োর চিকিৎসা করেছেন। পাগলামি বেড়ে গেলে খাওয়া ঘুম সবই বন্ধ করে দিত জেমস, তখন সিস্টার ক্রিস্টিনা নিজে এসে সাধ্যসাধনা করে তাকে খাওয়াতেন। ছোট বাচ্চার মত গান গেয়ে, আদর করে ঘুমও পাড়াতেন। কিন্তু সিস্টার নিজেও ত মানুষ, এইভাবে ক'দ্দিন চলে। একবার কি কাজে তিনি হোম-এ ছিলেন না। ডঃ পিটার্স নিজেও অসুস্থ ছিলেন। পূর্ণিমার রাতে জেমস বুড়ো খাওয়া বন্ধ করল। আর সব বোর্ডারদের খাইয়ে আমি শুয়ে পড়েছি। ভোরবেলা মর্ণিং টি দিতে গিয়ে দেখি সিলিং-এ আংটার সঙ্গে বাঁধা দড়ির ফাঁসে ঝুলছে বুড়ো জেমস ম্যাকেঞ্জির নিথর শরীর। সিস্টার ফিরে এসে ওর আত্মহত্যার খবর শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন। তা হুজুর, জেমস বুড়োর আত্মার সদগতি হল না। তারপর থেকে প্রায়ই বেশি রাতে তার ভূত দেখা দিতে লাগল। এরই মাঝে ডঃ পিটার্সও মারা গেলে সিস্টার একদম একা হয়ে পড়লেন। বোর্ডাররাও নানা ওজর দেখিয়ে একজন দু'জন করে চলে যেতে লাগল। সিস্টারেরও কেউ কোথাও ছিল না। উনি বাড়ি বেচে দেবেন ঠিক করলেন। আপনার বাবাকে বাড়ি বিক্রিও করলেন। তারপর আপনারা বাড়ির দখল নেবার আগেই উনি হার্টফেল করে মারা গেলেন। ক'বছরের মধ্যে গোটা জায়গাটা একদম সুনসান হয়ে গেল। কিছু মনে

করবেনা না হুজুর, বহুবছর হল এখানে কাজ করছি কিনা।' তাই একেক সময় মনে হয় এখানকার মাটিতে আমার শরীর আর মন শিকড় গেড়ে বসেছে। পুরোনো কথা ভাবতে গেলে চোখে জল আসে মন খারাপ হয়ে যায়।"

"আমার শীত শীত করছে জোসেফ," পট থেকে শেষ কফিটুকু কাপে ঢালল ড্যানি। "বিছানা থেকে আমার কম্বলটা যদি এনে দাও ত গায়ে জড়িয়ে আরেকটু বসি।"

"রাত বাড়ছে ছোট কর্তা,"জোসেফ বলল, "বাইরে ঠাণ্ডা ঝোড়ো বাতাস বইছে। এবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন।"

"এই বাকিটুকু খেয়েই উঠছি," ড্যান হাসল। "আসলে একা আছি ত, তাই তোমার গল্প শুনতে বেশ ভাল লাগছে।"

দৌড়ে খাট থেকে কম্বল নিয়ে এল জোসেফ, তাই দিয়ে গা মুড়ে ড্যান বলল, "জেমস বুড়োর ভূত এখন আর দেখা দেয় না, জোসেফ?"

"না হুজুর," জোসেফ বলল, "বাড়ি হাতবদল হবার পরে আর একদিনও সে দেখা দেয়নি। তাছাড়া পুরোনো বোর্ডাররা সবাই ত এক এক করে চলে গেছে, কাজের টানেই বা আসবে কে? তবে সিস্টার ক্রিস্টিনার কথা আলাদা, নিজে হাতে গড়া 'ওল্ড এজ হোম ফর দ্য লোনলি ওয়ানস'-এর মায়া উনি কাটাতে পারেন নি, তাই মাঝেমাঝে এসে দেখা দেন। তবে ওঁর আত্মার দেখা যত কম পাওয়া যায় ততই মঙ্গল।"

"কেন?" অবাক হল ড্যান, "একথা বলছ কেন?"

"বলছি কারণ আমি লক্ষ করে দেখেছি ওঁর আত্মা যাকে দেখা দেন সে অথবা তার ঘনিষ্ঠ কেউ হয় কঠিন অসুখে নয়ত দুর্ঘটনায় পড়ে।"

"তোমার নিজের বেলায় তেমন কিছু ঘটেছে?"

"ঘটেছে বলেই ত বলছি ছোটকর্তা," জোসেফ আচমকা গলা নামাল। "আপনার বাবা এ বাড়ি কেনার পরে পরেই সিস্টারের আত্মা প্রথমবার দেখা দিলেন তখন আমি ছাড়া পুরোনো লোক আর একজনও ধারে কাছে ছিল না। গরমে ঘুম আসছিল না বলে ওপরে উঠে এসেছিলাম। বারান্দায় পা দিতেই থমকে গেলাম। স্পষ্ট দেখলাম এই ডেক চেয়ারে বসে আছেন সিস্টার। মাথায় তেমনি রেশমি লাল রুমাল বাঁধা। খোলা জানালা দিয়ে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছেন সাগরের দিকে। আমার পায়ের আওয়াজে ওঁর চমক ভাঙ্গল। মুখ ফিরিয়ে আমায় দেখতে পেয়ে একবার হাসলেন। তারপরেই ধীরে ধীরে কুয়াশার মত মিলিয়ে গেলেন।"

"তারপর?"

"পরদিন সকালেই সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম, বাঁ পায়ের গোড়ালির হাড় গেল ভেঙ্গে। এর কিছুদিন পরে আবার উনি দেখা দিলেন। দু'দিন বাদে টেলিগ্রামে আমার নাতনির মৃত্যুসংবাদ পেলাম। সেই থেকেই আমার ধারণা হয়েছে কোনও অমঙ্গল ঘটার আগে সিস্টার ক্রিস্টিনার আত্মা দেখা দেন।"

রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডার মাত্রাও বেড়ে চলেছে সমানভাবে। পটের কফি সবটুকু শেষ করে উঠে দাঁড়াল ড্যান, পায়ে পায়ে বারান্দার শেষ প্রান্তে নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে

দরজা ভেজিয়ে ছিটকিনি এঁটে দিল। বিছানায় শুয়ে গলা পর্যন্ত কম্বলে ঢেকে বেডসুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিল।

কতক্ষন ঐভাবে শুয়েছিল জানা নেই। একসময় চেঁচামেচির আওয়াজ কানে যেতে ড্যানের ঘুম গেল ভেঙ্গে। চোখ মেলতেই নজর পড়ল সামনের জানালার দিকে। ড্যান দেখল বন্ধ জানালার কাঁচের ওপাশে রাতের আকাশ কালো থমথমে। ভোর হতে অনেক দেরি। তাহলে ঘরের ভেতরটা এত স্পষ্ট হল কি করে। মনে মনে নিজেকে জিজ্ঞেস করল ড্যান। শোবার আগে সে ত আলো নিভিয়ে দিয়েছিল।

বালিশে মাথা রেখে ড্যান অবাক হয়ে দেখল অদ্ভুত চাপা অস্বচ্ছ আলোয় ঘরখানা ভরে উঠেছে আর সেই আলোর মধ্যে কয়েকজন মানুষ দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

চোর না ডাকাত? প্রশ্নটা মনের কোণে উঁকি দিতেই ড্যানের মনে পড়ল শোবার আগে এ ঘরের দরজার পাল্লা সে ভেজিয়েছিল। তারপর ভেতর থেকে এঁটে দিয়েছিল দরজার ছিটকিনি। এরপরে ঘরের ভেতর অন্য কারও ঢোকার ব্যাখ্যা সুস্থ বুদ্ধিতে পাওয়া যায় না। হাতের কাছে লাঠি বা ছুরি দূরে থাক একটা টর্চও না থাকায় নিজেকে ভারি অসহায় বোধ করল ড্যান। ঘাড় ঘুরিয়ে সে ঘরের ভেতরের জীবগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল।

ঘরের ভেতর আবছা আলোয় বেঁটে রোগা একটা লোককে দেখতে পেল ড্যান। দেয়ালের এক কোণে ঠেস দিয়ে আপনমনে বিড়বিড় করে কি বকছে আর থেকে থেকে এমন ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাচ্ছে যা দেখে মনে হয় তার মাথায় কোনও যন্ত্রণা হচ্ছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এক নারীমূর্তির আবির্ভাব ঘটল—মাঝবয়সী। পাতলা ছিপছিপে গড়ন। মাথায় লাল রেশমি রুমাল বাঁধা। নারীমূর্তি চোখে পড়তে ড্যানের বুকের ভেতরটা ধ্বক করে উঠল। পায়ে পায়ে সেই নারী এগিয়ে এল দেয়ালের এক কোণে দাঁড়ানো বেঁটে লোকটির কাছে। তার গায়ে মাথায় পরম মমতা ভরে হাত বুলিয়ে কি যেন বলতে লাগল। চাপা গলায় বললেও ড্যান স্পষ্ট শুনতে পেল কথাগুলো "না, আর দেরি কোর না জেমস। লক্ষ্মী ছেলের মত ওষুধটা খেয়ে নাও। " যুবতীর হাতে একটা ছোট কাঁচের গ্লাসে তরল ওষুধও টলটল করছে দেখল ড্যান।

"না, আমি ওষুধ খাব না," টাক মাথা বেঁটে লোকটা একগুয়ের মত বলল "ওষুধ খেতে আমার মোটেও ভাল লাগেনা।"

"ছিঃ এমন করতে নেই, সোনা," লাল রুমাল বাঁধা যুবতীর গলা আবার শুনতে পেল ড্যান, "ওষুধটা খেয়ে নাও জেমস। দ্যাখো, আমার কত কাজ এখনও বাকি। এত রাত হয়ে গেছে। এখনও আমার খাওয়া হয় নি, শুধু তোমার ওষুধটুকু খাওয়াব বলে বসে আছি। তুমি এটা ঢক ঢক করে খেয়ে নিলেই আজ রাতের মত আমার কাজ শেষ। তখন আমি খেয়ে চটপট শুতে পারব। কত সকালে আমায় উঠতে হয় তা তো জানো বাপু। তোমরা ছাড়া আমার যে আর কেউ কোথাও নেই। সব জেনেও তোমরা যদি এমন করো তাহলে আমি যাই কোথায়? ওকি, তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছো। নাও, ওষুধটা খেয়ে তারপর শুয়ে পড়ো।

"এখন ওষুধ খেতে বলছ," বাচ্চা ছেলের মত অবুঝ গলায় টাক মাথা বুড়ো বলল, "এরপর তুমিই আবার পিটার্স ডাক্তারকে ডেকে আনবে আমার ইঞ্জেকশান দিতে। ও ছুঁচ ফোটাতে বড্ড ব্যথা দেয়। আমি আর ওর হাতে থেকে ইঞ্জেকশন নেব না। তুমি দেখে নিয়ো।"

"এই ব্যাপার? যুবতী বললেন, "বেশ, তুমি যা বলবে তাই হবে, ডঃ পিটার্সের বদলে এবার থেকে আমিই তোমার ইঞ্জেকশন দেব। পিটার্স নিজেও অসুস্থ, তা ত জানো। জেমস, সুগার যা বেড়েছে তাতে ওঁর সব সময় শুয়ে বিশ্রাম নেবার কথা। তা না করে উনি দিনরাত তোমাদের চিকিৎসা করে বেড়াচ্ছেন। তুমি ওষুধটা খেয়ে নাও। তারপর আমি এখনই ওকে গিয়ে বলছি যাতে আর কখনও তোমায় ইঞ্জেকশন না দেন। নাও, লক্ষ্মী সোনা, ওষুধটা খেয়ে নাও!"

"কই দাও!" বলে বুড়ো হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা নিয়ে ওষুধ গলায় ঢালল। ঠিক তখনই দেয়ালঘড়িতে রাত দুটো বাজল। সঙ্গে সঙ্গে আলো ঘুচে গেল। লোকগুলোও গেল মিলিয়ে।

গোটা ঘরখানা ডুব দিল আঁধারে। খানিকক্ষণ সেই আঁধারে বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ড্যান। তারপর একসময় চোখ বুঁজে তলিয়ে গেল গভীর ঘুমের অতলে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে নিজেও জানে না ড্যান। অনেকক্ষণ বাদে বাইরে দরজার গায়ে টোকার আওয়াজে সে জেগে উঠল। "ছোটকর্তা, চা এনেছি।" বাইরে থেকে জোসেফের গলা তার কানে এল, "দরজা খুলুন।"

বিছানা ছেড়ে নামতে গিয়ে ড্যান দেখল তার সারা গায়ে অসহ্য ব্যাথা। ব্যাথার দপদপানিতে রগ, মাথা সব ছিঁড়ে পড়তে চাইছে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে গরম হল্কা বেরোচ্ছে স্পষ্ট অনুভব করল সে। অনেক কষ্টে জোর করে খাট থেকে নেমে এল ড্যান। এগিয়ে এসে দরজা খুলে দিল। ট্রেতে ধোঁয়াওঠা চায়ের পট নিয়ে দাঁড়িয়েছিল জোসেফ, ভেতরে ঢুকে ড্যানের মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল সে। ড্যানের দু'চোখ টকটকে লাল।

"এ কি ছোটকর্তা," বলে উঠল জোসেফ, "আপনার শরীর ত ভাল ঠেকছে না," ধরে ধরে তাকে নিয়ে এসে খাটে বসিয়ে দিল সে, কপালে হাতের তালু রাখল। তারপর মিনিটখানেক নাড়ির গতি দেখে বলল, "ঠিক ধরেছি। আপনার জ্বর হয়েছে। এ ঘর ছেড়ে এখন বেরোবেন না। বাইরে ঝোড়ো বাতাস বইছে, বারান্দায় গিয়ে বসলেই ঠাণ্ডা লাগবে। আপনি চা খেয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকুন। আমি আপনার ব্রেকফাস্ট তৈরি করে আনছি। গায়ে ব্যথা হয়েছে?"

"হ্যাঁ," ঘাড় নেড়ে কোনমতে বলল ড্যান।

"আপনি শুয়ে থাকুন, জ্বর আর গা ব্যাথার ওষুধ আমি এনে দিচ্ছি," বলে জোসেফ যাবার জন্য পা বাড়াতেই ড্যান তার জামা টেনে ধরল। জোসেফ মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই ড্যান বলল "তোমার কথাই দেখছি ঠিক হল জোসেফ, কাল রাতে এই ঘরে আমি তোমার সিস্টার ক্রিস্টিনার আত্মাকে দেখেছি। একটা বেঁটে টাকমাথা লোককে উনি গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ওষুধ খাওয়াচ্ছিলেন।"

"জেমস!" চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল জোসেফ। "ও হল জোসেফ ম্যাকেঞ্জি। ছোট কর্তা। ঐ লোকটাই এই বাড়িতে আত্মহত্যা করেছিল! আমি ত তখনই বলেছিলাম। সিস্টার ক্রিস্টিনার আত্মা দেখা দিলে অসুখবিসুখ না হয়ে যায় না। এখন দেখছেন ত? বিশ্বাস হল আমার কথা?"

"হল বৈকি," বলে চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল ড্যান, এই মুহূর্তে তার আর একটি কথাও বলতে ভাল লাগছে না।

ব্রেকফাস্টের পরে জোসেফের দেয়া বড়ি খেল ড্যান। কিন্তু তাতে কোনও কাজ হল না। জোসেফ বাড়িতে ড্যানের মা মিসেস বার্কারকে টেলিফোন করতে চেয়েছিল। কিন্তু ড্যান দু'হাত ধরে তাকে ফোন করতে বারণ করল।

"না হয় একটু জ্বর আর গায়ে ব্যাথা হয়েছে," বলল ড্যান, "ঠাঁই বদল হলে অমন হতেই পারে। তাই নিয়ে এত অস্থির হবার আছে কি শুনি! তার চেয়ে তুমি কাগজ কলম নিয়ে এসো। জ্যাকের ম্যারেজ পার্টির জন্য যোগাড়যন্তর যা যা করতে হবে আমি বলে যাচ্ছি। তুমি পর পর লিখে যাও। যে দায়িত্ব দিয়ে মা আমায় এখানে পাঠিয়েছেন তা পালন না করে আমি ফিরব না জেনে রেখো। জ্বর হয়েছে, সেরে যাবে।"

কিন্তু মুখে বললেও বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে গায়ের ব্যাথায় আরও কাবু হয়ে পড়ল ড্যান, জ্বরও বাড়তে লাগল একইভাবে। এদিকে সকাল থেকেই শুরু হয়েছে তুষারঝড়। সেইসঙ্গে প্রচণ্ডবেগে বইছে ঝোড়ো বাতাস। ডাক্তার ধারে কাছে একজনও নেই। কাছাকাছি একমাত্র হাসপাতালটি কম করে তিন চার মাইল দূরে, তাই এই প্রচণ্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগে সেখানে ড্যানকে নিয়ে যাওয়া জোসেফের পক্ষে কোনমতেই সম্ভব নয়। তবে জোসেফ সাধ্যমত তার ছোটকর্তা ড্যানের শুশ্রূষার ত্রুটি করছে না। একটা পুরোনো গ্রাম্য টোটকাও ছোটকর্তার ওপর প্রয়োগ করেছে জোসেফ। কুসুম কুসুম গরম জলে খানিকটা মিশিয়ে খাইয়েছে তাকে। খেয়ে খানিকটা সুস্থ অবশ্যই বোধ করেছে ড্যান। কিন্তু হেঁটে চলে বেড়ানোর পক্ষে সেই সুস্থতা যথেষ্ট নয়। আসলে ড্যান নিজে ছটফটে, তার ওপর খেলোয়াড়। তাই একনাগাড়ে বিছানায় পড়ে থাকাই তার কাছে অসহ্য ঠেকছে। অথচ শুয়ে না থেকেই বা করবে কি।

এ ঘরে আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ির মত একখানা পুরোনো রেডিও সেট আছে বটে, কিন্তু হতচ্ছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন সেটা ঠিকমত কাজও করছে না। হাতের কাছে গল্পের বই বা ম্যাগাজিনও নেই যার পাতায় চোখ বুলিয়ে সময় কাটানো যায়।

জ্বর আর গা ব্যাথা কখনও কমছে কখনও বাড়ছে এই অবস্থা সইয়ে দিনের বেলাটা কাটিয়ে দিল ড্যান। রাতে কড়া করে শেকা দু'পিস পাউরুটির সঙ্গে এক কাপ মুর্গির সুপ দিয়ে ডিনার সারল সে। অল্প গরম জলে মেশানো খানিকটা রাম গলায় ঢেলে ন'টা নাগাদ কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল ড্যান। ভেতর থেকে ছিটকিনি বন্ধ করতে বারণ করে বিদায় নিল জোসেফ। যাবার আগে আলো নেভাল। বাইরে গিয়ে দরজার পাল্লা টেনে এঁটে দিল। চুপচাপ চোখ বুঁজে শুয়ে থাকতে থাকতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল ড্যান।

গতকালের মতই গভীর রাতে অনেক লোকের গলা কানে যেতে ড্যানের ঘুম আজও গেল ভেঙ্গে, পাশ দিয়ে চোখ অল্প মেলতে গতকালের বিদেহী কুশীলবদের আবার দেখতে পেল। মাথায় লাল রেশমি বাঁধা মাঝবয়সী মহিলা আর বেঁটে টাকমাথা সেই লোকটা।

"আজ একদম ঝামেলা করবে না। জেমস"। মহিলার গলা স্পষ্ট শুনতে পেল ড্যান। "এ বাড়ির এখন যিনি মালিক তাঁর ছোটছেলে শুয়ে আছে এ ঘরে, ছেলেটা এসেই অসুখে পড়েছে। জ্বর আর গায়ের ব্যাথায় সারা দিন ছটফট করেছে। হাতের কাছে ওষুধ নেই। ডাক্তার নেই। বেচারা সবে একটু চোখ বুঁজেছে। এখন গোলমাল করে ওর ঘুম ভাঙ্গিয়োনা।" অবুঝ জেমস-এর কোনও বায়নাক্কা শুনতে পেল না ড্যান? চোখ বুঁজে পড়েছিল এমন সময় টের পেল কার

ঠাণ্ডা হাতের আঙ্গুল খেলে বেড়াচ্ছে তার মাথায় কপালে। আঃ, কি ঠাণ্ডা সেই হাতের ছোঁয়া। শান্তিতে গোটা শরীর যেন জুড়িয়ে গেল। ইচ্ছে করেই চোখ বুজে রইল ড্যান। আর খানিক বাদে শুনতে পেল কানের কাছে সেই মহিলার গলা, "মাথাটা একটু তোল ত বাবা। হ্যাঁ করো। আমাদের ডঃ পিটার্স জ্বরের ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছেন তোমার জন্য, এক ঢোঁকে খেয়ে নাও। কাল সকালের মধ্যে জ্বর ছেড়ে যাবে। খাও, বাবা আমার। আমাদের বেশিক্ষণ থাকতে কষ্ট হয়। তুমি আমার ছেলের মত। তাই এসেছি। ওষুধটুকু খাইয়েই চলে যাব। নাও বাবা, একটু কষ্ট করে হাঁ করো।"

স্বপ্ন দেখছে না ড্যান তা জানে। গোড়ায় ঘাবড়ে গেলেও মহিলার গা জুড়োনো হাতের ছোঁয়ার কথা মনে করে ভয়ে ভয়ে মাথা অল্প তুলে হাঁ করল সে। টক মিষ্টি স্বাদের খানিকটা তরল পদার্থ কেউ ঢেলে দিল তার মুখের ভেতর। নিশ্বাস ভর করে গিলে ফেলার পড়ে আবার হাঁ করল ড্যান। এবার ওষুধ ধোয়া খানিকটা জলও ঝরে পড়ল মুখের ভেতর। ওষুধ খেয়ে আবার বালিশে মাথা রাখল ড্যান। ঘুমিয়ে পড়ল অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে।

পরদিন সকালে চা নিয়ে এসে জোসেফ ডেকে তুলল ড্যানকে। চোখ মেলতেই ড্যান টের পেল তার শরীর পালকের মত হালকা লাগছে। জ্বর বা গা ব্যাথার লেশমাত্র নেই।

"সিস্টার মানুষ ছিলেন না ছোটকর্তা" ঘর থেকে চলে যাবার সময় জোসেফ বলল, "ওঁর দয়ায় বেঁচে গেলেন এবারের মত।"

"দুনিয়ায় আমি হয়ত একমাত্র লোক ভূতের দেয়া ওষুধ খেয়ে যার জ্বর ছেড়েছে," বলে হাসতে হাসতে পরদিন সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল ড্যান। লণ্ডনে ফিরে মাকে সব কথা খুলে বলল। মিসেস বার্কার কেনও মন্তব্য করলেন না বটে কিন্তু তাঁর ঠোঁটে ফুটে ওঠা অবিশ্বাসের হাসি ড্যানের চোখ এড়াল না।

হপ্তার শেষে ড্যানকে নিয়ে মিসেস বার্কার নিজে এলেন ব্রাইটনে নতুন কেনা বাড়িতে। ঘটনাক্রমে মিস্টার ক্রিস্টিনার বিদেহী আত্মা সেদিন আবার দেখা দিল। ডিনার সেরে রেডিও চালিয়ে গান শুনছিলেন মিসেস বার্কার। ড্যান বসেছিল পাশের সোফায়, স্পষ্ট দেখতে পেল সেই বিদেহী নার্স এসে দাঁড়ালেন তার মার পেছনে গা ঘেঁষে। তার দিকে তাকিয়ে কি যেন বলতে চাইলেন কিন্তু ড্যান তা বুঝতে পারল না। মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার আগেই সেই মূর্তি মিলিয়ে গেল। পরদিন ছেলেকে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে লণ্ডন রওনা হলেন মিসেস বার্কার। মাঝপথে ব্রেক ফেল করে গাড়িটা বেদম জোড়ে ধাক্কা মারল এক গাছের গুঁড়িতে। হাসপাতাল কাছেই ছিল। সেখানে নিয়ে যাবার পরে এমারজেন্সিতে কর্তব্যরত ডাক্তাররা মিসেস বার্কারকে পরীক্ষা করে ভর্তি করলেন। ড্যান জানল অল্পের ওপর বেঁচে গেছে তার মা। শুধু বাঁ কাধের দুটো হাড় ভেঙ্গেছে। আঘাত গুরুতর নয়। তবে একটানা দু'মাস ট্র্যাকসান লাগিয়ে শুয়ে থাকতে হবে।

হাসপাতাল থেকে ছুটি পাবার পরদিন মাকে সিস্টার ক্রিস্টিনার বিদেহী আত্মার কথা আবার শোনাল ড্যান। শুনে এবার আর অবিশ্বাসের হাসি হাসতে পারলেন না তিনি। বড়ছেলে জ্যাকের বিয়ে পিছিয়ে দিলেন। ড্যানের দিকে তাকিয়ে বললেন। 'আজই খবরের কাগজে ও বাড়ি বিক্রি করব বলে বিজ্ঞাপন দাও। তারপর ম্যারেজ পার্টির দিন ঠিক করা যাবে। এসব ভূত পেত্নি নিয়ে রিসর্ট চালানো যাবে না।"

"এখুনি যাচ্ছি " বলল ড্যান। "তবে আমার অসুখে জোসেফ যে সেবা করেছে তাতে আমাদেরও প্রতিদান হিসেবে ওর জন্য কিছু করা উচিত। জোসেফ যতদিন বাঁচবে ততদিন তাকে চাকরিতে বহাল রাখতে হবে। বাড়ি বিক্রির এটাই হবে শর্ত। হাজার হলেও ভূতের গোমস্তা বলে কথা।"

"তোমার যখন এতই সাধ তখন তাই হবে।" হেসে বললেন মিসেস বার্কার।

"বেশ ত," ছোটছেলের রসিকতা শুনে হাসলেন মিসেস বার্কার, "তোমার যখন সাধ হয়েছে তখন তাই হবে।"

ভূতের বাড়িতে ফাদার গ্রেগরি

"এত দেরি হল ফাদার?" হাতের ল্যাম্পটা উঁচু করে ধরল জেকব। "পথে কোথাও অসুবিধায় পড়েন নি ত?"

"আরে না, ওসব কিছু নয়।" ফাদার গ্রেগরি হাসলেন, "আসলে হেনরি ডেক্সটারের বাড়িতে ঢোকার মুখে ও পাড়ার আরও কিছু লোক আমায় দেখে ফেলেছে। তাদের বাড়িতেও রুগি আছে। হেনরির কনফেসন নিয়ে বেরোতে যাচ্ছি এমন সময় তারা এসে ধরল তাদের বাড়িতেও কালাজ্বরের রুগি মরণের দিন গুণছে। চোখ বোঁজার আগে পাদ্রির কাছে সারাজীবনের কুকর্মের স্বীকারোক্তি করতে চায়। নয়ত মরলে স্বর্গে ঠাঁই হবে না। পাদ্রির আলখাল্লা যখন গায়ে চাপিয়েছি তখন একথা শোনার পরে চুপ করে থাকি কি করে। তুমিই বলো জেকব! হেনরির বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঐ এলাকায় আরও পাঁচজনের বাড়ি যেতে হল আরও আটজন কনফেশন করল। সব সেরে আসতেই না এত দেরি হল! তুমি আমার বসার ঘরে, শোবার ঘরে, লাইব্রেরিতে, আর বারান্দায় ইউক্যালিপটাসের ধুনো জ্বালিয়েছো?"

"রেক্টরির একটা কোজও বাদ দিই নি, ফাদার। " জেকব জোড় গলায় বলল, "এবার হাতমুখ ধুয়ে খেয়ে দেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ুন, রাত অনেক হল।"

হাতমুখ ধুয়ে রাতের খাওয়া সারলেন ফাদার গ্রেগরি, জেকব শোবার ঘরে তাঁর বিছানা পেতে দিয়ে বলল, "আজ অনেক পরিশ্রম করেছেন। আমি সদর দরজার ঘন্টা খুলে তারপর শুতে যাব আগেই বলে রাখছি।"

"সদর দরজার ঘন্টা খুলে রাখবে?" জেকবের কথা শুনে অবাক হলেন ফাদার গ্রেগরি, "কেন হে? ঘন্টা কি দোষ করল?"

"চারদিকে যা মড়ক লেগেছে তাতে আজ রাতে আরও দু'পাঁচজন যে কনফেসানের পাদ্রির জন্য খোঁজে আপনার কাছে আসবে না তা কে বলতে পারে? আপনার যা দয়ার শরীর, শুনলেই বাইবেল হাতে দৌড়োবেন তাদের উদ্ধার করে স্বর্গের পথ দেখাতে। ঘন্টা খুলে নিলে ওরা কেউ আর আপনাকে ডাকতে পারবেনা।"

"ছিঃ, জেকব!" মৃদু শাসনের গলায় বললেন ফাদার গ্রেগরি, "ভুলে যেয়োনা পাদ্রি না হলেও এই রেক্টরির দোখাশোনার দায়িত্ব তোমার ওপর তা ভুলে যেয়ো না। একজন বিপন্ন খ্রীষ্টান মৃত্যুকালে কনফেসান করার জন্য বাড়ির লোককে দিয়ে আমায় খবর পাঠাবে আর তুমি আমার

সঙ্গে তার দেখা করার পথটাই বন্ধ করে দেবে। একি তোমার দিক থেকে উচিত কাজ হচ্ছে? আমার শরীরের জন্য ভেবো না, ছোটবেলা থেকে পরিশ্রম করা শরীর আমার এত সহজে আমি কাবু হই না। তাছাড়া প্রভুর সেবায় পরিশ্রম করতে গিয়ে যদি জীবন যায় ত এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি-ইবা হতে পারে? না বাপু, তুমি সদর দরজায় ঘন্টায় হাত দিতে যেয়ো না।"

"তাই হবে," জেকব বলল, "কথা দিলাম হাত দেব না। কিন্তু আপনি এবার শুয়ে পড়ুন।"

"যাচ্ছি," শোবার ঘরের দিকে এগোতে এগোতে ফাদার গ্রেগরি বললেন। "স্টাডিতে আমার টেবলে বাড়তি ক'টা মোমবাতি রেখো জেকব, ভোরবেলা বই পত্তর নিয়ে বসব। শোবার আগেই কাজটা মনে করে কোর।"

"করব, ফাদার," বলে জেকব তার নির্দিষ্ট ঘরের দিকে চলে গেল। শোবার ঘরে পৌঁছে বাইবেলের নির্দিষ্ট অংশ পাঠ করলেন ফাদার গ্রেগরি, তারপর ফায়ারপ্লেসের ওপরে ম্যান্টেল পিসে মোমবাতি রেখে মাথার ওপরের জানালা খুলে শুয়ে পড়লেন। ইউক্যালিপটাসের গন্ধে ঘরের ভেতরের বাতাস ভরে উঠেছে। বালিশে মাথা রেখে পরিশ্রান্ত দেহ টানটান হয়ে শোবার খানিক বাদেই ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলেন মনে নেই। আচমকা দরজায় মৃদু টোকার আওয়াজে তিনি জেগে উঠলেন। ম্যান্টেলপিসের ওপর মোমবাতিটা তখনও পড়ছে। শোবার আগে ওটা নেভানোর কথা তাঁর মাথায় আসে নি। বিছানায় উঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে দরজায় আবার টোকা পড়ল। কে এসময় বাইরে থেকে টোকা দিতে পারে। মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করলেন তিনি। জেকব অবশ্যই নয়। কারণ তার ধাতই আলাদা। দরজায় টোকা দেবার পরে সাড়া না পেলে অনেক আগেই সে তাঁর নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকত।

"কে জেকব?" বিছানায় বসেই গলা সামান্য চড়িয়ে বলে উঠলেন ফাদার গ্রেগরি। বাইরে থেকে জেকব বা আর কারও সাড়া মিলল না। টোকার আওয়াজও গেল থেমে। বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, তার ঝাপটা ঘরের ভেতর ঢুকে কাঁপিয়ে তুলছে মোমবাতির হলদ শিখাকে। শিয়রের জানালার কাঁচের শার্সি দুটো আঁটলেন ফাদার গ্রেগরি, টাকা দেবার ব্যাপার নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে শুয়ে পড়লেন বালিশে মাথা রেখে। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গেলেন গভীর ঘুমের অতলে। ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতে লাগলেন ফাদার গ্রেগরি, একজনকে অনুসরণ করে এসে হাজির হয়েছেন গ্রামের প্রায় শেষপ্রান্তে তেমাথার মোড়ে। সেই মোড়ের মাথায় উইলো গাছের লাগোয়া গলিতে ঢুকতেই সামনের লোকটি ইশারায় তাঁকে নামার নির্দেশ দিল। তারপর হাঁ-হাতে খানিক তফাতে একটা কাঠের বাড়ি দেখাল। সামনের লোকটি কে তা ফাদার গ্রেগরির জানা নেই এটা যেমন ঠিক তেমনই অনেকক্ষণ ধরে তিনি সে লোকের পেছন পেছন হাঁটছেন এটাও ঠিক। সামনের লোকটির মুখ এখনও পর্যন্ত তাঁর দেখা হয়নি।

দরজার বাইরে আবার টোকার আওয়াজ হতে তাঁর ঘুম আবারও গেল ভেঙ্গে। এবার বিরক্ত হলেন ফাদার গ্রেগরি। খাট থেকে নেমে ম্যান্টেলপিস থেকে জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে এগিয়ে এসে দরজা খুললেন।

বাইরে ধারে কাছে একটিও লোক নেই। রেগে দরজা বন্ধ করতে যাবেন এমন সময় লোকটা যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে দাঁড়াল তাঁর মুখোমুখি। চোয়ালভাঙ্গা লম্বাটে মুখে ঈগলের

ঠোঁটের মত খাড়া বাঁকানো নাক, মুখভর্তি কয়েক মাসের না কামানো দাড়িগোঁপ। সবচেয়ে অদ্ভুত লোকটির অন্তর্ভেদী চোখদুটি। তাঁর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে লোকটার। ফাদার গ্রেগরি অনুভব করলেন তার সে দৃষ্টি তাঁর চামড়া মাংস, হাড় ভেদ করে ক্রমেই আরও গভীরে গেঁথে যাচ্ছে ছুরির ধারালো ফলার মত। একদৃষ্টে তাকিয়েই আছে সে মুখে একটিও কথা নেই। মিনিট পাঁচেক আবিষ্টের মত ঐভাবে অচেনা লোকটির চোখের দিকে তাকিয়ে থাকার পরে আচমকা ফাদারের চমক ভাঙ্গল, আর তখনই তাঁর নজরে পড়ল লোকটির গায়ে ডোরাকাটা ফুল হাতা সার্ট, পরনে তেমনই ডোরাকাটা পা-জামা, এমনই পোষাক যে জেলখানার কয়েদি আর হাসপাতালের রোগিরা পরে তা তিনি জানেন।

সামনে দাঁড়ানো রহস্যময় লোকটি এবার আঙ্গুল বেঁকিয়ে তাঁকে ডাকল তারপর চোখ নামিয়ে পেছন পানে কয়েক পা হাঁটল। মন্ত্রমুগ্ধের মত পা বাড়িয়ে শোবার ঘরের বাইরে যেতেই আবার থেমে গেল সেই মূর্তি। গলার কাছে ডানহাতের তর্জনি এনে ক্রস চিহ্ন আঁকল সে, তারপর দু'হাতের পাতার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন সে কিছু পড়ছে। অর্থটা নিমেষে বিদ্যুতের গতিতে তাঁর মাথার এল। লোকটা তাঁকে বাইবেল সঙ্গে নিতে বলছে। পেছন ফিরে ঘরে ঢুকলেন ফাদার গ্রেগরি, খাটের ওপর রাখা বাইবেলখানা বাঁ-হাতে শক্ত করে চেপে ধরে বেরিয়ে এলেন বাইরে। ফাদার গ্রেগরির হাতে বাইবেল দেখে লোকটা আঙ্গুল বেঁকিয়ে তাঁকে সঙ্গে আসার ঈশারা করে মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে লাগল সিঁড়ির দিকে। ফাদার গ্রেগরি এতটাই মোহাবিষ্টের মত হয়ে পড়লেন যে বেরোবার আগে শোবারঘরের দরজার পাল্লা বন্ধ করার কথাও তাঁর মনে এল না। অজানা সেই রহস্য-ময় আগন্তুক বড় বড় পা ফেলে সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে নামছে, আর দশ পনেরো হাত তফাতে তিনি সমান তালে পা ফেলে তার পেছন পেছন চলেছেন। একতলায় নেমে বিশাল চাতাল পেরোলেন দু'জনে, সেখানে কারও চোখে পড়লেন না তাঁরা। রেক্টরির সদর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ হল, কাছাকাছি আসতেই যেন জাদুমন্ত্রবলে হাট হয়ে খুলে গেল বন্ধ দরজার পাল্লা, রহস্যময় অচেনা পথ প্রদর্শক খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল রেক্টরির বাইরে খোলা আকাশের নিচে, তার পেছন পেছন বাইবেল হাতে ফাদার গ্রেগরিও ; আগের মতই বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে হেঁটে চললেন দু'জনে।

নিস্তব্ধ রাত, পথে লোকজন দূরে থাকা একটা কুকুর বেড়াল পর্যন্ত চোখে পড়ে না। দূরে লোকালয়ের একেকটা বাড়ি থেকে মাঝেমাঝে ভেসে আসছে বুকফাটা কান্নার আওয়াজ— পরিবারের সদস্যদের কারও জীবনদীপ নিভে গেল চিরদিনের জন্য। কিন্তু সে বুকফাটা কান্নার আওয়াজ ফাদার গ্রেগরিকে বিচলিত করতে পারছে না, হাঁটার ধরণ দেখে মনে হয় কান্নার আওয়াজ আদৌ তাঁর কানেই পৌঁছোয়নি, নিশি পাওয়া মানুষের মত একমনে হেঁটে চলেছেন তিনি।

হাঁটতে হাঁটতে গ্রামের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছেলেন ফাদার গ্রেগরি তাঁর পথ প্রদর্শকের সঙ্গে। সামনে তেমাথার মোড়, সেই মোড়ের মাথায় উইলো গাছের লাগোয়া গলিতে ঢোকার পরে পথ প্রদর্শক হাত তুলে তাঁকে নামার নির্দেশ দিল। তারপর বাঁ-হাত তুলে খানিক তফাতে একটা বাড়ি ইশারায় দেখিয়েই যেমন আচমকা এসেছিল তেমনই আচমকা উধাও হল, ফাদার গ্রেগরির মনে হল লোকটি যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল। আর সেই মুহূর্তে ঘুমের রেশ কেটে

গিয়ে জেগে উঠলেন তিনি। ফাদার গ্রেগরি দেখলেন রেক্টরির শোবার ঘরের খাটে নয়, গ্রামের শেষপ্রান্তে একটা গলিতে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। খানিক আগে দেখা স্বপ্নের কথা তাঁর মনে পড়ে গেল, স্বপ্নে ঠিক এই জায়গাটিই দেখেছিলেন তিনি। ঠিক তখনই বাঁদিকে ছোট একতলা কাঠের বাড়ি থেকে কাতরানির আওয়াজ ভেসে এল তাঁর কানে, কে যেন গুঙ্গিয়ে উঠল, 'জল, একটু জল', বলে।

দ্বিধা বিসর্জন দিয়ে ফাদার গ্রেগরি সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়লেন সেই বাড়ির ভেতরে। সামনের ঘরে খাটের ওপর শুয়ে একটি লোক ছটফট করছে যন্ত্রনায়, তাঁকে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে কৌতূহলী চোখে তাকাল সে। ঘরের এককোণে রাখা জলের কুঁজো ঈশারায় দেখাল লোকটি, ফাদার গ্রেগরি এগিয়ে এসে দেখেন কুঁজোর মুখ গেলাস দিয়ে ঢাকা। গেলাসে জল ঢেলে লোকটিকে দিতে অনেকখানি জল ঢকঢক করে খেল সে। তারপর তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "বলুন ফাদার, এই হতভাগ্য অসুস্থ লোকটি কি করতে পারে আপনার জন্য?"

ফাদার গ্রেগরি লোকটির শিয়রে বসে খানিক আগে যা ঘটেছে সব বললেন। যে অচেনা পথ প্রদর্শক তাঁকে এখানে নিয়ে এসেছে তার চেহারা আর পোষাকের বর্ণনা শুনে লোকটি মাথা নেড়ে বলল, "বুঝেছি, ফাদার, ও হল আর্ট, আর্থার রবিনসন। মারা যাবার আগে যে প্রতিশ্রুতি আর্ট আমায় দিয়েছিল ততদিনে তার বিদেহী আত্মা তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করল।

"তোমার কথা ত আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।" ফাদার গ্রেগরি অবাক হয়ে বললেন, "দয়া করে সব খুলে বলে।"

"ফাদার বেশ বুঝতে পারছি আমার মৃত্যুর খুব বেশি দেরি নেই তাই আজ আর কোন কথা লুকোব না, লুকোনোর মানে হয় না। ফাদার, আমি একজন জেলপালানো কয়েদী আমার নাম পিটার ডাফনি। কম বয়সে ভাগ্যের সন্ধানে গিয়েছিলাম দক্ষিণ আমেরিকায়, সেখানে এক ব্যাংকে ক্যাশিয়ারের চাকরি করতাম। ব্যাংকের টাকা ভাঙ্গার অপরাধে আমার লম্বা মেয়াদের জেল হয়। জেলে মেয়াদ খাটার সময় আলাপ হয় আর্থার রবিনসনের সঙ্গে, ডাকাতির মামলায় তারও সাজা হয়েছিল। আর্ট বলেছিল মিসিসিপির কাছে পাহাড় ঘেরা এক জঙ্গলে ও ডাকাতির ধন সম্পদ একটা বড় গাছের নিচে পুঁতে রেখেছে, একজন সাহসী লোক পেলে তাকে সঙ্গে নিয়ে জেল ভেঙ্গে ও ফিরে যাবে সেখানে, সেই ধনসম্পদ মাটি খুঁড়ে তুলে তাই পুঁজি করে কারবারে নামবে। সঙ্গিকে অংশীদার করবে বলে কথাও দিল আর্ট তার কথা শুনে নতুন ভাবে বাঁচার প্রেরণা পেলাম। একদিন আধবুড়ো ওয়ার্ডারকে খুন করে তারই পিস্তল আর গুলিবারুদ হাতিয়ে নিয়ে দু'জনে জেল ভেঙ্গে পালালাম। মিসিসিপিতে পৌঁছে আর্ট পাহাড়ঘেরা জঙ্গলে আমায় নিয়ে গেল, নির্দিষ্ট গাছের নিচের মাটি খোঁড়ার পরে লুকিয়ে রাখা কাঁড়ি কাঁড়ি সোনা আর নগদ টাকাও পেলাম দু'জনে। সেই টাকায় তেলের খনি কিনলাম দু'জনে। আর্ট তার কথা রাখল, আমার কারবারের অংশীদার করে নিল সে। দু'জনে শুরু করলাম নতুন জীবন।

কিন্তু আর্ট বেশিদিন বাঁচল না। খনির কাছে যেখানে আমাদের ডেরা ছিল সেখানকার নদীর জল গেল বিষিয়ে। সেই জল খেয়ে অসুখে পড়ল আর্ট। তাকে শহরের বড় হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইলাম কিন্তু আর্ট কিছুতেই রাজি হল না। তার ভয় হাসপাতালে গেলেই তাকে ধরে আগে জেলে পুরবে, তারপর জেলের ওয়ার্ডারকে খুন করার অপরাধে ফাঁসিতে ঝোলাবে।

কাছেই ছিল রেড ইণ্ডিয়ানদের গ্রাম। সেখানকার হাতুড়ে বদ্যির দেয়া জড়িবুটি খেয়ে বেঁচে রইল আধমারা হয়ে। আবার খনিতে যাওয়া আসা শুরু করল আর্ট। কিন্তু ক'দিন বাদে মৃত্যু আবার এসে দেখা দিল তাকে। আমি গিয়েছিলাম শহরে কেনাকাটা করতে। তারই ফাঁকে আর্ট জিপে চড়ে গিয়েছিল খনিতে, ফেরার মুখে জঙ্গলের ভেতর পড়ল বুনো ভালুকের সামনে। জিপে স্টার্ট দিয়ে পালাবার আগেই ভালুকের থাবা এসে পড়ল তার ঘাড়ে আর পিঠে। রক্তমাখা দেহে জিপ চালিয়ে কোন মতে ডেরায় ফিরে এল আর্ট। আমি তার খানিক আগেই ফিরেছি। প্রচুর রক্ত বেরোচ্ছিল আর্টের শরীর থেকে, তার কথামত মাটিতে বিছানা পেতে তাকে শুইয়ে দিলাম। আর্টের গলা তখন প্রায় বুঁজে এসেছে। কোনমতে বলল, "পিটার, আমার বাঁচানোর চেষ্টা করে লাভ হবে না, তার চেয়ে বব্ দ্যাখো একজন পাদ্রি ধারে কাছে পাও কিনা। চোখ বোজার আগে কিছু ধর্মকথা শুনে যাই।"

রেড ইণ্ডিয়ানদের গ্রামের কাছেই ছিল গির্জা সেখান থেকে একজন পাদ্রি নিয়ে যখন এলাম তখন আর্টের হেঁচকি উঠেছে। সেই অবস্থায় সে সেই পাদ্রির কাছে কনফেশন করল। জীবনের সব কুকর্মের কথা স্বীকার করল। যাবার আগে আমায় বলল, পিটার, মৃত্যুর সময় পাদ্রি এনে যে উপকাব তুমি আজ করলে তার প্রতিদান আমি দেব। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকো জীবনের শেষ মুহূর্তে আমিও তোমার কাছে একজন পাদ্রি নিয়ে আসব। আমার যে সম্পদ রেখে গেলাম সে সব তোমার। বলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল আর্ট, জেল পালানো খুনে ডাকাত আর্থার রবিনসন। ফাদার, আপনার কথা শুনে বুঝতে পারিছ আর্ট আপনাকে ডেকে এনে তার প্রতিশ্রুতি পালন করে। এর মানে একটাই, আমারও মৃত্যুর আর দেরি নেই। যে কুঁজোর জল আপনি আমার খাওয়ালেন তার নিচে মেঝে খুঁড়লে আমার উপার্জিত ধন সম্পদ লুকোনো আছে। সে সব আমি আপনাকে দান করলাম। এই হল আমার কনফেসন বা স্বীকারোক্তি। এবার আপনি আমায় বাইবেল পড়ে শোনান।"

ফাদার গ্রেগরি বাইবেল থেকে কিছু অংশ পড়ে শোনানোর পরে ভোরবেলা পিটার ডাফনি মারা গেল। গির্জা থেকে লোক ডাকিয়ে এন ফাদার গ্রেগরি তার মৃতদেহের সৎকার করালেন। পিটার তার ঘরের যে জায়গার কথা বলেছিল সেখানকার মাটি খুঁড়ে সত্যিই প্রচুর টাকা পেয়েছিলেন। ফাদার গ্রেগরি তিনি সেই টাকাকড়ি গির্জায় দান করলেন।

লিফটে ভূতের আবির্ভাব

রাত তখন ক'টা হবে কে জানে। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছিলেন স্যার ফ্রান্সিস, আচমকা চোখের পর্দায় ভেসে উঠল একটা কঙ্কালের বীভৎস মুখ। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম গেল ভেঙ্গে। চোখ মেলতে স্যার ফ্রান্সিস দেখলেন বাইরের আকাশে কালো পিচঢালা গাঢ় আঁধার। রাত শেষ হতে এখনও ঢের দেরি, চাঁদের আলো জানালা দিয়ে পড়ে ভেসে যাচ্ছে বিছানার ধপধপে সাদা চাদরের ওপর। সারাদিন সরকারি কাজে মাথা খাটানোর ফলে প্রচুর চাপা উত্তেজনা জমে স্নায়ুর ভেতরে। একেক সময় তার চাপে ঘাড়ে আর মাথার শিরাগুলো ছিঁড়ে পড়তে চায়। ধূমপান মদ বা অন্য কোনও কড়া মাদক, উত্তেজনা কমাতে এসবের কোনটিরই বশীভূত হননি তিনি, রাতের

ঘুমটুকুই তাঁর মৃতসঞ্জীবনীর কাজ করে কিন্তু খানিক আগে স্বপ্নের ঘোরে দেখা ঐ কঙ্কালের দাঁত বের করা মুখ দেখে সেই যে তিনি জেগে উঠেছেন তারপর অনেক চেষ্টা করেও সেই ভাঙ্গা ঘুম আর জোড়া লাগাতে পারছেন না। আজ বাকি রাতটুকু জেগে কাটানো ছাড়া উপায় নেই জেনে একসময় বিরক্ত হয়ে উঠে বসলেন স্যার ফ্রান্সিস, টয়লেটে গিয়ে চোখেমুখে জল দিয়ে এসে দাঁড়ালেন খোলা জানালায়, আকাশের কোথাও একছিটে মেঘ নেই। পরিষ্কার জ্যোৎস্নায় নিচের বাগানের সৌখিন গাছ এমনকি সদ্য ছাঁটা ঘাসগুলো দোতলার এই জানালায় দাঁড়িয়ে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন তিনি। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থাকার পরে আচমকা স্যার ফ্রান্সিসের চোখে পড়ল দূর থেকে কে যেন এদিকে এগিয়ে আসছে পায়ে পায়ে, পিঠে তার বড় একখানা বাক্স, বাক্সের ভারে নুয়ে পড়েছে সে।

কে লোকটা? মনে মনে ভাবলেন স্যার ফ্রান্সিস, এত রাতে বাগানে ঢুকল কি করে? বাগানে ঢোকার একমাত্র পথ সদর ফটক, সেই ফটক বন্ধ করে দারোয়ান হেনরি চাবি তুলে দিয়েছে তাঁর হাতে ডিনারের পরে। চোর ছ্যাঁচোর হওয়া বিচিত্র নয়। দূর থেকে লোকটার দিকে চোখ পড়তে আপন মনেই বলে উঠলেন স্যার ফ্রান্সিস। ফটক বন্ধ করলেও হয়ত পাঁচিল টপকে ঢুকে পড়েছে সে, তার আগে বাক্সটা ছুঁড়ে দিয়েছে পাঁচিলের এপাশে।

কিন্তু চোর ছ্যাঁচোর হলে তাকে ত এভাবে হাতের মুঠোয় পেয়ে পালাতে দেয়া যায় না। লোকটাকে ধরার এক অদ্ভুত জেদ চাপল স্যার ফ্রান্সিসের মাথায়।

স্লিপিং স্যুটের ওপর ড্রেসিংগাউন চাপালেন তিনি। টেবলের ওপর রাখা মোটা রুলটা অস্ত্র হিসেবে হাতের মুঠোয় নিয়ে আবার এসে দাঁড়ালেন জানালায়। লোকটা এতক্ষণে আরও কাছে এসে পড়েছে, এখুনি নিচে গিয়ে তাকে ধরতে না পারলে বাগানের পাঁচিল টপকে হাতের বাইরে চলে যেতে পারে।

নিচে একতলার চাতালে নেমে ইচ্ছে করেই দারোয়ানের নাম ধরে হাঁকডাক করলেন না স্যার ফ্রান্সিস পাছে তাঁর গলা শুনে লোকটা পালিয়ে যায় এই ভেবে। একপাশে বাগানের গেট, রুলটা ডানহাতে বাগিয়ে খিল তুলে বাগানের লনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। ঐ ত লোকটা, পিঠের ভারি বাক্সের ভারে নুয়ে পড়েছে, হাঁটতে হাঁটতে এদিকেই আসছে ব্যাটা।

"অ্যাই, কে!" হাত পাঁচেকের মধ্যে লোকটা এসে পড়তে হেঁকে উঠলেন স্যার ফ্রান্সিস। তাঁর নির্দেশ লোকটার কানে গেল বলে মনে হল না। কারণ না নেমে আগের মতই হাঁটতে লাগল সে, তাঁর সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"কে তুই?" হাতের রুল উঁচিয়ে ধমকে উঠলেন স্যার ফ্রান্সিস। "মুখ তোল।"

পিঠের বোঝা না নামিয়ে নুয়ে পড়া মুখ তুলল লোকটা। সে মুখ দেখে আঁতকে উঠলেন স্যার ফ্রান্সিস—জীবিত মানুষের মুখ এত ভয়ানক আর বীভৎস হয় নিজে চোখে না দেখলে তার বিশ্বাস হত না। মুখের কোথাও একছিটে মাংস নেই, যেন একখানা কঙ্কালের মুখ পাতলা একফালি চামড়ায় ঢাকা। কঙ্কালের মুখের মতই এ লোকটার মুখেও চোখ আর নাকের জায়গায় গভীর গর্ত ছাড়া কিছু নেই, মাড়ির নিচে উধাও হয়েছে ঠোঁট, সেখানে উঁকি মারছে দু'পাটি সাদা ধপধপে দাঁত।

"পিঠে কি বয়ে এনেছিস নামিয়ে রাখ্ এখানে! "ভেতরে অস্বস্তি হলেও তা চেপে রাখতে আবার ধমতে উঠলেন স্যার ফ্রান্সিস।

"এত আপনারই জিনিস কত্তা," বলতে বলতে পিঠ থেকে যে বড়সড় ভারি বস্তুটা লোকটা সামনে নামিয়ে রাখল তার দিকে তাকিয়ে স্যার ফ্রান্সিস শুধু চমকেই গেলেন তা নয়। এক হিমশীতল অজানা আতঙ্ক দানা বাঁধল তাঁর বুকের ভেতর। আলমারি নয়, বাক্স নয়, একটা বড় কাঠের কফিন। লোকটা নিশুতি রাতে এই কফিন খানা এতদূর বয়ে এনেছে? কেন?

"এর ডালা তোল" ধমকে উঠতে গিয়ে গলা যে অল্প কেঁপে গেল তা তাঁর নিজের কানেই ধরা পড়ল, "ভেতরে কি আছে আমি দেখতে চাই।"

"আপনাকে দেখাব বলেই ত এটা এতদূর বয়ে এনেছি, কত্তা।"

কেমন যেন ব্যাঙের মত শোনাল লোকটার গলা, "নিজেই দেখুন তাহলে!" বলে কফিনের ডালা দু'হাতে তুলে ধরল সে। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে উঁকি দিলেন স্যার ফ্রান্সিস, আর খানিক আগে কফিন দেখে চমকে উঠেছিলেন তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি চমকের ধাক্কায় তাঁর মাথা ঘুরে উঠল। স্যার ফ্রান্সিস চাঁদের আলোর স্পষ্ট দেখলেন কফিনের ভেতরে একটা মৃতদেহ শোয়ানো। আর সে মৃত দেহটা তাঁর নিজের। শরীরের সব রক্ত বরফ গলা জলের মত ঠাণ্ডা হয়ে শিরদাঁড়া বেয়ে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে, জ্ঞান হারাবার আগে এই অনুভূতি তাঁর স্পষ্ট হয়েছিল।

জ্ঞান ফিরে এলে স্যার ফ্রান্সিস দেখলেন তিনি শুয়ে আছেন দোতলার শোবার ঘরে খাটে, ডাক্তার ঝুঁকে পড়ে তাকিয়ে আছেন তাঁর মুখের দিকে। পায়ের কাছে দারোয়ান হেনরিকেও দেখতে পেলেন তিনি।

"লোকটা গেল কোন দিকে?" দারোয়ানের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন স্যার ফ্রান্সিস। "রাতভর থাকো কোন চুলোয়? বাইরের চোর ছ্যাঁচোর কফিন কাঁধে নিয়ে বাগানে হেঁটে বেড়ায় তা তোমার চোখে পড়ে না? কি করছিলে কাল রাতে, নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিলে?"

"না স্যার," দাবোয়না মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "কাল রাতে আমি ত রোজের মতই খেয়েদেয়ে বাগান আর বাড়ির চারপাশে টহল দিয়েছি, কাউকে ভেতরে ত ঢুকতে দেখিনি, হুজুর!"

"টহল দিয়েছো না ছাই করেছো?" বলে মাথা তুলতে যাচ্ছিলেন স্যার ফ্রান্সিস তার আগেই ডাক্তার ইশারায় তাঁকে বালিশে মাথা রেখে শান্তভাবে শুয়ে থাকার নির্দেশ দিলেন। তারপর একটা ইঞ্জেকশন দিলেন তাঁর ডান হাতে।

"আমি চলে যাবার পরে এককাপ গরম দুধে তিন চার চামচ ব্র্যাণ্ডি মিশিয়ে ওঁকে খাইয়ে দেবো," দারোয়ানকে পরিচর্যার নির্দেশ দিয়ে ডাক্তার তখনকার মত বিদায় নিলেন। ব্র্যাণ্ডি মেশানো দুধ খেয়ে অনেকটা সুস্থ বোধ করলেন স্যার ফ্রান্সিস, দারায়োনকে প্রশ্ন করে জানলেন টহল সেরে খুব ভোরবেলা ঘরে ফেরার মুখে সে তাঁকে বাগানের একধারে বেহুঁশ অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে চমকে উঠেছিল। স্যার ফ্রান্সিসের স্ত্রী নিঃসন্তান অবস্থায় বছর দশেক হল মারা গেছেন, তারপর আর বিয়ে করেন নি তিনি। দারোয়ান হেনরি ছাড়া তৃতীয় কোনও মানুষ বাড়িতে নেই। বাড়ি পাহাড়া দেবার পাশাপাশি মনিবের দু'বেলার রান্নাবান্না সে নিজেই করে। শক্ত সমর্থ হেনরি বেহুঁশ স্যার ফ্রান্সিসকে পাঁজাকোলা করে মাটি থেকে তুলে দোতলায় এনে শুইয়ে দিয়েছে, টেলিফোন করে ডাকিয়ে এনেছে ডাক্তারকে। না, স্যার

ফ্রান্সিসের প্রশ্নের জবাবে সে জানাল, তিনি বেহুঁশ অবস্থায় যেখানে পড়েছিলেন সেখানে তার আশেপাশে কারও পায়ের ছাপ তার চোখে পড়েনি। যে ঘটনা তিনি শোনালেন তা হেনরির বিশ্বাস হল না। সে ধরেই নিল স্বপ্নের ঘোরে তার মনিব রাতের বেলা নিচে নেমে এসে ঢুকেছিলেন বাগানে ঘুমের ঘোর কাটার আগেই তিনি পড়ে যান সেখানে বেহুঁশ হয়ে। হেনরির দোষ নেই। ঘটনার এছাড়া অন্য কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা কোনমতেই হওয়া সম্ভব নয়।

সুস্থ হয়ে ওঠার পরে স্যার ফ্রান্সিস এই ঘটনা তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের অনেককে শোনালেন সব শুনে তাঁরা স্তব্ধ হয়ে গেলেন, এ সম্পর্কে কেউ কোনও মন্তব্য করতে পারলেন না।

পাঁচবছর স্বাভাবিক ভাবে সুস্থ জীবন কাটালেন স্যার ফ্রান্সিস, এরই মধ্যে কূটনৈতিক দপ্তরের চাকরিতে তাঁর উন্নতি হল, ব্রিটিশ সম্রাটের উপদেষ্টা বিভাগের সুপারিশে ইওরোপে ব্রিটিশ কূটনৈতিক দপ্তরের বিশেষ প্রতিনিধি পদ অর্জন করলেন তিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার কিছু আগে লণ্ডন থেকে প্যারিসে এলেন তিনি। পশ্চিমের একাধিক দেশের এক কূটনৈতিক সম্মেলনে ব্রিটিশ প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিতে। মার্সেইয়ের এক পাঁচতারা হোটেলের আটতলার স্যুটে ফরাসি সরকার তাঁর থাকার ব্যবস্থা করেছে। হোটেলে পৌঁছে রিসেপশন থেকে স্যুটের চাবি নিলেন স্যার ফ্রান্সিস, ব্রিফকেস হাতে নিয়ে পায়ে পায়ে লিফটের দিকে এগিয়ে এলেন তিনি। লিফটার জন্য অনেকেই সারিবদ্ধ ভাবে দাড়িয়েছে। তিনি দাঁড়ালেন সবার শেষে। খানিকবাদে লিফট নেমে এল ওপর থেকে, দরজা খুলে লিফটম্যান একপাশে সরে দাঁড়াতে সারি দিয়ে দাঁড়ানো নারী পুরুষেরা এক এক করে ঢুকতে লাগলেন ভেতরে। আগের লোকটি ভেতরে ঢোকার পর তাঁর পালা। স্যার ফ্রান্সিস এগিয়ে গেলেন লিফটে ঢুকতে যাবেন এমনই সময় লিফটম্যান টুপিপরা মুখখানা তুলে তাকাল তাঁর দিকে। সে মুখের দিকে একবার তাকিয়েই থমকে গেলেন স্যর ফ্রান্সিস—ক'বছর আগে একরাতে বাগানে দেখা সেই ভয়ঙ্কর কঙ্কালের মুখ, হুবহু সেই লোক, সেদিনের মত আজও একইভাবে তাকিয়ে আছে তাঁর মুখের পানে।

সেই চোখের চাউনিতে এমন কিছু ছিল যা দেখার পরে আর লিফটে উঠতে পারলেন না স্যার ফ্রান্সিস। তাঁকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে পেছনের লোকটি তাঁকে একরকম ঠেলে পাশ কাটিয়ে উঠে পড়ল লিফটে। নির্দিষ্ট যাত্রি সংখ্যা পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে লিফটম্যান সুইচ টিপে দরজা বন্ধ করে দিল। স্যার ফ্রান্সিস ব্রিফকেস হাতে রিসেপশনের একটা সোফায় এসে বসে পড়লেন।

লিফটম্যানের মুখ দেখার সঙ্গে সঙ্গে দারুণ নার্ভাস হয়ে পড়েছেন তিনি। এবার কি করবেন তা এই মুহূর্তে ভেবে বের করতে পারছেন না। সামনে টেবলে রাখা একটা ম্যাগাজিন নিয়ে তার পাতা ওল্টাতে লাগলেন তিনি।

পাঁচ মিনিট কাটতে না কাটতেই ছাদফাটানো ভয়ানক আওয়াজে আশেপাশে যারা ছিল তাদের সঙ্গে চমকে উঠলেন স্যার ফ্রান্সিস। সঙ্গে সঙ্গে কানে এল, সবাই বলাবলি করছে আটতলায় পৌঁছোনোর আগেই তার ছিঁড়ে গিয়ে লিফটটা ওপব থেকে আছড়ে পড়েছে নিচে। আহত যাত্রিদের আর্তনাদে কানে তালা লাগার জোগাড়। স্যার ফ্রান্সিসের মাথার ভেতরটা ঘুরে

উঠল, ম্যাগাজিন রেখে দিয়ে তিনি সোফার পেছনে মাথা হেলিয়ে দিলেন, পকেট থেকে শিশি বের করে একটা বড়ি গিলে ফেললেন। ঐ লিফটে খানিক আগে ত তিনিও উঠতে যাচ্ছিলেন। লিফটম্যানের মুখ চোখে না পড়লে ততক্ষণে তাঁর কি অবস্থা হত তা ভেবে থেকে থেকে আঁতকে উঠতে লাগলেন তিনি।

পরদিন ফ্রান্সের সবক'টি খবরের কাগজে এই শোচনীয় দুর্ঘটনার খবর সবিস্তারে ছেপে বেরোল। একটি খবর সব কাগজেই উল্লেখ করা হল, তাহল আহত যাত্রিদের মধ্যে অনেক খুঁজে অ্যাম্বুলেন্স আর দমকলের উদ্ধার-কর্মীরা লিফটম্যানের হদিশ পায়নি। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন যাদুবলে উধাও হয়ে গিয়েছিল। এই খবরের নিচে আরও একটা খবর ছিল ; দুর্ঘটনাগ্রস্ত লিফটের চালক বা লিফটম্যান সেদিন ডিউটিতেই আসে নি। তাহলে? শেষের খবরটা পড়ে অবাক হলেন স্যার ফ্রান্সিস, নিজের মনে বলে উঠলেন লিফটম্যানের পোষাক পরে লিফটার দরজায় কাল যে দাঁড়িয়েছিল সে তাহলে কে, কি তার আসল পরিচয়? কালকের এই ভয়ানক দিনটির কথা মনে করিয়ে আগাম হুঁশিয়ারি দিতেই কি ক'বছর আগে সে আমায় দেখা দিয়েছিল? সে কি মৃত্যু স্বয়ং না আমার নিয়তি?"

ওকুরার প্রেতাত্মার প্রতিশোধ

১৪ শ শতাব্দীর জাপান। রাজধানী টোকিও থেকে অনেক দূরের এক গ্রাম আকামুরা। হোশিমা পরগণার শাসক শিদেই-এর শাসনে দিনরাত তটস্থ থাকে আকামুরা আর আশপাশের অন্যান্য গ্রামের মানুষেরা। মিকাডো বা সম্রাটের কাছে থেকে পাওয়া সনদের বলে শিদেই হোশিমা পরগণায় একচ্ছত্র শাসক। পরগণার অধীনে একশো পঁচিশটা গ্রাম আছে সেখানকার নারী পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ সবার ভাগ্যবিধাতা সে। প্রজা-শাসনের নামে শিদেই তার বংশবদ জমিদারকুল আর তাদের পোষা ঠ্যাঙ্গাড়েদের দিয়ে যা করে বেড়ায় তাকে প্রজাপীড়ন বললে বেশি বলা হবে না। মহামান্য সম্রাট যে পরিমাণ বেঁধে দিয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ খাজনা নিয়মিত পাঠিয়ে শিদেই তাঁর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে ; কিন্তু এই বাড়তি খাজনা জোগাড়ের আসল রহস্য যে প্রজাদের ওপর চাপ দিয়ে যখন তখন ইচ্ছে মতন অর্থ আদায় করা মহামান্য সম্রাটের তা জানা নেই।

গ্রীষ্মকাল। অসহ্য গরমে কি ঘরে কি বাইরে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কিন্তু আকাশে মেঘের দেখা নেই। এদিকে বৃষ্টি না হলে ধানের চারাগুলো শুকিয়ে জ্বলে যাবে। আকামুরা গ্রাম থেকে নদী অনেক দূরে। বৃষ্টির অভাব পূরণ করতে হলে সেই নদী থেকে খাল কাটতে হবে।. কিন্তু এ-কাজ কোনও কৃষকের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য দরকার লোকবল। আকামুরা গ্রামের কৃষক ওকুরার বয়স চব্বিশ পঁচিশ, আশপাশের গ্রামের কৃষকেরা স্বভাব আর বুদ্ধির জন্য তাকে বড্ড ভালবাসে। কিছুদিন আগে ওকুরা কয়েকজন কৃষককে নিয়ে গিয়েছিল পরগণার শাসক শিদেই-এর কাছে আর্জি নিয়ে। আর্জি একটাই, বর্ষা কবে আসবে ঠিক নেই তাই আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে না থেকে আকামুরা সমেত আশপাশের গাঁয়ের জোয়ান কৃষকেরা নিজেরাই খাল কেটে নদীর জল নিয়ে আসবে ক্ষেতে। এ কাজে মাননীয় শিদেই মশাই তাঁর

পাইক বরকন্দাজদের লাগালে তাদের উপকার হবে। তাছাড়া ফসল কবে ফলবে তার ঠিক নেই। তাই মাননীয় শিদেই যদি তাদের এ-বছরের খাজনার কিছুটা মুকুব করে দেন......।

খাজনা মকুবের আর্জি শুনে শিদেই-এর মেজাজ গেল বিগড়ে, ওকুরা আর তার সঙ্গিদের চাবুকপেটা করে প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দিল সে। আকামুরা গ্রামের জমিদার নোগুচি নিজের মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে নেমন্তন্ন করতে গিয়েছিল পরগণাদার শিদেইকে, শিদেই ইচ্ছে করেই তারে সামনে এসব ঘটাল। অসহায় চাষাভুষোগুলোকে মেরে খেদিয়ে দেবার পরে শিদেই আড়চোখে তাকাল নোগুচির দিকে, মুচকি হেসে বলল, "এই ওকুরা ছোঁড়া বুঝি তোমার গাঁয়ের কিষাণদের মোড়ল হয়ে উঠেছে?"

"একালের চ্যাংড়া ছোঁড়া সব, হুজুর, " দু'হাত কিমোনোর আস্তিনে ঢুকিয়ে ঘাড় হেঁট করে কুর্ণিশ করতে করতে নোগুচি বলল, "আপনি যে মহামান্য সম্রাটের প্রতিনিধি, সে বোধই ওদের হয় নি। হবে কি করে। ওদের বাপ ঠাকুর্দাও ত জানোয়ার বই কিছু নয়। ভদ্রতা, সভ্যতা এসব শিখবে কাদের দেখে?'

"আমি ওসব বুঝিনা, বুঝতে চাইও না!" খেঁকিয়ে উঠল পরগণাদার শিদেই, ও ছোঁড়া তোমার প্রজা, ওকে টিট করার দায়িত্ব তোমার, এই আমি সাফ বলে দিচ্ছি!"

"তাই হবে হুজুর," বলে কুর্ণিশ করতে করতে মান বাঁচিয়ে নোগুচি পরগণাদারের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে নিজের পালকিতে চাপল।

পরদিন সকালবেলা। আগের দিন শিদেই-এর পাইকদের চাবুক খেয়ে দারুণ ব্যাথা হয়েছে ওকুরার শরীরে, তাই সকালে বিছানা থেকে গা তুলতে পারছে না সে। তার বৌ মিচিকোর শরীরও ভাল নয়। তার ওপর এই গরমে আধকপালে মাথাব্যথায় ভুগছে সে। গাঁয়ের হাতুড়ে বদ্যির কাছে গা আর মাথা ব্যাথার সবরকম মালিশ আছে কিন্তু তার কাছে যেতে ওকুরার শরীর চাইছে না। চুপচাপ খাটিয়ায় পড়েছিল সে, এমন সময় বাইরে দরজার গায়ে টোকা পড়ল, সেই সঙ্গে শোনা গেল গলা "ওকুরা ঘরে আছিস? দোর খোল!"

"কে ডাকছ?" বিছানায় শুয়েই জানতে চাইল ওকুরা। "আমরা জমিদারের লোক," বাইরে থেকে গলা ভেসে এল, "দোর খোল, কথা আছে!"

আড়চোখে বৌ-এর দিকে একবার তাকাল ওকুরা, দেখল মিচিকো চোখ বুঁজে তার খাটিয়ায় পড়ে। মিচিকো যে জেগে আছে, ইচ্ছে করলেই উঠে গিয়ে সে দোর খুলে দিতে পারে তাতে ওকুরার কোনও সন্দেহ নেই। তবু বৌকে ইচ্ছে করেই ঘাঁটালনা ওকুরা, কোনমতে খাটিয়া থেকে নেমে ঘর থেকে বেরিয়ে দোর খুলে দিল। দেখল গাঁয়ের জমিদার নোগুচির নায়েব নাকামুরা দাঁড়িয়েছিল দু'জন পাইককে নিয়ে। তাদের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে ওকুরা বলল, "এই যে নাতজামাইয়েরা। সাতসকালে কি মনে করে? গরীবের পেটে অনেকদিন লাথি মারা হয় নি। আজই মনে পড়ে গেল বুঝি? তা বাইরে দাঁড়িয়ে কেন। ভেতরে আসতে আজ্ঞা হোক," বলে নায়েবকে দায়সার একটা কুর্ণিশ করে একপাশে সরে দাঁড়াল সে। "পরগণাদারের চাবুক খেয়েও যেমন অসভ্য বাঁদর ছিলি তেমনই রয়ে গেছিস দেখছি," নায়েব মুচকি হাসল, "দিনকাল ভাল নয় রে ওকুরা," আমরা যারা তোদের মাথার ওপর বসে ছড়ি ঘোরাচ্ছি তাদের সঙ্গে একটু সমঝে কথা বলতে শেখ। নয়ত আখেরে ভুগতে হবে তোকেই তা আগে থেকেই বলে রাখছি।

"উপদেশ দেবার জন্য মঠের সাধু সন্ন্যাসীরা আছে," ওকুরা হাসল। "উপদেশ দিতে হলে ওঁরা দেবেন। আপনি কেন এসেছেন সেটা বলে মানে মানে বিদেয় হন।"

"তাহলে এবার কাজের কথায় আসি", নায়েব হাসল, "তুই জানিস জমিদারের হুকুমে তোর মত যত শক্তসমর্থ মরদ চাষা গাঁয়ে আছে তাদের কাউকে দিনের বেলা ঘরে বসে থাকা চলবে না। সূয্যিমামা ও আঁধার ফুঁড়ে বেরোনো মাত্তর তোরা ক্ষেতে গিয়ে চাষের কাজ শুরু করবি, আবার দিনের শেষে সূয্যিমামা ডুবলে তখন ঘরে ফিরে চান খাওয়া করবি। জেনেশুনে তুই জমিদারের হুকুম অমান্য করেছিস। ক্ষেতে না গিয়ে বসে আছিস বাড়িতে। দে, এবার গুণাগার দে, হুজুরের হুকুম না মানার দায়ে আমি তোকে পঁচিশ ইয়েন জরিমানা করলুম। জরিমানার টাকা সাতদিনের মধ্যে কাছারিতে হুজুরের পায়ে দিয়ে যাবি, নয়ত আমি তোকে খেয়েই ফেলব বলে দিচ্ছি।"

"জরিমানা করবেন!" মুখ বেঁকিয়ে হাসল ওকুরা, "হুজুরের চেয়ে দেখছি তাঁর পেয়াদার দাপট বেশি। তা হ্যাঁ, আমার নাতজামাই, জরিমানা না দিলে আপনি আমায় কি করবেন সেটাও শুনিয়ে দিয়ে যান!"

"টাকা দিবি নে?" পাইকদের সামনে ওকুরা তাকে পেয়াদা বলায় নায়েব এমনিতে চটে গেছে, এবার জরিমানা দেবে না শুনে সে ভীষণ দমে গেল। ঢোঁক গিলে বলল, "কি করব জানতে চাস? শুধু এই গাঁয়ে কেন, গোটা পরগণায় কোথাও যাতে তুই থাকতে না পারিস সেই ব্যবস্থা করে তবে ছাড়ব। আমি হলুম গে নোগুচি জমিদারের নায়েব নাকামুরা, আমার কথা আর কাজে কোনও ফারাক নেই। আজ তাহলে চললুম। ভাল চাস ত জরিমানার টাকাটা মনে করে সাতদিনের মধ্যে কাছারিতে গিয়ে দিয়ে আসিস।"

"তা যান," ওকুরা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল, "বৌটার শরীর ভাল নয়। তাই হুজুরকে শুধু মুখেই যেতে হচ্ছে, নেড়ি কুকুরের থালায় কিছু বাসি ভাত ছিল, সেইটে নয় ধরে দিত—"

শুনে নায়েব রাগে প্রায় ফেটে পড়ে আর কি। "দেখে নেব!" বলতে বলতে পাইকদের সঙ্গে নিয়ে সে ছিটকে বেরিয়ে এল ওকুরার বাড়ি থেকে।

প্রজাদের ওপর জমিদার আর পরগণাদারের অত্যাচার দিনের পর দিন বেড়েই চলল. একশো পঁচিশটা গ্রামের প্রজা শেষকালে একজোট হয়ে ঠিক করল এইসব অত্যাচারের বিবরণ তারা জানাবে। সাহসের জন্য ওকুরাকে মানত সবাই, তাকে সামনে রেখে দলবেঁধে প্রজারা গিয়ে হাজির হল রাজধানীতে, সম্রাটের সঙ্গে দেখা করে লিখিত অভিযোগ তারা তাঁর হাতে দিয়ে যে যার গ্রামে ফিরে এল। প্রজাদের অভিযোগ পড়ে সম্রাট চমকে গেলেন। পরগণাদার শিদেইকে ডাকিয়ে এন তাকে সে চিঠি দেখালেন। তারপর আচ্ছা করে ধমকে বিদায় দিলেন। ওকুরার দৌড় দেখে পরগণাদার শিদেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। গ্রামে পাইক পাঠিয়ে সপরিবারে ওকুরাকে ধরে আনল সে, তারপর সবার সামনে তাদের মাথা কেটে ফেলার হুকুম দিল। পরগণাদার হুকুম দেবার সঙ্গে সঙ্গে জল্লাদ এসে ধারালো কুড়ুলের দুই কোপে ওকুরা আর তার বৌয়ের ধড় থেকে মাথা দুটো কেটে ফেলল।

ব্যাপার কিন্তু এখানেই শেষ হল না। গর্দান নেবার ঠিক পনেরো দিনের মাথায় পরগণাদার শিদেই আর জমিদার নোগুচির কপাল একসঙ্গে পুড়ল। দু'জনের বাড়িতে আগুন লাগল একই

দিনে, সেই আগুনে তাদের জমানো টাকাকড়ি, সোনাদানা হীরেজহরত সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আগুনের কোপ থেকে শিদেই আর নোগুচির বৌ ছেলেমেয়েরাও বাঁচল না। সবার শেষে আগুনের শিখায় পুড়ে মরল শিদেই আর নোগুচি। পাইক বরকন্দাজেরা কেউ তাদের বাঁচাতে এগিয়ে এল না। দূরে দাঁড়িয়ে সবাই দেখল আগুনের শিখার ভেতর দাঁড়িয়ে ওকুরা আর তার বৌ, তাদের ইশারায় আগুন একে একে দুই শয়তানের সব স্থাবর সম্পত্তি পুড়িয়ে ছাই করে ফেলছে। দুটো পুকুর আর চারটে কুয়োর সব জল বালতিতে তুলে সারা রাত ধরেও শিদেই আর নোগুচির পাইকেরা আগুন নেভাতে পারল না।

তারপর? শয়তানরা পুড়ে ছাই হবার পরদিন ভোরবেলা থেকে বৃষ্টি নামল আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টির অভাবে যেসব চাষীর মন ভেঙ্গে গিয়েছিল তারা নতুন উদ্যম চাষের কাজে হাত লাগাল।

প্রজাদের মুখে ওকুরার প্রেতাত্মার নির্মম প্রতিশোধের কথা একসময় সম্রাট মিকাডোর কানেও এসে পৌঁছোল, তিনি তাঁর এক বিশ্বস্ত মন্ত্রিকে আকামুরার পরগণাদারের পদে বহাল করলেন।

(জাপানি উপকথা অবলম্বনে)

নেলি বাটলারের পেত্নি

নেলি বাটলারের আগে আমেরিকার কোথাও কোনও পেত্নি কারও চোখে পড়েনি একথা কেউ জোর গলায় বলতে পারবেনা, বললে হয়ত সত্যের অপলাপ হবে। কিন্তু নেলি বাটলারের আগে আর কোনও পেত্নির উল্লেখ আমেরিকার সরকারি কাগজপত্রে করা হয় নি এটা জলজ্যান্ত সত্যি। সেদিক থেকে বিচার করলে নেলি বাটলারকে আমেরিকার সরকারি ভাবে স্বীকৃত প্রথম বা আদি পেত্নি হিসেবে অনায়াসে উল্লেখ করা চলে।

ম্যাকিয়াস্পোর্ট উপকূলের কাছেই থাকেন অ্যাবনার ব্লেইসডেল নামে এলাকার এক বিশিষ্ট সজ্জন, ১৭৯৯-এর ৯ আগস্ট তারিখে রাতের বেলা তাঁর পরিবারের লোকেরা ডিনার খেতে বসেছে এমন সময় সমুদ্রের দিক থেকে ধেয়ে আসা ঝোড়ো বাতাসের প্রবল ঝাপটায় খাবার ঘরের সবকটা মোমবাতি একসঙ্গে নিভে গেল। মনে হল কেউ যেন প্রবল এক ফুঁ দিয়ে সবক'টা মোমবাতি একসঙ্গে নিভিয়ে দিল। কাজের লোকেরা দেশলাই-এর খোঁজে ছুটে গেল একতলার ভাঁড়ারে। এরই মাঝে আঁধার ঘেরা খাবার ঘরে শোনা গেল এক যুবতীর গলা—"তোমরা শীগগিরই এই গাঁয়ে আমায় দেখতে পাবে।" এটুকু বলেই সেই কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেল।

পরিবারের বুড়ো কর্তা অ্যাবনার নিজেও খেতে বসেছেন। সেই গলা তাঁর কানেও গেছে। "কে বললে কথাটা?" আঁধারের মধ্যে তিনি ধমকে উঠেলেন, "কোন রাসকেলের এত আস্পর্দ্ধা হয়েছে শুনি?" কর্তার ধমক শুনে সবাই চুপ, ঘরের মধ্যে সূঁচ পড়লেও বুঝি শোনা যাবে। এরই মাঝে কাজের লোকেরা ফিরে এল, দেশলাই জ্বেলে মোমবাতির সলতেগুলো আবার ধরিয়ে দিল তারা। সেই চাপা আলোয় পরিবারের সদস্যদের মুখের পানে তাকালেন অ্যাবনার, দেখলেন সবাই কেমন হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। খানিক আগে যে মেয়েটির গলা তাঁর কানে এল সে যে এখানে ডিনার টেবলে বসে নেই এ বিষয়ে নিশ্চিত হলেন তিনি। তা জেনেই চড়া মেজাজ

ঠাণ্ডা করলেন। নিজেকে যথেষ্ট শান্ত রেখেই অ্যাবনার বললেন, খানিক আগে যাই শুনে থাকুক না কেন একথা যেন বাইরের লোকেদের কানে না যায় ; গেলে তাঁর বাড়িতে ভূতের ডেরা এই অহেতুক দুর্নাম গাঁময় রটবে তাও বুঝিয়ে বললেন। কাজের লোকেরা সবাই পুরোনো এবং বিশ্বস্ত, তাদেরও আলাদাভাবে জড়ো করে একই হুঁশিয়ারি দিলেন অ্যাবনার।

বাড়ির কর্তার হুঁশিয়ারি মাথার রেখে ব্রেইসডেল পরিবারের সবাই আর তাদের কাজের লোকেরা ব্যাপারটা চেপে গেল। দিন কাটতে লাগল স্বাভাবিক গতিতে। একসময় অ্যাবনার সমেত তাঁর পরিবারের লোকেরা ধরেই নিল ডিনার টেবলে ক'দিন আগে রাতেরবেলা যে রহস্যময় নারীকণ্ঠে তারা শুনেছিল আসলে তা ঝোড়ো বাতাস বইবার ফলে উদ্ভূত 'বিভ্রম' ছাড়া কিছু না, এর মধ্যে অলৌকিক ব্যাখ্যার অতীত কিছু নেই। কিন্তু এই অনুমান যে ভুল ক'মাস বাদেই তার প্রমাণ পেল তারা। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ২ রা জানুয়ারি ব্রেইসডেল পরিবারের লোকেরা রাতে খেতে বসেছিল এমন সময় আবার সেই রহস্যময় যুবতীর গলা ভেসে এল, "ক'দিন আগে আবার আসব বলেছিলাম, ভোলনি ত? দ্যাখো, আজ আবার আমি এসেছি।"

"তুমি কে গা?" বুড়ো অ্যাবনারের দ্বিতীয় পক্ষের মাঝবয়সী গিন্নি ভয়ে ভয়ে জানতে চাইলেন, "নাম কি তোমার, থাকো কোথায়?"

"আমি নেলি গো, খুড়ি, এই গাঁয়ের মেয়ে, আমায় চিনতে পারছ না?"

"নেলি!" নামটা গিন্নির চেনা চেনা ঠেকল, সাহস করে বললেন, "বাপের নাম কি?"

"আমি ডেভিড হুপারের মেয়ে নেলিগো, খুড়ি।"

"ডেভিড হুপার। গিন্নি আবার বললেন, "তোমার বিয়ে হয়েছে?"

"হবে না কেন," অদৃশ্য যুবতীর গলা ভেসে এল, "আমার স্বামী ফৌজি অফিসার, নাম ক্যাপ্টেন জর্জ বাটলার। গিন্নির মুখের দিকে তাকাতে অ্যাবনার বুঝতে পারলেন খুব চেনা একজনের সঙ্গে কথা বলছেন তিনি।

"এবার তোমায় চিনেছি গো মেয়ে," বলে স্বামীর থমথমে মুখের দিকে একবার তাকালেন অ্যাবনার গিন্নি যেন খাবার ঘরের গুমোট আবহাওয়া হালকা করতেই আবার জানতে চাইলেন, "তা ফৌজি সোয়ামিকে ছেড়ে তুমি এমনই করে ঘুরে বেড়াচ্ছো কেন?"

"আমি যে বেঁচে নেই গো খুড়ি," অদৃশ্য নেলি বাটলার জবাব দিল। "সেই যে বিয়ের পরের বছর প্রথমবার বাচ্চা বিয়েতে গিয়ে বাচ্চার সঙ্গে আমিও মরে গেলাম। মনে পড়ে? আমার কবরে ত তুমিও ফুলের মালা দিয়েছিলে গো খুড়ি, ভুলে গেলে? আমি কিন্তু ঠিক মনে রেখেছি। আমি ত মরে গেলাম, এখন হাজার চাইলেও সোয়ামি আমার দেখা পাবে না, পাশ দিয়ে গেলে ছুঁতেও পারবে না। বাজার হাট, রান্নাবান্না, কাপড় কাচাটা, জল তোলা, চাইলেও এসব কিছুই এখন আর করতে পারি না, তাই শুধু শুধু ঐ জ্যান্ত মানুষটার সংসার আঁকড়ে থাকব কেন? তাই ইচ্ছেমতন ঘুরে বেড়াই এখানে সেখানে কারও বাড়ি পছন্দ হলে হাওয়ার সঙ্গে ঢুকে পড়ি ভেতরে। খাওয়া দাওয়া, জামাকাপড়, কিছুই এখন আর আমার দরকার হয় না। বাড়ির লোকেদের সঙ্গে মিলেমিশে দিব্যি দিন কেটে যায়। বলতে নেই গো খুড়ি, বেঁচে থাকতে বাপের কাছে, সোয়ামির সংসারে যেমন ছিলাম এখন তার চেয়ে ঢের ভাল আছি, হাজার গুণ।" অ্যাবনার গিন্নি করার মত আর কোনও প্রশ্ন খুঁজে পেলেন না। করবেনই বা কেন? তাঁর একের পর এক প্রশ্নের জবাব যা নিখুঁতভাবে দিয়ে যাচ্ছে বেঁচে থাকতে সে যে এই গাঁয়েরই মেয়ে ছিল

সে বিষয়ে তাঁর মনে তখন আর একতিলও সন্দেহ নেই। পাশাপাশি কিছু শঙ্কাও উঁকি দিচ্ছে তাঁর মনে, বৌ হয়ে এ-বাড়িতে আসার পরে তিনি দেখেছেন তাঁর মরা সতীনের ছোট ছেলে পলের সঙ্গে এ গাঁয়েরই মেয়ে নেলি হুপারের মাখামাখি একসময় বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। নেলির বাপ ডেভিড হুপারের সামাজিক মানমর্যদা তেমন ছিল না বলে অ্যাবনার তাঁর ছোটছেলে পলকে ধমকে ছিলেন, নেলির সঙ্গে তার বিয়ে যে কোনমতেই হতে পারে না তা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাকে। বাপের কাছে ধমক খেয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল পল। ফৌজে নাম লিখিয়ে চলে গেল লড়াইয়ে। এসব প্রায় পনেরো ষোল বছর আগের ঘটনা। বেঁচে থাকতে এ-বাড়ির ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেয়া হয় নি বলেই কি মৃত্যুর পরে নেলির পেত্নি সেই অপমানের ঝাল মেটাতে এখানে এসে ঢুকেছে। আশঙ্কার মেরু ঘনিয়ে এল অ্যাবনার গিন্নির মনে। নেলির পেত্নি পাছে কখন কোন অনিষ্ট করে বসে এই ভয়ে সিঁটিয়ে রইলেন তিনি।

মাসখানেক পরের ঘটনা। বার্ষিক ছুটি কাটাতে অ্যাবনারের ছোটছেলে ক্যাপ্টেন পল ব্রেইসডেল ব্যারাক থেকে বাড়ি এসেছেন। রোজের মত সেদিনও খুব ভোরবেলা ঘুম ভাঙ্গার পরে ফারের গ্রেট কোট গায়ে চাপিয়ে বেড়াতে বেরোলেন তিনি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে জোরকদমে পা ফেলে অল্প কিছুক্ষণের ভেতর গ্রামের শেষপ্রান্তে তিনি পৌঁছে গেলেন। আর খানিকটা গেলেই গির্জা আর তার লাগোয়া পুরোনো কবরখানা। ক্যাপ্টেন ব্রেইসডেল গির্জাকে বাঁয়ে রেখে কিছুদূর এগোতে আচমকা দূরে জ্যোতিপুঞ্জের মত একঝলক শ্বেতশুভ্র আলো ভেসে উঠল। দেখতে দেখতে সেই আলো এক নারীমূর্তির আকার নিল। ক্যাপ্টেন ব্রেইসডেল অবাক হয়ে দেখলেন সেই নারীমূর্তি অদ্ভুত দ্রুতবেগে উল্টোদিক থেকে এগিয়ে আসছে কিন্তু তার পা মাটিতে ঠেকছে না। তাঁর মনে হল মেয়েটি হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসছে। কাছাকাছি আসতে সেই নারীমূর্তির উজ্জ্বল দীপ্তিতে তাঁর চোখ ঝলসে গেল। চোখ নামিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ালেন। ক্যাপ্টেন ব্রেইসডেল পাশ কাটিয়ে যাবার মুহূর্তে লক্ষ করলেন মেয়েটির দেহ যেন দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। তার পরনের পোষাকও অদ্ভুত সাদা। তার উজ্জ্বলতা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। পাশ কাটিয়ে চলে যাবার খানিক বাদে সেই মূর্তি বাতাসে মিলিয়ে গেল।

বাড়ি ফিরে ক্যাপ্টেন ব্রেইসডেল ইচ্ছে করেই ব্যাপারটা চেপে গেলেন। তাঁর বারবার মনে হল এই ঘটনার কথা শুনলে বাড়ির কেউ তা বিশ্বাস করবে না। রাতের বেলা অত্যাধিক মদ্যপানের কুফল মন্তব্য করে মুখ টিপে হাসবে।

কিন্তু বাড়ির লোকেদের মন থেকে অবিশ্বাস যা কর্পূরের মত উবে গেছে সেদিনই ক্যাপ্টেন ব্রেইসডেল তার প্রমাণ পেলেন। রাতেরবেলা ডিনার টেবলে বাড়ির লোকেদের সঙ্গে খেতে বসার খানিক বাদেই অ্যাবনার গিন্নির কানের পাশে শোনা গেল সেই গলা, "আমি এসেছি গো, থুড়ি। তোমার ক্যাপ্তেন ছেলেকে একটু ধমকে দেব বলেই এলাম।"

অ্যাবনার গিন্নির মুখোমুখি বসেছিলেন ক্যাপ্টেন ব্রেইসডেল। গলা শুনে তিনি চমকে উঠলেন, কাঁটা চামচ ধরা হাতদুটো আপনিই গেল থেমে। পনেরো ষোল বছর আগে এই গলায় যে কথা বলত গাঁয়ের সেই মেয়েটি আজও তাঁর মনপ্রাণ জুড়ে বসে আছে আর সেই কারণেই আজও বিয়ে করেন নি তিনি। কিন্তু মানুষটাকে সেখানে দেখা যাচ্ছে না। সেখানে তার গলার আওয়াজ আসছে কিভাবে? কিছু বুঝতে না পেয়ে জিজ্ঞাসু চোখে সৎমার মুখের দিকে তাকালেন তিনি।

"চিনতে পারছো না?" সৎমা হালকা গলায় বললেন। "নেলি এসেছে, আমাদের নেলি। আহা, বেচারি আমাদের মত কাউকে ছুঁতে পারে না। অ্যাদ্দিন বাদে তুমি এসেছো তাই তোমায় দেখতে এসেছে। ওর সঙ্গে একটু ভাল করে কথা বলো। আহা, বেচারির শরীর নেই, বড্ড দুঃখী।"

ক্যাপ্টেন ব্রেইসডেল হাঁ করে তাঁর সৎমা-র মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তাঁর কথার অর্থ তাঁর মাথায় ঢুকল না। ঠিক তখনই খিল খিল হাসিতে ভরে গেল খাবার ঘর। চাপা ধমকের সুরে কোনও যুবতী যেন বলে উঠল, "কি ব্যাপার, পল? মানছি আমি তোমাদের বাড়ির বৌ হবার উপযুক্ত ছিলাম না। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমি নিজে এমন অভদ্র আর অসভ্য হচ্ছ কেন?"

"কে তুমি? আঁতকে উঠে পাল্টা প্রশ্ন করলেন ক্যাপ্টেন ব্রেইসডেল। "আমাকে মিছিমিছি গালি দিচ্ছ কেন?"

"সে কি, গলা শুনেও আমায় চিনতে পারছ না? যাকে না দেখে একদিনও থাকতে পারতে না আমি সেই নেলি। আজ ভোরবেলা যখন গির্জার কাছে হাঁটছিলে তখন উল্টোদিক থেকে আমি এসেছিলুম তোমায় কাছ থেকে দেখব বলে। কিন্তু তুমি এমন হাবভাব করে সরে গেলে যেন আমায় চিনতেই পারলে না।"

"'কি করে চিনব, বলো ত!" এতক্ষণে ক্যাপ্টেন ব্রেইসডেল কিছু আঁচ করলেন। গলা নামিয়ে বললেন, "আমি দেখলুম একটা বলের মত একতাল সাদা আলো এক যুবতীর আকার নিল, তাই দেখে ঘাবড়ে গেলুম। কিন্তু সে যে তুমি তা জানব কি করে।"

"আমি যে বেঁচে নেই তা তোমার অজানা নয়, পল।" নেলির গলা স্পষ্ট শোনা গেল। "এখানকার মত আমাদের দুনিয়াতেও কিছু নিয়মকানুন আছে যা মেনে আমাদের চলতে হয়। আমি এখন যে স্তরে আছি সেখান থেকে দিনের আলোয় কাউকে দেখা দিতে হলে এরকম আলোর ভেতর দিয়েই আমায় আসতে হবে। যাক্, অ্যাদ্দিন বাদে দেখা হল। এতগুলো কড়া কথা বললাম বলে কিছু মনে কোর না। তবে ফৌজি ক্যাপ্টেন হয়েছো বলে নিজেকে কেউকেটা ভেবো না। আমি নিজেও একসময় ফৌজি ক্যাপ্টেনের বৌ ছিলাম। আমার সোয়ামি ক্যাপ্টেন জর্জ বাটলার এখনও বেঁচে, হয়ত তোমার সঙ্গে তাঁর আলাপও হয়ে থাকবে।"

"আমায় মাফ করো, নেলি," ক্যাপ্টেন ব্রেইসডেল ধরা গলায় বললেন, "আমি সকালবেলা সত্যিই তোমায় চিনতে পারিনি। বিশ্বাস করো। আজও মনপ্রাণ জুড়ে একজনই আছে সে তুমিই নেলি শুধু তুমি।"

"আমি জানি, পল, " নিমেষে ক্ষোভ ভুলে গিয়ে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল নেলি। এও জেনো, "আমি সবসময় তোমার সঙ্গে আছি, থাকবও।"

পৃথিবীর কোনও সামাজিক শাসন তোমার কাছ থেকে আমায় কখনও বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। রাত অনেক হল। এবার আমার যাবার সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমি চললুম, কিছুদিন এখন আর আসব না। চলি গো খুড়ি। বিদায় পল!" বলার সঙ্গে সঙ্গে ডান গালে চুম্বনের উষ্ণ ছোঁয়া স্পষ্ট অনুভব করলেন ক্যাপ্টেন পল ব্রেইসডেল।

"নেলি!" চাপা গলায় আর্তনাদ করে উঠলেন অ্যাবনার গিন্নি, "কোথায় গেলি? ফিরে আয় সোনা! আমরা তোকে ভুলিনি, কথা দিচ্ছি ভুলব না!" কিন্তু নেলির সাড়া আর পাওয়া গেল

না। অ্যাবনার ব্রেইসডেল বসেছিলেন টেবলের শেষ মাথায়। নেলির সাড়াশব্দ না পেয়ে তিনি গিন্নির দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বললেন, "আপদটা সত্যিই বিদেয় হয়েছে?" কিন্তু অ্যাবনার গিন্নি তাঁর এ প্রশ্নে কোনও জবাব দিলেন না। এক বিদেহী সত্ত্বার বিরহ ব্যাথা যে জীবিত মানুষের চেয়ে কম তীব্র নয় তা তিনি অনুভব করতে পেরেছেন।

নেলি বেঁচে থাকতে তার সঙ্গে যে খারাপ ব্যবহার করেছিলেন সেকথা মনে পড়তে স্বামিকে তাঁর কৃমিকীটেরও অধম বলে মনে হল। জল ভরা চোখে মুখ নিচু করে আপন মনে তিনি খেতে লাগলেন।

ছুটি কাটিয়ে ক্যাপ্টেন পল ব্রেইসডেল ব্যারাকে ফিরে গেলেন। তার মাসখানেক বাদে এক সন্ধের পরে ব্রেইসডেল পরিবাবে নেলির আত্মা আবার এল। এবার এসেই সে সরাসরি অ্যাবনার গিন্নিকে বলল।

"সবাইকে নিয়ে ভাঁড়ার ঘরে চলে এসো গো খুড়ি। ওখানে বসে তোমাদের সঙ্গে কিছু গালগল্প করব।"

ভাঁড়ার ঘর মাটির নিচে। নেলির কথা এড়াতে পারলেন না। অ্যাবনার গিন্নি মেয়ে বৌদের নিয়ে চলে এলেন সেখানে। ভাঁড়ারে ঘুটঘুটে আঁধার। তার মানে অ্যাবনার গিন্নির মেয়ে মোমবাতি জ্বালতেই তা দপ্ করে নিভে গেল। মেয়েটির মনে হল কেউ পাশ থেকে ফুঁ দিয়ে তা নিভিয়ে দিল।

"আলোর চেয়ে আঁধারেই ভাল", নেলির বিদেহী সত্ত্বার চেনা গলা ভেসে এল, "আমি কিন্তু তোমাদের সঙ্গে গল্প করতে আসিনি। পরম করুণাময়ের ইচ্ছায় এমন কিছু কথা তোমাদের বলতে এসেছি যা গির্জার পাদ্রিরা জানলেও নিজে থেকে তোমাদের শোনাবেন না। শোন সবাই, মৃত্যুকে ভয় পেয়োনা। মৃত্যু নবজন্ম ছাড়া কিছু নয়। এমন অনেক কিছু জানার আছে যা বেঁচে থাকতে হাজারও বই পড়ে বা উপদেশ শুনে জানা যায় না। কিন্তু মরণের পরে সে সবই আপনা থেকে জানা হয়ে যায়। এও জেনো, সত্যি সত্যি মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ হয় না। এই আমার কথাই ধরো। কবরের নিচে আমার শরীর কবে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, কিন্তু আমি তোমাদের মত এখনও বেঁচে আছি। এই আমিই হলাম আত্মা যা অনন্ত, যার শুরু নেই, শেষ নেই। তুমি, আমি, আমরা সবাই সেই পরম করুণাময়ের অংশ, তাঁরই ইচ্ছায় পৃথিবীতে কিছু কাজ করতে এসেছি। কাজ শেষ হলে আবার তিনিই আমাদের ওঁর নিজের কাছে ডেকে নেবেন।"

একি পেত্নি, না তত্ত্বজ্ঞানী? প্রশ্ন জাগল ব্রেইসডেল পরিবারের সদস্যদের মনে। ততদিনে নেলির আবির্ভাবের কথা আর চাপা নেই, গাঁয়ের অনেকের কাছেই তা পৌঁছেছে। কেউ বলছে এসব ভুয়ো, কেউ বলছে ব্রেইসডেল পরিবার রাতারাতি নাম কেনার মতলবে ভাঁওতাবাজি শুরু করেছে। ভূত প্রেত আবার আছে নাকি? থাকলেও তারা ধর্মকথা শোনায় এমন ত আগে কখনও ঘটেছে বলে শুনিনি।

একবার নয়, পরপর আরও কয়েকবার নেলি এল অ্যাবনার ব্রেইসডেল-এর বাড়িতে। বাড়ির সবাই একইভাবে জড়ো হল মাটির নিচের ভাঁড়ার ঘরে, সেখানে আঁধারের গায়ে গা ঠেকিয়ে তারা ধর্মকথা শুনল নেলির মুখে। প্রত্যেকবার চলে যাবার মুহূর্তে উজ্জ্বল সাদা দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হল নেলি। বাড়ির কর্তা অ্যাবনারের মনও একসময় টলল। বেঁচে

থাকতে নেলির সঙ্গে যতই খারাপ ব্যবহার করুন তার বিদেহী সত্ত্বা তাঁর মন জয় করল। আপন জনের মত তাঁর মায়া পড়ে গেল তার ওপর।

নেলি বাটলারের পেত্নির কথা একসময় পৌঁছোল এলাকার বড় পাদ্রি আব্রাহাম কুমিংস-এর কানে। কুমিংস শুধু পাদ্রি নন। তিনি ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের কৃতি স্নাতক। ব্রেইসডেল ভবনে কুমিংস নিজে গেলেন। বাড়ির লোকেদের বোঝালেন এসব ঈশ্বর বিরোধী কাজ। মৃত্যুর পরে কারও প্রেতাত্মা আর যাই হোক কখনও ধর্মকথা শোনাতে আসেনা। বাড়ির লোকেরা কেউ তাঁর কথায় প্রতিবাদ না করলেও হাবে ভাবে বুঝিয়ে দিল তাঁর গায়ে পড়া উপদেশ তাদের বরদাস্ত হচ্ছে না। সেদিনই সন্ধের পর গির্জেয় ফেরার পথে নেলির প্রেতমূর্তি দেখা দিল। পাদ্রি আব্রাহাম কুমিংস, তার জ্যোতির্ময়ী রূপ দেখে আবেগে বিহ্বল হয়ে হাত জোড় করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন পথের মাঝখানে। তারপর গির্জায় ফিরে গিয়ে এই দিব্য দর্শনের কথা তিনি গির্জায় খাতার পাতায় নথিবদ্ধ করলেন। ১৮২৬-এ ... এই ছাপানো বিবরণ আজও রক্ষিত আছে যার প্রতিলিপি আছে ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে। এইভাবে নেলি বাটলারের পেত্নির কথা আমেরিকার কিছু গির্জা ও সরকারি কাগজপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। আর উল্লেখ করা মানেই এ এক জাতের স্বীকৃতি পাওয়া।

এর কিছুদিন পরে ঘটল এক চমকপ্রদ ঘটনা। এক পার্টিতে আমন্ত্রিত হলেন নেলির স্বামী ক্যাপ্টেন জর্জ বাটলার। ঘটনাচক্রে লিসিয়া নামে অ্যাবনার ব্রেইসডেলের এক মেয়েও ছিল সে পার্টিতে। প্রথম দর্শনেই লিসিয়াকে ক্যাপ্টেন বাটলারের ভাল লেগে গেল। পার্টিতে লিসিয়ার কোমর জড়িয়ে ধরে তিনি নাচলেনও। ক'দিন পরে রাতের বেলা স্বামীকে দেখা দিল নেলি, লিসিয়াকে বিয়ে করার জন্য তাকে অনুরোধ করল সে। এই একই অনুরোধ নিয়ে সে আবার এল ব্রেইসডেল ভবনে, অ্যাবনারের স্ত্রীকে মিনতি করল যাতে লিসিয়াকে তিনি তার বিপত্নীক স্বামীর সঙ্গে বিয়ে দেন। ক্যাপ্টেন বাটলার বয়সের অজুহাত তুলে প্রথমে রাজি হতে চান নি। তখন নেলি তাঁকে বলল যে লিসিয়ার আয়ু বেশি নেই। বিয়ের বছর খানেকের ভেতর তারই মত বাচ্চা হতে গিয়ে মারা যাবে সে। নেলি কথা দিল লিসিয়া মারা গেলে সে আর কখনও তার স্বামীকে বিয়ে করার জন্য অনুরোধ করবে না।

"আমার কথা একবার ভাবো ত". যাবার আগে স্বামীর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল নেলি, "একা একা আমার সময় কাটে কি করে। আমার কাছে আসতে তোমার এখনও অনেক দেরি। তুমি লিসিয়াকে বিয়ে করো। তাহলেই ও মারা যাবে। তখন আমি আর একা থাকব না। ওকেও নিয়ে আসব আমার কাছে। দোহাই তোমায় এখানে আমার সঙ্গি দরকার। সে কথা ভেবে তুমি বিয়ে করো লিসিয়াকে, আমার একটা সতীন এনে দাও।"

স্ত্রীর প্রেতাত্মার এই আর্তি শুনে ক্যাপ্টেন বাটলার বিয়ে করতে রাজি হয়েছিলেন। অ্যাবনার ব্রেইসডেলের মেয়ে লিসিয়াকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন তিনি। প্রেতাত্মার ভবিষ্যদ্বানী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল, বিয়ের বছর খানেক বাদে মা হতে গিয়ে লিসিয়া আর তার নবজাত সন্তান দু'জনেই মারা যায়। ঐ শোকাবহ ঘটনার পরে নেলি বাটলারের পেত্নি আর কখনও ব্রেইসডেল পরিবারে দেখা দেয়নি।

অ্যামিটিভিলের অভিশপ্ত বাড়ি

তারিখটা ছিল ১৯১৪-এর ৫ই ফেব্রুয়ারি। নিউইয়র্ক টিভি-র চ্যানেল ফাইভে রাত দশটার খবর পড়া সবে শুরু হয়েছে. দেশ বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ যাবতীয় খবরের হেডলাইনের বিশদ বিবরণ দেবার পরে সুন্দরী সংবাদ পাঠিকা আচমকা জানালেন অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী এমন কিছু মানুষকে নিয়ে তাঁদের চ্যানেলে শীগ্‌গিরই ধারাবাহিক ভাবে একটি অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হবে। এই প্রসঙ্গে তাঁদের প্রতিবেদক স্টিভ বাওম্যান লং আইল্যাণ্ডের অ্যামিটিভিলে একটি ভূতুড়ে বাড়ির ওপর অনুসন্ধানমূলক তদন্ত চালিয়ে যা জেনেছেন তা এবার দর্শকদের সামনে তুলে ধরবেন।

ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ পাঠিকার মুখ ক্ষুদে হয়ে উঠে এল পর্দার ওপরে এককোণে, তার জায়গায় পর্দার বুকে ফুটল দাড়ি গোঁফওয়ালা এক পুরুষালি মুখ।

"স্টিভ বাওম্যান বলছি," আত্মপরিচয় দিয়ে চ্যানেলে ফাইভের প্রতিবেদক শুরু করলেন, "ফেলে আসা কয়েক বছর আগের এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দিয়ে আমি আমার প্রতিবেদন শুরু করছি ; সবটুকু শোনার পরে তা বিশ্বাস করা বা না করা পুরোপুরি আপনাদের নিজস্ব ব্যাপার। সেদিন ছিল ১৯৭৪-এর ১৩ই নভেম্বর। অ্যামিটিভিলের ওশিয়ান অ্যাভিনিউ-র ১০২ নম্বর বাড়ির মালিক ছিল ডেফো পরিবার। ঐ পরিবারের ছেলে রোনাল্ড সবে চব্বিশে পা দিয়েছে. একটি শক্তিশালী রাইফেল কিভাবে সে জোগাড় করেছিল, আচমকা সেই রাইফেলের গুলি চালিয়ে ঐদিন সে তার বাবা মা, দুই ভাই আর দুটি বোনকে পরপর খুন করে। দোষী প্রমাণিত হওয়ায় আদালত তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে।"

ভূমিকাটুকু শুনেই দর্শকদের রক্ত হিম হবার জোগাড়, তবু উদগ্র কৌতূহল চাগিয়ে রেখে তাঁরা কান খাড়া করে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন টিভির পর্দার দিকে। নিউইয়র্ক সমেত গোটা মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র ত বটেই, তাছাড়াও বিভিন্ন দেশের যেসব দর্শক ভূত অদ্ভুত আর কিম্ভূত কাহিনী পড়তে বা শুনতে ভালবাসেন তাঁদেরও চোখ সেঁটে আছে টিভির পর্দায়।

"দু'মাস আগে," প্রতিবেদক স্টিভ বাওম্যান আবার খেই ধরলেন, "জর্জ লুত্‌জ আর তাঁর স্ত্রী ক্যাথরিন ঐ অভিশপ্ত বাড়িটি নগদ আশি হাজার ডলার দিয়ে কেনেন। দু'বছর আগে একটি গোটা পরিবারের ঐ বাড়িতে খুন হবার ঘটনার বিবরণ জেনে শুনেই তাঁরা বাড়িটি কিনেছিলেন। কিন্তু জর্জ বা তাঁর স্ত্রীর মনে কোনও কুসংস্কারের বীজ ছিল না। কিনলে ঐ-বাড়িতে গিয়ে থাকলে সেখানকার অশুভ প্রভাব তাঁদের তিনটি সন্তানের ওপর পড়বে এমন কোনও আশংকা ঠাঁই পায়নি তাঁদের মনে। ২৩ শে ডিসেম্বর তারিখে লুত্‌জ পরিবার এসে নতুন কেনা বাড়িতে ওঠেন, আর তারপরে কিছুদিন যেতে না যেতেই এক অশুভ অশরীরী আবহমণ্ডল গোটা বাড়ি আর তার লাগোয়া জায়গার সবখানে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে এমন অনুভূতি জাগে তাঁদের মনে ; এমন কিছু ঘটনা পরপর সেখানে ঘটতে থকে যার দরুন প্রাণের আশংকাও দেখা দেয় তাঁদের মনে। শ্রীযুক্ত লুত্‌জ আর তাঁর স্ত্রীর নিজের ভাষায়, চোখে দেখা না গেলেও অনুভব করা যায় এমন এক দুনির্বার অপ্রাকৃতিক অশুভ শক্তি আমাদের থাকার দিনগুলোতে ঐ বাড়ির ভেতরে ক্রমেই বেড়ে উঠছিল।"

ভাবতে পারেন নতুন, কেনা বাড়িতে লুত্‌জ পরিবার চার সপ্তাহ অর্থাৎ মাত্র আঠাশ দিন কোন মতে দাঁতে দাঁত দিয়ে কাটাতে পেরেছেন, তারপরে উনত্রিশ দিনের মাথায় সে বাড়ি ছেড়ে উঠে গেছেন অন্য খানে, হিতাকাঙ্খী বন্ধুদের নিরাপদ আশ্রয়ে। অভিশপ্ত বাড়িটি ছেড়ে চলে আসার সময় অল্প কিছু জামা-কাপড় ছাড়া সঙ্গে আর কিছুই নেন নি তারা। লুত্‌জ পরিবার নতুন কেনা বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার আগে একটানা আঠাশ দিন যে সংকটের মুখোমুখি হয়েছে তা ঐ এলাকার বাসিন্দাদের কারও জানতে বাকি নেই। স্থানীয় গির্জার পাদ্রি, পুলিশ কর্তৃপক্ষ এবং ব্যাখার অতীত অপ্রাকৃতিক শক্তি বিষয়ক গবেষণাকারী একটি গোষ্ঠী, সবার সঙ্গেই নিজেদের উদ্ভুত সংকটজনক পরিস্থিতি নিয়ে লুত্‌জ পরিবারের সদস্যরা একাধিকবার কথাবার্তা বলেছেন। জর্জ আর তাঁর স্ত্রী ক্যাথরিন তাঁদের জানিয়েছে এক অস্বাভাবিক অচেনা শক্তি একেক সময় ভর করত তাঁদের ওপর, ঐ সময় অনেক অচেনা লোকের গলা তাঁরা স্পষ্ট শুনতে পেতেন। এমন ঘটনাও ঘটেছে যখন সেই অদেখা শক্তি শ্রীমতী লুত্‌জকে একাধিক বার মেঝে থেকে শূন্যে তুলে হাওয়ায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে বাড়িরই এক নির্দিষ্ট ছোট কামরায় দিকে। আশ্চর্যের ব্যাপার ঐ কামরায় পেছনে একটি ঘর আছে যার উল্লেখ বাড়ি তৈরির ব্লুপ্রিন্টে আদৌ নেই।"

"ক্যাথলিক গির্জাও এই রহস্যজনক ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে," চ্যানেল ফাইভের প্রতিবেদক স্টিভ বাওম্যান বললেন, "গত ডিসেম্বরে ভ্যাটিকান থেকে দু'জন পাদ্রি মহামান্য পোপের প্রতিনিধি হিসেবে অ্যামিটিভিলেতে এসে পৌঁছোন, লুত্‌জ পরিবারকে যত শীগ্‌গির সম্ভব ঐ-বাড়ি ছেড়ে দেবার উপদেশ দেন তাঁরা। ক্যাথলিক গির্জার অলৌকিক বিষয়ক পর্ষদ সেখানকার সব ঘটনা আনুপূর্বিক খতিয়ে দেখে যে অভিমত এই প্রসঙ্গে দিয়েছেন তার সারমর্ম হল ওশিয়ান অ্যাভিনিউ-র ১১২ নম্বর বাড়িতে এমন কিছু প্রেতাবেশ ঘটেছে সাধারণ জ্ঞানে যার পরিমাপ অসাধ্য।

বাড়ি ছেড়ে সপরিবারে চলে আসায় পরে জর্জ লুত্‌জ সাংবাদিকদের জানিয়েছেন তিনি, তাঁর পরিবারের সদস্যরা কেউ ও-বাড়িতে আর একটি রাতও কাটাবেন না ঠিকই, কিন্তু তাই বলে ও বাড়ি তিনি বিক্রি করবেন একথা ভাবা ভুল। বৈজ্ঞানিক এবং অপ্রাকৃতিক, দুই রকমেরই পরীক্ষা নিরীক্ষা ঐ বাড়ির ওপর চালাতে তিনি উদ্যোগী হয়েছেন, যাঁরা এসব পরীক্ষা চালাবেন তাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে সবাই পেশাদার লোক বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

সবশেষে জানাই এই ঘটনা নিয়ে খবরের কাগজ, বেতার ও টিভিতে এত প্রচার হয়েছে যে একেক সময় তা বাস্তবের সীমা অতিক্রম করে গেছে। প্রধানত এই কারণে লুত্‌জ পরিবার এখন ঐ বাড়ি প্রসঙ্গে গণমাধ্যমগুলোর সঙ্গে আর যোগাযোগে ইচ্ছুক নন।"

লুত্‌জ পরিবারের কর্তার পুরোনাম জর্জ লি লুত্‌জ, বয়স মাত্র ২৮। জমিজমা বাড়িঘর নিয়ে তার কারবার। জর্জ পেশায় ল্যাণ্ড সার্ভেয়র। উইলিয়ম এইচ প্যারির ল্যাণ্ড সার্ভেয়িরং কোম্পানি নামে যে প্রতিষ্ঠানের সে মালিক, তিনপুরুষ আগে তা করেছিলেন তারই ঠাকুর্দা। জর্জের বৌ ক্যাথরিণের বয়স ৩০। লাখখানেক ডলারের মধ্যে নিজেদের একখানা বাড়ির স্বপ্ন অনেকদিন ধরে দেখে এসেছিল দু'জনে। দালালরা অনেক বাড়ির খোঁজখবর এনে দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সেসবের কোনটিই পছন্দ হয়নি। খুঁজতে খুঁজতে হাল ছেড়ে দেবার অবস্থায়

পৌঁছোনোর পরে এক দালালের মাধ্যমে লং আইল্যাণ্ডের অ্যামিটিভিলে এই বাড়ির খোঁজ পেয়েছিল জর্জ। অ্যামিটিভিল নদির গা ঘেঁষে দাঁড়ানো এই বাড়িটির গায়ে ডাচ বা ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক শাসকদের রুচির ছাপ—মোট ছটি বেডরুম, বড়সড় একখানা লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, তিনখানা বাথরুম, ভেতরে চারদিক ঘেরা বারান্দা, দুটো গ্যারাজ, মাটির নিচে ভাঁড়ারঘর, সুইমিংপুল এবং একখানা বড়সড় বোটহাউস অর্থাৎ জলের ধারে নৌকো রাখার মত একখানা বড় পাকা ঘর। আর এসবই মিলবে মাত্র আশিহাজার ডলারের বিনিময়ে। জর্জ আর তার বৌকে দালাল বাড়িটা দেখিয়ে আনল। জর্জের নিজেরও বাড়িঘর জমিজমা নিয়ে কাজ করবার, সবকিছু খুঁটিয়ে দেখল সে, তারপর জানাল এ বাড়ি তাদের দু'জনেরই পছন্দ হয়েছে। বাড়ি পছন্দ হয়েছে জেনে দালাল ঐ বাড়িতে ১৯১৪-এর ১৩ই নভেম্বর যে ছ'টা খুন হয়েছিল সেই ঘটনা তাদের শুনিয়েছিল। পুলিশ এসে ছ-ছ'টা মৃতদেহ উপুড় হয়ে পড়ে আছে দেখেছিল তাও গোপন করেনি সে। খুনের দায়ে অভিযুক্ত রোনাল্ড ডেফো আদালতে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যে জবানবন্দি দিয়েছিল জর্জ আর ক্যাথরিনকে দালাল তাও শুনিয়েছিল। আসামির পক্ষ সমর্থন করতে আদালতই উকিল ঠিক করে দিয়েছিল। উইলিয়াম ওয়েবার নামে সেই উকিল মক্কেলের জবানবন্দি নথিভুক্ত হবার পরে তাকে বিকৃত মস্তিষ্ক প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। আসামি রোনাল্ড ডেফো তার জবানবন্দিতে উল্লেখ করেছিল খুনগুলো করার ক'মাস আগে থেকে কানের কাছে অনেক লোকের গলার আওয়াজ শুনতে পেত সে। কিন্তু আশেপাশে কাউকে দেখতে না পেয়ে একসময় সে ধরেই নিয়েছিল স্বয়ং ঈশ্বর তার সঙ্গে কথা বলছেন। তার ভাষায়, তিনিই তাকে পরিবারের সবাইকে খুন করার প্রেরণা দেন। বলা বাহুল্য, এসব ঘটনাকে জর্জ বা তার বৌ ক্যাথরিণ কেউই গুরুত্ব দেয়নি। নগদ আশিহাজার ডলার দিয়ে পরদিনই বাড়িখানা কিনেছিল জর্জ। জর্জের দুই ছেলে এক মেয়ে। বাড়িতে থাকার মত ঘর আছে ছ'খানা। তাই বৌয়ের সঙ্গে কথা বলে জর্জ ঠিক করল তেতলার একটা বেডরুমে তারা দু'জন শোবে, আরেকটায় ছেলেদের শোবার ব্যবস্থায় করবে। এছাড়া তেতলার আরও একটা ঘর খেলাধুলোর সরঞ্জাম রাখার জন্য ছেলেদের দেবে। মেলিসার ডাকনাম মিসি, বৌয়ের কথামতই দোতলার একটা ঘরে তার শোবার বন্দোবস্ত করল জর্জ।

বাড়ি ত হল, কিন্তু এরপরে দেখা দিল আসবাবের সমস্যা। এতবড় বাড়িতে থাকবে কিন্তু আসবাব বলতে কিছুই থাকবে না তাও কি কখনও হয়? অতএব দখল নেবার আগে দালালের অফিসে আবার এল জর্জ, বাড়ির আগের মালিক ডেফো পরিবারের ব্যবহৃত যাবতীয় আসবাব পত্র ও অন্যান্য জলের দরে মাত্র চারশো ডলারে কিনে নিল সে। এইসব আসবাবপত্র ও সরঞ্জামের মধ্যে ছিল ডেফো পরিবারের খাট বিছানা, একটি মেয়েদের বিছানা সমেত খাট, টিভি দেখার চেয়ার, ডিনার টেবল সমেত রান্না ও খাবার বাসনপত্র। এছাড়া সাতটা এয়ারকণ্ডিশনার, দু'টো ওয়াশিং মেশিন, একটা আনকোরা নতুন ফ্রিজ আর একটা ডিপফ্রিজ। খুনি রোনাল্ড ডেফোর ঘরের যাবতীয় আসবাবও ছিল এর মধ্যে।

এরপরে বাকি রইল জিনিসপত্র গোছগাছ করার পালা। সেসব পালা শেষ হলে ১৯১৪-এর ১৮ই ডিসেম্বর দুপুর একটায় বৌ ছেলেমেয়ে, পোষা কুকুর হ্যারি আর ট্রেলার বোঝাই মালপত্র নিয়ে এসে উঠল অ্যামিটিভিল নদীর ধারে ওশিয়ান অ্যাভিনিউর ১১২ নম্বর বাড়িতে। নতুন

বাড়িতে ঢোকার মুখে জর্জ আর ক্যাথরিণের মনে পড়ল স্থানীয় গির্জার পাদ্রি ফাদার মানকুসো খানিক বাদেই আসবেন নতুন বাড়িতে স্বস্ত্যয়ন করতে। স্বস্ত্যয়ন বলতে বাড়ির সবক'টি ঘরে পবিত্র জর্ডান নদীর জল ছেটানো। তারপর বাইবেলের অংশবিশেষ পাঠ করে বাড়ির বাসিন্দারা যাতে স্বস্তিতে দিন কাটাতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানানো।

কেন কে জানে সেদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গার পর থেকেই ফাদার মানকুসোর মন অস্বস্তিতে ভরে গিয়েছিল। চোখমুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে এক অজানা ঘোরের ভেতর তিনি পায়চারি করছিলেন রেক্টরির ভেতরের আঙ্গিনায়। কিন্তু অস্বস্তি বোধ করলেও সেদিনের কার্যসূচি সব একে একে তাঁর মনে পড়ছিল—এক, লিণ্ডেনহার্স্ট প্যারিশে নিমন্ত্রণ ; দুই, লুত্জ পরিবারের নতুন বাড়িতে স্বস্ত্যয়ন। তারপর যেখান থেকে নিজের মাকে দেখতে যাওয়া এবং রাতের ডিনার তাঁর সঙ্গে খাওয়া।

ফাদার মানকুসো লুত্জ পরিবারের পুরোনো হিতাকাঙ্খী। জর্জ লুত্জ নিজে মেথডিস্ট সম্প্রদায়ভুক্ত খ্রীষ্টান হলেও ক্যাথির সঙ্গে বিয়ের অনেক আগে থেকে তাকে তিনি চেনেন। ক্যাথি, অর্থাৎ ক্যাথরিণ জর্জের চেয়ে তিন বছরের বড় এবং তার আগেও একবার বিয়ে হয়েছিল, ক্রিস, ড্যানি, আর মিসি, এই তিনটি ছেলেমেয়ে ক্যাথির ভূতপূর্ব স্বামীর সন্তান। স্বামী অকালে মারা যাবার পরে তিন সন্তান সমেত ক্যাথিকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছে জর্জ লুত্জ। ফাদার মানকুসো নিজে ক্যাথলিক পাদ্রি, ক্যাথির তিন সন্তান ও ক্যাথলিক মা-বাপের সন্তান, তাই তাদের মঙ্গল কামনা করা তাঁর নৈতিক কর্তব্য। সফল ব্যবসায়ী জর্জকে বিয়ে করে নতুন করে ঘর বাঁধার পরে ক্যাথি এর আগে বহুবার তাঁকে তাদের বাড়িতে ডিনারের নিমন্ত্রণ জানিয়েছে, কিন্তু নানা কারণে তিনি সে নিমন্ত্রণ রাখতে পারেন নি। এবার অ্যামিটিভিলেতে নতুন বাড়ি কেনার পরে ক্যাথি আর জর্জের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে না পেয়ে তিনি নতুন বাড়িতে এসে স্বস্ত্যয়ন করতে রাজি হয়েছেন। অ্যামিটিভিলে যাবার আগে তাঁকে যেতে হবে লিণ্ডেনহার্স্টে, পাদ্রি হিসেবে সেখানকার প্যারিশেই তিনি প্রথম যাজক জীবন শুরু করেছিলেন। সেই সময়ের তার বন্ধু-স্থানীয় আরও তিন পাদ্রির সেখানে আসার কথা, বহুদিন পরে চারজনে আজ লাঞ্চ খাবেন একসঙ্গে। ওখান থেকে ফেরার পথেই পড়বে অ্যামিটিভিল, পুরোনো ছোট ফোর্ড চালিয়ে ফাদার মানকুসো লিণ্ডেনহার্স্ট প্যারিশে যথা সময়েই পৌঁছে গেলেন। পাদ্রি জীবনের গোড়ার দিকের তিন বন্ধু আগেই এসেছিলেন, তাঁকে ঢুকতে দেখে তাঁরা ছুটে এসে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। প্যারিশের কুকের রান্নার হাত ভালই বলতে হবে; লাঞ্চটা দারুণ জমল। খাওয়াদাওয়া শেষ হতে বাকি তিনজন খানিকক্ষণ গল্পগুজব করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ফাদার মানকুসো বললেন তাঁর হাতে আজ আর সময় নেই, এবার তাঁকে অ্যামিটিভিলে যেতেই হবে।

"অ্যামিটিভিলে ত বুঝলাম, ফ্রাংক," ফাদার মরিস বললেন, "কিন্তু তুমি যাচ্ছ কোথায়, কাদের বাড়ি?"

"ওশিয়ান অ্যাভিনিউ-র ১১২ নম্বর বাড়ি,' ফাদার মানকুসো তাঁর ক্যাসক বা আলখাল্লা গায়ে চাপাতে চাপাতে বললেন, "আমার বহুদিনের পরিচিত, এক দম্পতি বাড়িটা হালে কিনেছে।"

"বুঝেছি, বুঝেছি, ফ্রাংক, কোন বাড়ির কথা বলছ বুঝেছি, ফাদার মরিস বলে উঠলেন।

"ওতো ডেফোদের বাড়ি, কেসটা মনে আছে ত' ফ্রাংক?"

"যারা ও বাড়ি কিনেছে তাদের পদবি লুত্জ, ফাদার মরিস," শান্তগলায় বললেন ফাদার মানকুসো, "জর্জ আর ক্যাথরিণ লুত্জ, আর তাদের তিনি ছেলেমেয়ে, ওরা আমার বহুদিনের চেনা।"

"ওদের কথা নয়, ফ্রাংক," ফাদার মরিস বললেন, "ঐ বাড়ির মালিক আগে ছিল ডেফো পরিবার। গতবছর ঐ পরিবারের ছোট ছেলে রোনাল্ড গুলি চালিয়ে তার বাবা-মা আর ভাইবোনদের সবাইকে খুন করেছিল। যে এক বীভৎস নারকীয় ঘটনা। সব কাগজেই ত এখবর ফলাও করে ছেপেছিল, পড়ো নি?"

"কই না ত," কয়েক সেকেণ্ড মনে করার চেষ্টা করলেন ফাদার মানকুসো। খবরের কাগজ তিনি দেখেন নিয়মিত, কিন্তু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খবর ছাড়া খুনখারাপি বা কেচ্ছা কেলেংকারির এসব ঘটনা তিনি সযত্নে এড়িয়ে যান। "না, ফাদার মরিস," হতাশ গলার বললেন তিনি, "এমন কোনও ঘটনা কাগজে পড়েছি বলে মনে পড়ছে না।"

"সে যাকগে, কিন্তু এখন ওখানে যাবার কি এমন দরকার পড়ল?"

"লুত্জরা আজই ওদের নতুন কেনা বাড়িতে এসেছে," মানকুসো বললেন, "আমাকে দিয়ে একটু স্বস্ত্যয়ন করাতে চায় আর কি।"

"স্বস্ত্যয়ন করতে যাবে তুমি তাও ঐ বাড়িতে? মাত্র বছরখানেক আগে এমন একটা ঘটনা যেখানে ঘটেছে সেটা যে শয়তানের রাজত্ব তা কি এখনও বুঝতে পারছনা? এসব কাজ করতে গেলে তার ফল কি হয় জানো?"

"কি হয়, ফাদার মরিস?"

"শয়তানের যত অপশক্তি ওখানে বাসা বেঁধেছে তারা হামলে পড়বে তোমার ওপর, ফাঁক পেলেই নানারকম বিঘ্ন ঘটাবে। তাই বলছি, কাজ নেই ওখানে গিয়ে।'

"আমাদেরও তাই ইচ্ছে," বাকি দু'জন পাদ্রি ফাদার মরিসের বক্তব্যকে সায় দিলেন, "সাধ করে এসব ভূতপ্রেতের ঝামেলার পা বাড়ানোর দরকার কি বাপু? তার চেয়ে—"

"মাপ করবেন," আলখাল্লার দড়ির ফাঁস কোমরে এঁটে বললেন ফাদার মানকুসো, "কথা যখন দিয়েছি তখন যেতে আমায় হবেই, আমি চললুম, ভাইয়েরা, আজকের দিনটুকু স্মরণীয় হয়ে থাক এই কামানা করি...." বলতে বলতে বেরিয়ে গিয়ে গাড়িতে চাপলেন ফাদার মানকুসো। স্টার্ট দেবার খানিক পরে এক অদ্ভুত মানসিক অস্বস্তি তিনি অনুভব করতে লাগলেন—তিনি যাচ্ছেন লুত্জ পরিবারের লোকেদের কেনা নতুন বাড়িতে, কিন্তু কে যেন বারবার তাঁকে মনে করিয়ে দিতে লাগল লুত্জ নয়, ওটা আসলে ডেফোদের বাড়ি। অনেক চেষ্টা করেও এই অস্বস্তি মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলেন না তিনি।

ওশিয়ান অ্যাভিনিউতে পৌঁছে ১১২ নম্বর বাড়ি খুঁজে বের করতে অসুবিধে হল না। বেলা দেড়টায় গাড়িতে বসেই ফাদার মানকুসো দেখলেন বাড়ির পেল্লায় ফটকের এপারে মালপত্র বোঝাই বিশাল ট্রেলারের পেছনে দাঁড়িয়ে জর্জ আর তার বৌ ক্যাথি তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে দাঁড়িয়ে। এরা যে তাঁরই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে তাতে সন্দেহ নেই।

জর্জ আর ক্যাথিকে হাত নাড়তে দেখেই মানকুসো বুঝলেন তাঁর চিবুকের ছুঁচোলো দাড়ি তাদের ঠিক চোখে পড়েছে। ফটকের একপাশে গাড়ি রেখে তিনি নেমে এলেন। জর্জ ফটক খুলে দিতেই জর্ডাণ নদীর জলের শিশি নিয়ে বাড়ির আঙ্গিনায় পা দিলেন তিনি। সামনের বড় ঘরের দোরগোড়ার জলের ছিটে দিয়ে স্বস্তিবচন আওড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে পুরুষালি গলায় কে যেন হেঁকে উঠল, "দূর হ আপদ!"

"কে বলল কথাটা!" চমকে উঠে আশেপাশে পেছনদিকে তাকালেন ফাদার মানকুসো, কিন্তু ধারেকাছে কাউকে দেখতে পেলেন না। লুত্জ পরিবারের সদস্যরা এখনও ফটকের বাইরে, তিনি স্বস্ত্যয়ন সেরে বেরিয়ে এলে তারা ঢুকবে ভেতরে। এই মুহূর্তে ঘরের ভেতর তিনি পুরোপুরি একা। ব্যাপারটা তাঁর কাছে খুবই তুচ্ছ আর অকিঞ্চিৎকর মনে হল তাই করণীয় কাজকর্ম সেরে বিদায় নেবার মুহূর্তে জর্জ বা তার বৌকে ব্যাপারটা জানালেন না তিনি। তারা স্বামী স্ত্রী দু'জনেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাল, বিকেল পর্যন্ত তাদের সঙ্গে কাটিয়ে হালকা কিছু জলখাবার খেতে অনুরোধ করল। কিন্তু ফাদার মানকুসো জানালেন তাঁর হাতে আর সময় নেই, এবার তাঁকে যেতে হবে বহুদূরে নাসাউ-এ তাঁর গর্ভধারিণীর কাছে যেতে যেতেই বেলা গড়িয়ে যাবে। একসঙ্গে ডিনার খাবেন বলে মাকে আগে থেকে কথা দিয়েছেন তিনি। তাঁকে কোনমতেই ধরে রাখা যাবে না জেনে জর্জ বা ক্যাথি কেউই আর অনুরোধ করল না। ছেলে মেয়েদের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে সবার কাছে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠলেন ফাদার মানকুসো। কি ভেবে জর্জ এগিয়ে এসে দাঁড়াল গাড়ির কাছে, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বিনীতভাবে বলল, "ফাদার, আজকের এই শুভদিনে আমার পরিবারের পক্ষ থেকে অল্প কিছু টাকা আর এক বোতল ক্যানাডিয়ান ক্লাব হুইস্কি আমি আপনাকে উপাহার দিতে চাই।"

"তুমি আর ক্যাথি দু'জনেই আমার বন্ধু তুল্য, জর্জ," গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে ফাদার মানকুসো জবাব দিলেন," পাদ্রি হিসেবে বন্ধুদের কাছ থেকে এসব আমি গ্রহণ করতে পারি না।" গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নিমেষে উধাও হলেন তিনি।

ছেলের জন্য উৎকণ্ঠিত মনে বসেছিলেন পাদ্রির গর্ভধারিণী। ছোট ফোর্ড গাড়িখানা বাড়ির সামনে যখন ব্রেক কষল তখন চারটে বেজে গেছে।

"ফ্রাংক, তোমার কি শরীর খারাপ?' উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইলেন মিসেস মানকুসো।

"এতদূর একটানা গাড়ি চালিয়ে এসে একটু ক্লান্ত লাগছে," পাদ্রি জবাব দিলেন। "কিন্তু শরীর ত ঠিকই আছে।"

"ঠিক আছে না কচু!" মিসেস মানকুসো আক্ষেপের গলার বললেন। "বাথরুমে যাও, ওখানে আয়নায় নিজের মুখটা একবার দ্যাখো তাহলেই বুঝবে!"

বাথরুমে ঢুকে আয়নায় মুখ দেখলেন পাদ্রি আর এখনই লক্ষ করলেন দু'চোখের চারপাশে গোল কালসিটে পড়েছে। তেলকালি লেগে থাকবে ভেবে সাবান জল দিয়ে চোখের চারপাশ ভাল করে ঘষে ধুলেন তিনি, কিন্তু সেই কালসিটে দাগ তাতে উঠল না।

মার সঙ্গে বিকেলের চা খেতে খেতে খানিকক্ষণ হালকা কথাবার্তা বললেন ফাদার মানকুসো, টিভি-র খবরও শুনলেন। ডিনার খেয়ে মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি যখন আবার গাড়িতে চাপলেন তার কিছুক্ষণ আগে রাত আটটা বেজে গেছে। অন্ধকার পথ ধরে তিনি

ফিরে চললেন রেক্টরির দিকে। দেহ মন দু'দিক থেকেই শক্তসমর্থ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও ফাদার মানকুসোর শরীর আজ আর বইছেনা, মানসিকভাবেও তিনি আজ বড্ড ক্লান্ত। রেক্টরিতে ফিরে বিছানায় গা এলিয়ে দিতে পারলে আজকের মত রেহাই পান তিনি।

শর্টকাট হতে ভেবে ভ্যান ওয়াইক এক্সপ্রেস ওয়ে ধরে এগোচ্ছেন ফাদার মানকুসো। এদিকটা কিছু ফাঁকা, গাড়িঘোড়া বিশেষ চলে না। ধারে কাছে লোকজন দোকানপাট কিছুই চোখে পড়ছে না। গাড়িও চলছে খুব কম। তারই মধ্যে সার্চলাইটের তীব্র আলোয় রাতের আঁধার ছিঁড়ে ফালাফালা করে পাশ কাটিয়ে ছুটে যাচ্ছে পুলিশের হাইওয়ে প্যাট্রলের একেকটা জিপ।

আকাশের কোথাও একছিটে মেঘ নেই। প্রকৃতিও শান্ত, তবু কে জানে কোথা থেকে আচমকা ঝোড়ো বাতাস ক্ষ্যাপা দানবের মত এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের দাপাদাপিতে প্রচণ্ড ধুলোর ঝড়ে সামনের কিছুই চোখে পড়ছে না। এরই মধ্যে আচমকা গাড়ির হুডের সামনের দিকটা বাতাসের দাপটে ছিঁড়ে আছড়ে পড়ল কাঁচের উইণ্ডস্ক্রিনে। সঙ্গে সঙ্গে কব্জা ভেঙ্গে ডানদিকের বন্ধ দরজা খুলে ঝুলতে লাগল। এখন বিপজ্জনক অবস্থায় ঝুঁকি নিয়ে গাড়ি চালানো সম্ভব নয় তাই ফাদার মানকুসো রাস্তার মাঝকানে ব্রেক কষে গাড়ি নামালেন।

বুকের ভেতর প্রচণ্ড জোরে কেউ হাতুড়ি পিটছে, কলহের ধুকপুকুনি ছাপিয়ে ওঠা সেই শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন ফাদার মানকুসো। ধরে ধরে কোন মতে গাড়ি থেকে নেমে এলেন তিনি। রাস্তার একপাশে বুথে ঢুকে পরিচিত এক পাদ্রিকে টেলিফোন করে নিজের অসহায় অবস্থা জানালেন, দশ মিনিটের মধ্যে সেই পাদ্রি গাড়ি নিয়ে পৌঁছে গেলেন। তাঁর গাড়িতে চেপে কাছেই এক গাড়ি সারানোর কারখানার এলেন মানকুসো, একজন মিস্ত্রি সঙ্গে নিয়ে দু'জনে ফিরে এলেন ভাঙ্গা গাড়ির কাছে. কিন্তু মিস্ত্রি বহু চেষ্টা করেও পুরোনো ফোর্ড চালু করতে পারল না। রাত ক্রমেই বাড়ছে. "ফ্রাংক, আমার কথা শোন," চেনা পাদ্রিটি এক সময় বললেন, "গাড়ি সারিয়ে ওরা যখন হোক পৌঁছে দেবে, কিন্তু এখানে আর দেরি কর না। চলো তোমায় রেক্টরিতে পৌঁছে দিয়ে আসি," অন্যদিন হলে ফাদার মানকুসো কি বলতেন কেউ বলতে পারে না কিন্তু এই মুহূর্তে এই অনুরোধ তিনি ফেলতে পারলেন না। মিস্ত্রিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে পরিচিত পাদ্রিটির গাড়ির সামনের সিটে তাঁর পাশে বসলেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে স্যাক্রেড হার্ট রেক্টরিতে এসে পৌঁছে গেলেন তিনি।

ঘন্টাখানেক বাদে ফাদার মানকুসোর শোবার ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলতেই সেই পরিচিত পাদ্রির গলা তাঁর কানে ভেসে এল যিনি খানিক আগে নিজে গাড়িতে তাঁকে পৌঁছে দিয়ে গেছেন।

"হেলো, ফ্রাংক," উল্টোদিকে থেকে সেই পাদ্রির গলা ভেসে এল, "তোমায় পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে এখন এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে যার কোনও মানে খুঁজে পাচ্ছি না।"

এইটুকু শুনেই ফাদার মানকুসোর মুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কি ঘটেছে প্রশ্ন করার মত সাহসটুকুও হারিয়ে ফেললেন তিনি। "ফ্রাংক, তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো?" পাদ্রির গলা উল্টোদিক থেকে ভেসে এল, "যেখানে তোমার গাড়ি অচল হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার কাছাকাছি আসতেই আচমকা আমার উইণ্ডস্ক্রিণের নিচে ওয়াইপার দুটো চালু হয়ে গেল আপনা থেকে

আকাশ শুকনো, বৃষ্টির নামগন্ধ নেই, শুধুশুধু ওয়াইপার চালু করে আমি ব্যাটারি খরচ করব কেন? বিশ্বাস করো। পাগলের মত ওয়াইপার দুটো উইণ্ডস্ক্রিণের কাঁচ ঘষতে লাগল। ব্যাপার কি কিছুই বুঝতে পারলাম না। রেক্টরিতে গাড়ি ঢোকানোর পরে আপনিই ওদুটো শান্ত হয়ে আগের মত আবার অচল হয়ে এলিয়ে পড়ল। এসবের মানে কি বলতে পারো, ফ্রাংক?"

নতুন বাড়িতে প্রথম রাত। ক্যাথি আর তার তিন ছেলেমেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ কিন্তু ঘুম নেই জর্জের চোখে। দুশ্চিন্তায় দু'চোখের পাতা এক করতে পারছেনা সে। অনেকক্ষণ আগে বিছানায় উঠে বসেছে জর্জ। হাতঘড়ির দিকে তাকাতে দেখল সোয়া তিনটে। আচমকা তার মনে হল শোবার ঘরের ভেজানো দরজার বাইরে থেকে কে যেন টোকা দিল।

"কে, বাইরে কে?" চেঁচিয়ে উঠল জর্জ। সঙ্গে সঙ্গে আবার টোকার আওয়াজ। কিন্তু এবার সে আওয়াজ আগের চেয়ে অনেক ঢিমে ঠেকল, সেইসঙ্গে জর্জের মনে হল শোবার ঘরের দরজার বাইরে না, আওয়াজটা ভেসে এল নিচে সিঁড়ির নিচ থেকে। চুপ করে বসে থাকতে পারল না জর্জ, খাট থেকে নেমে পড়ল মেঝেতে, জুতো বা চটি না পরে খালি পায়ে ঠাণ্ডা মেঝের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচে। পরণে শুধু পাজামায় ঠাণ্ডায় কাঁপছে জর্জ। আচমকা ওপরে দোতলার মেঝেতে থপ করে কিছু পড়ার শব্দ হল সেই সঙ্গে কানে এল মৃদু গোঙানি। গোড়ায় আঁতকে উঠলেও জর্জ বুঝল ভয়ের কিছু নয়, দুই ভাই ড্যানি আর ক্রিস বালিশের পাশে নানারকম খেলনা নিয়ে শোয়, ঘুমের ঘোরে হাত বা পায়ের ধাক্কায় নিশ্চয়ই কোনও খেলনা মেঝেতে পড়ে গেছে তাই ঐ গোঙানির আওয়াজ হয়েছে।

আরে! বাইরে ওটা কি? সামান্য নিশ্চিন্ততায় মুহূর্তে জানালার কাঁচের দিকে চোখ পড়তে চমকে উঠল জর্জ, বাইরে খানিক তাকাতে নদীর ধারে যে ঘরটায় নৌকো থাকে তার গা ঘেঁষে কিছু একটা যেন নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। কাঁচের শার্সি ঠেলে ওপরে তোলার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত হিম করা এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস তার নাকে মুখে ঝাপটা মেরে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

"অ্যাই! কে ওখানে?" প্রবল উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল জর্জ। সঙ্গে সঙ্গে পোষা কুকুর হ্যারি গর্জে উঠল। বাইরের আঁধার ততক্ষণে চোখে সয়ে এসেছে, সেই আঁধারের মধ্যে জর্জ দেখতে পেল হ্যারি শেকলে বাঁধা, হ্যারি লাফাচ্ছে। খানিক আগের সেই ছায়াটা হ্যারির খুব কাছে এসে পড়েছে।

"ব্যাটাকে ধর হ্যারি! টুঁটি কামড়ে ধর! হুশিয়ার!" চেঁচিয়ে হুকুম দিয়ে মাথা ভেতরে এনে শার্সি নামিয়ে দিল জর্জ। দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ওপরে। ক্যাথির ঘুম ততক্ষণে ভেঙ্গে গেছে, হাত বাড়িয়ে খাটের পাশের টেবলে রাখা ল্যাম্প জ্বেলেছে। সেই আলোয় জর্জের দু'চোখে ভীতির ছাপ তার নজর এড়াল না।

"কি হল, জর্জ?"

"তেমন কিছু নয়, সোনা," এগিয়ে এসে বৌয়ের গায়ে মাথায় হাত বোলাল জর্জ, চারপাশে সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখতে নিচে নেমেছিলাম, জানালা দিয়ে তাকাতে মনে হল হ্যারি বোধহয় বেড়াল নয়ত ঐ রকম কিছু একটাকে তাড়া করেছে। তুমি ঘুমোও, সোনা। আমি একবার চট করে বাইরে থেকে দেখে আসছি।" বলে নৌসেনার পুরোনো গরম জ্যাকেট আর ট্রাউজার্স পরে আবার নিচে নেমে এলে জর্জ। হ্যারি তখনও আগের মতই চেঁচাচ্ছে গলা

ফাটিয়ে। কাছাকাছি পৌঁছোতে রহস্য সমাধান হল। জর্জ দেখল ছায়া নয়। বোট হাউসের দরজার পাল্লাটা কবজা ভেঙ্গে বাতাসের ঝাপটায় টালমাটাল দুলছে, দুর থেকে দেখে মনে হচ্ছে ছায়া। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক কষ্টে হ্যারিকে শান্ত করে বাড়ি ফিরে এল জর্জ। জ্যাকেট ট্রাউজার্স ছেড়ে শুয়ে পড়ল। নৌসেনার চাকরি থেকে অল্প কিছুদিন হল অবসর নিয়েছে জর্জ, ঘুমের মধ্যেও বিপদাশংকার আঁচ করে এক ঝটকায় উঠে পড়ার অভ্যেসটা তার তাই এখনও বজায় রাখতে পেরেছে।

কিন্তু বালিশে মাথা রেখে শোয়াই সার, ঘুম আসার নামটি নেই। জেগে থাকলে দুশ্চিন্তারা দলে দলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নৌসেনার চাকরি থেকে অবসর নিয়ে তিন পুরুষের কারবারের হাল ধরেছে জর্জ, এরই মধ্যে বিধবা যুবতী ক্যাথিকে তার তিন ছেলেমেয়ে সমেত বিয়ে করেছে। বিয়ে করার পরেই এই সম্পত্তি কেনা! প্রচুর বিষয় সম্পত্তি বাঁধা রেখে এটা কিনেছে জর্জ, এখানকার সরকারি ট্যাক্স বেশী, আগে যেখানে তারা থাকত সেই ডিয়ার পার্ক এলাকাব চেয়ে বেশি জেনেও কিনেছে। অ্যামিটিভিলের এই বাড়ি একবার দেখেই লোভে পড়ে গেছে জর্জ, যেন কোন কিছুতে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে তাকে অ্যামিটিভিলের এই বাড়িতে। কারবারের হালও এই মুহূর্তে তেমন ভাল বলা চলে না। লোকে ঘরবাড়ি বিষয়সম্পত্তি তেমন কেনাবেচা যদি নাই করে, তাহলে তার মত ছাতার ল্যাণ্ড সার্ভেয়রই বা কার কাজে লাগবে? একটা দুটো না, তিন তিনটে বাচ্চা, এদের খাইয়ে পড়িয়ে সুস্থ রেখে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার দায়িত্ব এখন পুরোপুরি তার কাঁধে বর্তেছে। যেহেতু এরা এখন আর শুধু ক্যাথির বাচ্চা নয়, তাকেও এরা "বাবা" বলে ডাকতে শুরু করেছে। সারারাত দু'চোখের পাতা একটিবারের জন্যও এক করতে পারল না জর্জ, ঘুম যখন এল তখন ভোর ছ'টা, তার খানিকক্ষণ পরেই জেগে উঠল ক্যাথি। চোখ মেলতেই দেখল জর্জ শুয়ে আছে তার পাশে, বালিশে মাথা রেখে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। ছেলেমেয়েরা তাদের ঘরে শুয়ে, এখনও হয়ত তাদের চোখ থেকে ঘুমের রেশ কাটেনি। দাড়ি গোঁফ ভর্তি জর্জের মুখখানা দেখে ক্যাথির মমতা হল। আহা, বেচারা! একটা সুখের মুখ দেখবে বলে কত কষ্টই না করছে। আগের বাড়ির সব জিনিসপত্র গতকাল একা ট্রাকে বয়ে এনেছে, এখনও কত কাজ বাকি। জর্জকে ইচ্ছে করেই ডাকল না ক্যাথি। রান্নাঘরে তার অনেক কাজ জমে আছে, ছেলেমেয়েরা ওঠার আগে সেগুলো সেরে ফেলতে হবে।

জর্জের ঘুম ভাঙ্গল সকাল ন'টায়, দাড়ি কামালো না। স্নানও করল না। সারাদিন অসুরের মত খাটাখাটুনি করে রাতের বেলা যখন শুতে গেল তখন কাঁটায় কাঁটায় বারোটা। নতুন বাড়িতে আসার পর অদ্ভুত এক ঠাণ্ডা পেয়ে বসেছে জর্জকে, সবসময় কুঁকড়ে আছে সে, ফায়ার প্লেসের আগুনে গাদাগাদা গাছের গুঁড়ি গোঁজার পরেও তার গা গরম হচ্ছে না। অথচ বাড়ির ভেতরটা যা যথেষ্ট গরম হয়ে উঠছে তা লক্ষ করছে ক্যাথি। জর্জের এত কাঁপুনি হচ্ছে কেন বুঝে উঠতে পারছে না সে।

রাত ঠিক সোয়া তিনটে নাগাদ জর্জের ঘুম গেল ভেঙ্গে। গতকালের মতই তবুও তার মনে হল দরজার পাল্লার বাইরে থেকে কেউ যেন টোকা দিচ্ছে আলতো হাতে। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে গিয়ে জর্জের মনে পড়ে গেল গতকাল রাতেও ঠিক এমনি সময়েই ঘুম ভেঙ্গে নিচে নেমে এসেছিল সে। নিচে জানালার সামনে দাঁড়াতে কালকের ছায়াটা আজও দেখতে পেল

জর্জ। কিন্তু একি করে হল? চমকে উঠে নিজেকে প্রশ্ন করল জর্জ। কাল রাতে যা ছায়া বলে মনে হয়েছিল, বোটহাউসের সেই দরজার ভাঙ্গা কব্‌জা ত আজই বেলার দিকে মেরামত করেছে সে নিজে হাতে, তাহলে দরজার পাল্লাটা কাল রাতের মত আবার খুলে গেল কি করে। উত্তেজিত হয়ে ছুটে গেল জর্জ, কাছে গিয়ে দেখল কব্‌জা ঠিকই আছে তবু কিভাবে যেন দরজার পাল্লাটা খুলে গিয়ে ঝুলছে আর দূর থেকে তা দেখাচ্ছে ছায়ার মত। আশ্চর্য। আজ আর হ্যারির ঘুম একবারও ভাঙ্গেনি। বোটহাউসের বাইরে শেকলবাঁধা অবস্থায় মরার মত ঘুমোচ্ছে হ্যারি। দরজার পাল্লা এঁটে আবার বাড়িতে ফিরে এল জর্জ।

পরদিন অর্থাৎ নতুন বাড়িতে তৃতীয় রাতেও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। নতুন কব্‌জা রোজ রাতে কি করে ভেঙ্গে যায়। তার উত্তর খুঁজে পায়না জর্জ। কোন অদৃশ্য শত্রু লেগেছ তার পেছনে? কেন সে কেড়ে নিতে চাইছে তার রাতের ঘুম, মনের শান্তি?

ক্যাথির দুই ছেলে ক্রিস আর ড্যানি দু'জনেই আগে ছিল শান্ত স্বভাবের। কিন্তু নতুন বাড়িতে আসার পর থেকে দু'জনেই কেমন যেন অস্থির অশান্ত হয়ে উঠছে। যখন তখন তুচ্ছ কারণে নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি বাধিয়ে গোটা বাড়ি মাথায় করে তুলছে তারা। জর্জ চাপা স্বভাবের মানুষ, কিন্তু একবার রেগে গেলে ওর মাথায় খুন চেপে যায় এই ভয় দেখিয়ে ক্যাথি ক'দিন তাদের শান্ত রাখার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তার হুঁশিয়ারিতে আমল না দিয়ে দু'ভাই যথারীতি শুরু করেছে তাণ্ডব। চারদিনের দিন জর্জের মাথায় সত্যিই আগুন জ্বলে উঠল, দোতলায় চেঁচামেচি শুরু হতেই সে চামড়ার বেল্ট নিয়ে ছুটে এল। ক্যাথি ছিল রান্নাঘরে। হাতের কাছে পড়েছিল একটা বড় কাঠের হাতা, তাই নিয়ে সেও ছুটে এল স্বামীর সঙ্গে।

চেচাঁমেচি শুরু হয়েছিল দোতলায় ছেলেদের খেলার ঘরে। জর্জ আর ক্যাথি ভেতরে ঢুকতেই দেখল একাট জানালার কাঁচ ভেঙ্গে চৌচির, অজস্র কাঁচের টুকরো ছড়িয়ে আছে মেঝেতে। বাবা-মা দু'জনেই সশস্ত্র দেখে ঘাবড়ে গেছে ক্রিস আর ড্যানি ফ্যালফ্যাল করে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

"জানালার কাঁচ ভেঙ্গেছে কে?" গলা চড়িয়ে জানতে চাইল জর্জ, "ভাল চাও ত বুক ফুলিয়ে দোষ স্বীকার করো নয়ত আমার হাত একবার উঠলে মুশকিল হবে বলে রাখছি। দু'জনের একজন বেহুঁশ না হওয়া পর্যন্ত আমি থামব না!"

জর্জের হুঁশিয়ার শুনে ঘাবড়ে গেল ক্যাথি, ছেলেদের বাঁচাতে তাদের দিকে তেড়ে এল সে, কাঠের হাতা দিয়ে ঠাঁই ঠাঁই করে কয়েক ঘা বসিয়ে দিল তাদের পিঠে। দেখে জর্জও চুপ করে থাকতে পারল না, চামড়ার বেল্ট দিয়ে পিটিয়ে দু'টোর গায়ে দাগ্ ফেলে দিল, তারপর রেগেমেগে বেল্ট ছুঁড়ে ফেলে ক্যাথির হাত ধরে টানতে টানতে চলে এল ঘরের বাইরে।

"আমার সঙ্গে ওদের কথা বলতে মানা করে দাও!" ছেলেদের শুনিয়ে বৌকে গলা চড়িয়ে বলল জর্জ, "ভদ্র সভ্য হতে পারলে তবেই যেন আমায় বাবা বলে ডাকে একথা বুঝিয়ে দাও ওদের!"

ক্যাথির তখন জবাব দেবার ক্ষমতা নেই। প্রচণ্ড রাগ আর উত্তেজনার ঝড় বয়ে যাবার পরে নিজেকে তার বিদ্ধস্ত লাগছে। স্বামীর সঙ্গে সে ওপরে উঠে এল।

বড়দিন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডার প্রকোপ বাড়ছে অ্যামিটিভিলে। অ্যটলান্টিকের ডানদিকে লং আইল্যাণ্ডের বুকে এই শহরের ওপর দিয়ে সমুদ্রের হাওয়া অশান্ত কালবৈশাখীর দাপটে বয়ে যাচ্ছে, ব্যারোমিটারের তাপমাত্রা এসে ঠেকেছে আট ডিগ্রিতে ; আবহাওয়া বিশারদেরা আগেভাগেই বলতে শুরু করেছেন এবারে বড়দিনে চারপাশ ঢাকা পড়বে সাদা তুষারে, উৎসবের দিনে বাড়ি থেকে বেরোনোর অবস্থা আর থাকবেনা।

প্রথম স্বামী মারা যাবার পরে ছেলেদের গায়ে গতকাল প্রথম হাত তুলছে ক্যাথি, একথা ভেবে নিজেকে তার খুব অপরাধী মনে হচ্ছে। ছেলেদুটোও হয়েছে তেমনই হতভাগা। পড়ে পড়ে মুখ বুঁজে জর্জের চামড়ার বেল্ট আর তার কাঠের হাতার ঘা সমানে খেয়ে গেল কিন্তু টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করল না।

সকালবেলা রান্নাঘরে আগুনের ধারে বসে আনমনে এসব কথাই ভাবছে ক্যাথি এমন সময় সে স্পষ্ট অনুভব করল পেছন থেকে কে যেন দু'হাতে জড়িয়ে ধরল তাকে। চমকে পেছন ফিরে তাকাল ক্যাথি কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। নরম একজোড়া অদৃশ্য হাত তখনও তার মাথায়, গালে, গলায় বুকে খেলে বেড়াচ্ছে আদর করার মত। যেভাবে তাঁর মেয়ের গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করেন ঠিক তেমনই।

"মা! শীগগির একবার এসে দেখে যাও কি কাণ্ড!" ছোট ছেলে ক্রিসের গলা তেতলার দিক থেকে এল বলেই মনে হল। আশ্চর্য ব্যাপার, ছেলের গলা কানে শোনার সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হাতজোড়া যেন মিলিয়ে গেল, আর তাদের ছোঁয়া টের পেল না ক্যাথি। হাতের কাজ সরিয়ে রেখে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল সে, তেতলায় পৌঁছে দেখে ছেলেমেয়ে তিনজনে বাথরুমের দোরগোড়ার দাঁড়িয়ে। ক্যাথি কিছু বলার আগে ক্রিস এগিয়ে এসে হাত ধরে টানতে টানতে তাকে নিয়ে এল বাথরুমের ভেতরে। সামনে টয়লেট, সেদিকে চোখ পড়তে ক্যাথি নিজেই চমক উঠল তাকে কিছু বলার দরকার হল না।

টয়লেটের কমোডের ধপধপে সাদা প্যানের ভেতরের গা-টা কোনও অজানা কারণে কুচকুচে কালো হয়ে আছে; দেখে মনে হচ্ছে কেউ যেন একপাত্র আলকাতরা ভেতরে ঢেলেছে দরাজ হাতে।

"কি করে হল?" নিজের অজান্তেই গর্জে উঠল, "কাল রাতে শোবার আগে আমি নিজে হাতে কেমিক্যাল মেখে প্যান সাফ করে গেলুম, তখনও প্যান ছিল ধপধপে সাদা তাহলে এক রাতের মধ্যে রং পাল্টে এটা কালো হল কি করে? নিশ্চয়ই কালো রং ঢেলেছিস তোদের তিনজনের একজন। কার কাজ ভাল চাস ত বল্, নয়ত কালকের মারের কথা মনে আছে ত? তোদের বাবার কানে গেলে কিন্তু আজ আর রক্ষে নেই, তিনজনকে একই সঙ্গে পিষে ফেলবে! এখনও সময় আছে, বল কে প্যানে রং ঢেলেছে?" চোখ পাকিয়ে ছেলেমেয়ের মুখের দিকে বারবার তাকাতে লাগল ক্যাথি, রাগ আর উত্তেজনার তার বুক হাপরের মত ওঠানাম করছে।

"আমরা নোংরা করিনি মা," অসহায় আর্তনাদের মত শোনাল ক্রিসের গলা, "বিশ্বাস করো আমরা এসবের কিছুই জানি না!" ক্রিসের কথা আর হাবভাব দেখে নিশ্চিত হল সে সতি কথাই বলছে।

'আমি জানি ক্রিস এ-কাজ তুমি করোনি,' মা বলে উঠল, "ক্যাথি, যাওত, দৌড়ে আমার বাথরুম থেকে প্যান সাফাইয়ের কেমিক্যালটা নিয়ে এসো। কি যেন নাম ওটার? ও হ্যাঁ, ক্লোরক্স। যাও ওটা নিয়ে এসো। আর মনে করে প্যান সাফ করার ব্রাশটাও এনো। ওটা আমার বাথরুমেই আছে।" ক্রিস দৌড়ে গেল সিঁড়ির দিকে ছ'মিনিট বাদেই আর্ত চিৎকারের মত তার গলা ভেসে এল ওপর থেকে।

"মা! ওমা! ওপরে এসো জলদি!"

"আবার কি হল!" বিরক্তিভরা গলায় আক্ষেপ করল ক্যাথি, "একটা কাজও যদি হয় এ দুটোকে দিয়ে।" ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির কাছাকাছি দাঁড়িয়ে মুখ উঁচু করে চেঁচিয়ে বলল ক্যাথি, "কি হল ক্রিস? চোখ মেলে দ্যাখ, সিংকের নিচেই ওদুটো রেখেছি।"

"তা বলছি না মা!" ওপর থেকে ক্রিসের গলা আবার ভেসে এল, "ও-দুটো পেয়ে গেছি। কিন্তু তোমার টয়লেটের প্যানও কালো হয়ে আছে?'

"আমার টয়লেটেও?" বলার মত কিছু খুঁজে পেল না ক্যাথি, সিঁড়ি বেয়ে ওপরে নিজের বাথরুমে ঢুকে দেখল ক্রিস মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে বাথরুমের বাইরে, ভেতরে টয়লেটের প্যান কুচকুচে কালো হয়ে আছে, মনে হয় কেউ যেন এক বোতল কালো কালি সেখানে পুরোটাই ঢেলে দিয়েছে. সেই সঙ্গে এক অদ্ভুত দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে গোটা টয়লেটে, বাড়ির কোথাও ইঁদুর মরে পচে উঠলে যেমন দুর্গন্ধ বেরোয় ঠিক তেমনই।

"জর্জ! জর্জ!" অসহায়ের মত চেঁচিয়ে উঠল ক্যাথি, "তুমি কোথায়? একবার আমাদের বাথরুমে এসো!"

"আঃ! এবার তুমিও হল্লা শুরু করে দিলে!" জোর গলায় জর্জ চেঁচিয়ে উঠল, "আমায় কি তোমরা একটু স্বস্তিতে থাকতে দেবে না?'

ক্যাথির আর সহ্য হল না। তীরের মত ছুটে সে ঢুকে পড়ল লিভিং রুমে, দেখল ফায়ারপ্লেসেব গনগনে আগুনের পাশে জবুথবু হয়ে বসে জর্জ গা গরম করছে।

"কি হয়েছে?" মুখ তুলে তাকাল জর্জ, "ব্যাপারটা কি?'

"শীগগিরই একবার আমাদের বাথরুমে এসো!" কাঁদো কাঁদো গলায় বলে উঠল ক্যাথি, "ইঁদুর পচা গন্ধে গোটা বাথরুম ভরে উঠেছে। আমাদের টয়লেট, নিচে ছেলেদের টয়লেটের কমোডের প্যানে কি করে যেন কালো রং লেগেছে, জল ঢেলেও সে দাগ তুলতে পারছি না!" বলে ক্যাথি এগিয়ে এল, জর্জ বাধা দেবার আগেই হাত ধরে টানতে টানতে তাকে নিয়ে এল বাইরে। জর্জকে দোতলার অন্য বাথরুমে এনে ঢোকাল ক্যাথি, দেখল এখানকারও একই হাল, কমোডের ধপধপে সাদা প্যান কোন যাদুমন্ত্র বলে কালো হয়ে গেছে। তবে এই বাথরুমে ইঁদুর পচা দুর্গন্ধ পেল না তারা। বাথরুম থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল জর্জ, "এ আবার কিসের গন্ধ?" বলে মুখ তুলে নাক কোঁচকাল সে। "আগে এই গন্ধটা এখান থেকে হটাতে হবে।" বলে নিজের আর ক্যাথির শোবার ঘরের বন্ধ জানালাগুলো একে একে খুলল জর্জ, তারপর দৌড়ে বসার ঘরের লাগোয়া বাকি শোবার ঘরগুলোতে ঢুকল। সেই মুহূর্তে ক্যাথির গলা ভেসে এল তার কানে—"জর্জ! এদিকে একটিবার এসো! দ্যাখো কি হয়েছে!"

দোতলার চার নম্বর শোবার ঘরে দুটো জানালা, সেটা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্যাথির সেলাইয়ের সরঞ্জাম রাখার ঘর। এই ঘরের দুটো জানলায় একটা দিয়ে দূরে বোট হাউস আর অ্যামিটিভিল নদী চোখে পড়ে, এ বাড়িতে আসার পর প্রথমবার রাত সোয়া তিনটেয় ঘুম ভাঙ্গার পরে এই জানালার সামনেই দাঁড়িয়েছিল জর্জ। দ্বিতীয় জানালায় দাঁড়ালে পাশের প্রতিবেশীর বাড়ি চোখে পড়ে যা এ-বাড়ির ঠিক ডাইনে। জর্জ দেখল এই দ্বিতীয় জানালার ভেতর দিকে কম করে কয়েক'শ মাছি পাল্লা আঁকড়ে গুনগুন আওয়াজ তুলছে!

"তাজ্জবের ব্যাপার!" জর্জ বলে উঠল, "বছরের এই সময় কখনও মাছির পাল উড়ে আসে?" দেখেছো ক্যাথি?'

"বাথরুমের ঐ দুর্গন্ধের টানে হয়ত ওগুলো এসেছে," বলল ক্যাথি। "তাহলেও বছরের এই সময় ওদের আসা কোন মতেই আসা সম্ভব নয়" বলল জর্জ, "মাছিরা এত বেশি দিন বাঁচে না, এই ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ত কোনমতেই নয়। তাছাড়া আমি জানতে চাই ওরা শুধু এই একটা জানালাতেই উড়ে এসে বসেছে কেন?" বলে মাছির উড়ে আসাব কারণ খুঁজে বের করতে ঘরের ভেতরে আর চারপাশে ভাল করে দেখল জর্জ, কিন্তু কিছুই খুঁজে পেল না। ঘরের এককোণে একটা দেয়াল আলমারি আছে, কি মনে হতে পা চালিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল জর্জ, দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে দেখল ভেতরে কোথাও ফাটল বা ফাঁকফোকর আছে কিনা।

"এখানে ভীষণ ঠাণ্ডা," আলমারির ভেতরের দেয়ালে হাত রাখল জর্জ, "মাছিগুলো এখানে ডেরা বেঁধেছিল একথা আমি মানতে রাজি নই।" ক্যাথি একটি কথাও না বলে মুখ বুঁজে রইল, জর্জ পুরোনো খবরের কাগজ পাকিয়ে মাছিগুলোকে মেরে যতদূর সম্ভব তাড়িয়ে দিল, বাকিগুলোকে কাগজ দিয়ে পিষে মারল। এরপর ভেতর থেকে জানালা এঁটে দিল সে। ক্যাথি লক্ষ করল বাথরুমের দুর্গন্ধটাও দূর হয়েছে, মাছিগুলোর সঙ্গে দুর্গন্ধের সত্যিই কোনও সম্বন্ধ আছে কিনা সেই মুহূর্তে ভেবে পেল না সে। নতুন বাড়ির মাটির নিচে তেল গরম করে গোটা বাড়ির ভেতরকার উত্তাপ বাড়ানোর ব্যবস্থা আছে, যন্ত্রটা বেশ ভালই কাজ করছে। বিকেল চারটে নাগাদ থার্মোস্ট্যাটে দেখা গেল ভেতরের তাপমাত্রা আশি ডিগ্রিতে এসে ঠেকেছে! কিন্তু ঠেকলে হবে কি, এখানে আসার পর থেকে কি এক অদ্ভুত ঠাণ্ডায় অষ্টপ্রহর কুঁকড়ে আছে জর্জ, গাদা গাদা গাছের গুঁড়ি ফায়ারপ্লেসের আগুনে গোঁজার পরেও তার গা গরম হচ্ছে না।

অন্যদিকে ক্যাথি বসে নেই, ক্লোরক্স, ফিনাইল, নাইট্রিক অ্যাসিড আর লিকুইড সোপ ঢেলে ব্রাস দিয়ে কমোডের প্যান ঘষছে সে। এতগুলো রাসায়নিকের বিক্রিয়ায় কাজ কিছুটা হল ঠিকই, কিন্তু কালো দাগ পুরোটা মোছা গেল না। ক্যাথির সেলাই-এর ঘরের পাশে দ্বিতীয় বাথরুমের টয়লেটের অবস্থাই সবচেয়ে শোচনীয়, মুখে বলার মত নয়।

বাইরের তাপমাত্রা কুড়ি ডিগ্রিতে এসে পৌঁছেছে ঃ ছেলেমেয়েরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে দৌড়ঝাঁপ করে খেলছে, পোষা কুকুর হ্যারিও যোগ দিয়েছে তাদের সঙ্গে, বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে ক্যাথি বারবার তাদের বোট হাউসের দিকে যেতে মানা করেছে, বলেছে কেউ নজর না রাখলে ওখানে গিয়ে খেলাধূলো করা তাদের পক্ষে বিপজ্জনক। দুর্জ্ঞেয়, যার ব্যাখ্যা নেই তার সম্পর্কে ছোট ছেলেমেয়েদের আর কিভাবেই বা হুঁশিয়ার করা সম্ভব?

গ্যারাজে গাদা গাদা কাঠ পড়ে আছে, বেছে বেছে সেখান থেকে গাছের গুঁড়িগুলো এনে ফায়ারপ্লেসের আগুনে বারবার গুজে দিচ্ছে জর্জ, তারপরেও তার গা গরম হচ্ছে না, নিজের কাজকর্ম চুলোয় দিয়ে বড়দিনের উপহার আনতে কে বোরোব এই নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে সে গলাবাজি করছে বৌ ক্যাথির সঙ্গে। "আর কারও জন্য না হক তোমার মার জন্য একটা ভাল দেখে পারফিউম কিনে আনতে ত অন্তত একবার বেরোতে পারো!" বলল জর্জ।

"তা পারি ঠিকই," সায় দিল ক্যাথি, "তবে তার চেয়ে এখানকার সবকিছু কেমন আছে ঠিক তেমনই সাজিয়ে রাখা আমার কাছে বেশি জরুরি। রান্নাঘরে ঢুকে আমার সঙ্গে প্যানপ্যান না করে নিজে একবার বেরোও না।" খেঁকিয়ে উঠল ক্যাথি। আর সঙ্গে সঙ্গে সদর দরজার কলিং বেলটা জোরে বেজে উঠল। জর্জ এগিয়ে এসে দরজা খুলতে দেখল পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছরের এক ভদ্রলোক বাইরে দাঁড়িয়ে মুখে দ্বিধা জড়ানো হাসি, হাতের থলেতে ঝুলছে ছটা বিয়ারের বোতল।

"আমি আপনাদের প্রতিবেশী," ভদ্রলোক বললেন, "পাশেই থাকি নতুন এসেছেন তাই এলাকার মানুষের সবাই দল বেঁধে আপনাদের অভ্যর্থনা জানাতে চায়, আসল ব্যাপার নিজেদের মধ্যে একটু হৈ-হুল্লোড় করা, এই আরকি! তা আপনারা এতে কিছু মনে করবে না ত?'

"মোটেও না," জর্জ দরাজ গলায় বলল, "সবে এসেছি ত, এখনও আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করে উঠতে পারিনি। এখানে অনেক কার্ডবোর্ডের বাক্স আছে, ওগুলো আমরা চেয়ার হিসেবে ব্যবহার করছি। আপনাদেরও ওতে বসতে হবে, আসুন না, সবাইকে নিয়ে চলে আসুন, আমরা মিশুকে লোক আপনাদের পেলে খুব খুশি হব।" অচেনা লোকটিকে রান্নাঘরে নিয়ে এল জর্জ, পরিচয় করিয়ে দিল ক্যাথির সঙ্গে। খানিক আগে জর্জকে যা বলেছে ক্যাথিকেও তাই বলল লোকটি। জর্জের মত একই জবাব দিল ক্যাথি। লোকটা এবার বলল বাড়ি যতদিন খালি ছিল ততদিন এবাড়ির নিজস্ব বোটহাউসে সে নিজের নৌকো রেখেছিল এখন লুত্জ পরিবার এ বাড়ি কেনার পরে প্রতিবেশীর বাড়ির বোটহাউসে নৌকো রাখছে। বলে সে আর দাঁড়াল না, একটি কথাও না বলে চলে গেল। লোকটাকে দেখে জর্জ আর ক্যাথি এত বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল যে তার নাম জিজ্ঞেস করার কথাও তাদের মনে আসেনি। ত' এরপর লোকটিকে আর কখনও দেখেনি তারা।

রোজের মতই সে-রাতেও শুতে যাবার আগে বাড়ির সব দরজা, জানালা ছিটকিনি ঠিকঠাক আছে কিনা খুঁটিয়ে দেখল জর্জ। তা সত্ত্বেও রোজের মতই ঠিক সোয়া তিনটেয় তার ঘুম গেল ভেঙ্গে। রোজের মতই সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল সে, আর তখনই অবাক হয়ে দেখল ভেতর থেকে মজবুত ছিটকিনি এঁটে দেয়া সত্ত্বেও আড়াইশো পাউণ্ড ওজনের সেকেলে মজবুত কাঠের পাল্লা খুলে একটি মাত্র কব্জার সঙ্গে আলতো হয়ে ঝুলছে, পাল্লার ওপরের কব্জাটা কে যেন মুচড়ে ভেঙ্গে উপড়ে নিয়েছে দরজার ফ্রেম থেকে। জর্জ সেই আধভাঙ্গা দরজার পাল্লাটা কোন রকমে আটকাবার চেষ্টা করতে লাগল। খানিক বাদে চোখ তুলে দেখল ক্যাথি কোন ফাঁকে নেমে এসেছে।

"ব্যাপার কি," ক্যাথি জানতে চাইল, "দরজায় পাল্লার এ হাল হল কি করে?"

"সেটা ত আমারও প্রশ্ন, ক্যাথি," জবাব দিল জর্জ, "তুমিত জানো, এ বাড়িতে আসার পরে রোজ ঠিক সোয়া তিনটের আমার ঘুম আপনিই ভেঙ্গে যাচ্ছে। আজও ভেঙ্গেছিল তখনই মনে

হল নিচে গিয়ে একবার চারদিক দেখে আসি। এসে দেখি এই কাণ্ড ; পাল্লাটা দরজায় ফ্রেম ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। কব্জা দুটোর কি হাল হয়েছে দেখেছো?'

"শুধু কব্জা কেন," ক্যাথি পাল্লার গায়ে আঁটা পেতলের হাতলটা দেখাল, "এটারও ত একই অবস্থা। জর্জ দেখল পেতলের হ্যাণ্ডেলের অর্দ্ধেক ভেঙ্গে উধাও হয়েছে, বাকি অর্দ্ধেকটুকু কোনমতে সেঁটে আছে পেতলের প্লেটে।

"এখানে এসব কি শুরু হয়েছে কিছুই ত বুঝতে পারছি না।" ক্যাথির দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল জর্জ, '' এই হাতল মুচড়ে ভাঙ্গতে হলে কি প্রচণ্ড আমানুষিক শক্তি দরকার বুঝতে পারছো?'

"ঝোড়ো বাতাসের দাপাদাপিতে হয়ত এমনটা হয়েছে," ক্যাথি বলল, "ক'দিন ধরে কি জোরালো ঝোড়ো হাওযা বইছে নিজেই ত দেখছো!" "দুঃখিত ক্যাথি," গলা সামান্য চড়াল জর্জ, "হাওয়ার জোর যতই হোক, এই দরজার পাল্লা কব্জা থেকে উপরে নেয়া, বা পাল্লার গায়ে আঁটা পেতলের হ্যাণ্ডেলের অর্দ্ধেকটা মুচড়ে ভাঙ্গার ক্ষমতা তার নেই। তোমার যুক্তি মেনে নিতে পারছি না বলে দুঃখিত।"

স্বামীর জবাবের মানে কি দাঁড়াতে পারে তা আঁচ করেই বেশ ঘাবড়ে গেল ক্যাথি, প্রচণ্ড শক্তিশালী এক না দেখা অশুভ শক্তি যে তাদের পেছনে লেগেছ, তাদের সবটুকু স্বস্তি যে সে ছিনিয়ে নিতে চায় তা ক্যাথির মগজ নিমেষে উপলব্ধি করল। গায়ের লোম যে ভয়ে খাড়া হয়ে উঠেছে দিব্যি টের পেল ক্যাথি, আর তখনই তিন ছেলেমেযের মুখ কল্পনায় দেখতে পেল সে।

"বাচ্চাগুলো ঘুমোচ্ছে কিনা দেখে আসি," বলে সিঁড়ি বেয়ে দোতলার উঠে এল ক্যাথি। সামনেই মেযের ঘর, ভেতরে ঢুকে ক্যাথি দেখল তার মেয়ে মিসির চোখ বোঁজা থাকলেও ছোঁটদুটো অল্প খোলা, ঘুমের ঘোরে বিড়বিড় করে বলছে সে। "মিসি!" মেয়ের নাম ধরে ডাকল ক্যাথি, সঙ্গে সঙ্গে মৃদু গোঙানির আওয়াজ তুলে মিসি উপুড় হয়ে শুল। উপুড় হযে শোবার ভঙ্গিটা ভারি অদ্ভুত ; এগিয়ে এসে মেয়ের মাথায় হাত বোলাল ক্যাথি। তারপব পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল বাইরে। সিঁড়ি বেয়ে কয়েকটা ধাপ উঠে ঢুকল ছেলেদের ঘরে।

ভেতরে সেই এক দৃশ্য, বোনের মতই ক্রিস আর ড্যানি দু-ভাই ও বালিশে মুখ গুজে শুয়ে আছে উপুড় হয়ে তলপেটে ভর দিয়ে। তাই দেখে আবার ক্যাথির গা শিউরে উঠল, তার মনে পড়ল বছরখানেক আগের ঘটনা—গুলির আওয়াজ শুনে পুলিশ আর স্থানীয় লোকজন ছুটে এসেছিল, দেখেছিল এ-বাড়ির প্রত্যেকটি লোক ডেফো পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্য উপুড় হয়ে বিছানার রক্তগঙ্গার মধ্যে ভাসছে। ডেফো পরিবারের লাশগুলো ক্যাথি দেখেনি কিন্তু তার তিন ছেলেমেয়ে যে ঐ লাশগুলোর মত একই ভঙ্গিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে তাতে সন্দেহ নেই।

রাতের নিকষকালো আঁধার কেটে একসময় ভোর হল ঠিকই, কিন্তু যে অদ্ভুত ঠাণ্ডার আবরণ চারপাশ থেকে অ্যামিটিভিলকে মুড়ে রেখেছিল তা কাটার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। মেঘে ঢাকা আকাশ, বেতারের স্থানীয় সংবাদে বারবারই ঘোষণা হল বড়দিনের সময় প্রচুর তুষারপাত হবে, এমনকি সেই তুষারে যদি গোটা অ্যামিটিভিল ঢাকা পড়ে যায় তাতে আশ্চর্য হবার মত কিছুই ঘটবে না।

ওশিয়ান অ্যাভিনিউর একশো বারো নম্বর বাড়িতে তাপমাত্রা আশি ডিগ্রির নিচে একচুলও নামে নি। কিন্তু সেই উত্তাপ বাড়ির মালিক আর লুত্জ পরিবারের কর্তা জর্জ টেরই পাচ্ছে না।

আগের দিনের মতই গ্যারাজ থেকে গাদা গাদা কাটা গাছের গুঁড়ি এনে লিভিং রুমে ফায়ারপ্লেসের আগুনে গুঁজে চুপচাপ আগুন পোয়াচ্ছে সে, কিন্তু তার কালিয়ে যাওয়া হাড় যে তাতেও গরম হচ্ছে না তা তার চোখমুখের হতাশ ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে। বৌ আর ছেলেমেয়েদের কেন্ন তার মত ঠাণ্ডা লাগছে না তাই ভেবে পাচ্ছে না সে।

সদর দরজার পাল্লা ভেঙ্গে উপরে এসেছে কাল রাতে, তাই ঘুম ভাঙ্গায় পরে সাতসকালে এক কাপ কফি খালি পেটে খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পরেছিল জর্জ, গিয়েছিল মিস্ত্রির বাড়িতে। মিস্ত্রি সব শুনে বলেছিল বেলা বারোটার আগে কোন মতেই আসতে পারবে না। লোকটা কথামত এল বেলা বারোটায়। ভাঙ্গা জয়গাটা খুঁটিয়ে দেখে অদ্ভুত চোখে তাকাল জর্জের দিকে কিন্তু একটি কথাও বলল না। চটপট দরজা মেরামত করে দিল লোকটা, মজুরি নিয়ে বিদেয় হবার আগে মুখ খুলল। নিজে থেকেই বলল, বছর দু'য়েক আগে এবাড়ির আগের মালিক যারা ছিল অর্থাৎ ডেফো পরিবারের কর্তা তাকে ডেকে এনেছিল। নদীর ধারে নৌকো রাখার বোট হাউসের দরজার তালাটা গোলমাল করছিল, দরজার পাল্লা একবার কোন কারণে বন্ধ হলে গা-তালা আপনিই এঁটে যাচ্ছিলো। তার ফলে বোট হাউসের ভেতরে কেউ থাকলে গা-তালা ভেঙ্গে না ফেলা পর্যন্ত তাকে ভেতরে আটক থাকতে হত। শুনে জর্জ বোট হাউস নিয়ে আরও দু'একটা কথা বলতে গেল। কিন্তু ক্যাথি চোখ পাকাচ্ছে দেখে থেমে গেল। ডেফো পরিবারের চরম বিপর্যয়ের পরে এ-বাড়িতে নতুন তরে আবার অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটছে একথা অ্যামিটিভিলে রটে যাক ক্যাথি তা চায় না।

দুপুর দুটো নাগাদ মেঘলা পরিষ্কার হয়ে উঠলে কালিয়ে যাওয়া ঠাণ্ডা দূর হয়ে আবহাওয়া কিছুটা গরম হল। সকাল থেকে ছেলে মেয়েরা ঘরে বসে আছে আকাশ পরিষ্কার হচ্ছে দেখে ওরা ভাবল বাইরে গিয়ে খেলাধূলা করবে কিন্তু ঠিক তখনই শুরু হল ঝিরঝিরে বৃষ্টি। ফলে আর তাদের বেরোনো হল না। আবার যে কে সেই ঘরবন্দী।

একে নানারকম দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা তার ওপর অদ্ভুত সব কাণ্ড কারখানা, এর মাঝখানে পড়ে জর্জের কাজকর্মের ইচ্ছেটাই যেন চুলোয় যেতে বসেছে, অয়েল বার্ণারে তাপমাত্রা দেখা আর ফায়ারপ্লেসে গাদাগাদা কাঠ গোঁজা এই হয়ে দাঁড়িয়েছে তার একমাত্র কাজ। ড্যানি আর ক্রিস তাদের খেলার ঘরে বসে খেলছে। সেখান থেকে ঠুকঠাক শব্দের সঙ্গে তাদের গলা ভেসে আসছে। শোবার ঘরে যেতে যেতে কি ভেবে মেয়ের ঘরের উঁকি মারল ক্যাথি, দেখল ভেতরে রকিং চেয়ারে বসে দুলতে দুলতে মিসি কি যেন বিড়বিড় করছে নিজের মনে, কাঁচের শার্সি আঁটা জানালা দিয়ে একদৃষ্টে বাইরে বোট হাউসের দিকে তাকিয়ে আছে সে। মেয়ের ঘরে ঢুকতে যাবে এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল শোবার ঘরে। ছুটে এসে শোবার ঘরে ঢুকল ক্যাথি। রিসিভার তুলতেই কানে এল নিজের মায়ের গলা। পরশু বড়দিন, সেই উপলক্ষে তার মা টেলিফোন করেছেন। ক্যাথিকে তার মা বললেন পরদিন তিনি তাদের দেখতে আসবেন, আর ক্যাথির ভাই জিম কেক নিয়ে আসবে তার বোন, ভগ্নিপতি আর ভাগ্নে ভাগ্নিদের জন্য।

মার কথা শুনে ক্যাথির মনের ভারটা যেন খানিকটা হালকা হল। পরশু বড়দিন, কিন্তু সে আর জর্জ সেই উপলক্ষে নিতান্ত না হলে নয় এমন সব জিনিস কেনাকাটা করতেও বেরোতে পারেনি। জিম ক্রিসমাস ট্রি আনলে অন্তত একটা উৎসবের পরিবেশ তৈরি হবে বাড়িতে। মাকে

অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল ক্যাথি, বাইরে বেরিয়ে কয়েক পা এগোতেই মিসি গম্ভীর মুখে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সামনে এসে মুখ তুলে বলল, "আচ্ছা মা, বাচ্চা পরী আর ভূতের ছানারা কি কথা বলতে পারে?"

যেটুকু মন ভাল করা খুশির আবেশ চারপাশে তৈরি হয়েছিল মেয়ের প্রশ্নে তা নিমেষে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেল। মিসি অবাক চোখের অবাক চাউনির দিকে তাকিয়ে ক্যাথি বুঝতে পারল এতক্ষণ আপনমনে এসব কথাই ভাবছিল সে। কথাটা মনে হতেই ক্যাথির গায়ে কাঁটা দিল— একটু আগে মেয়েকে সে দেখছে জানালা দিয়ে একদৃষ্টে বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আপনমনে বিড়বিড় করতে। তার মেয়ে কি তাহলে এতক্ষণ পরীর বাচ্চা আর ভূতের ছানাদের সঙ্গে কথা বলছিল? কথাটা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে ওপরের ঘরে ধুমধাম আওয়াজ। ক্যাথি বুঝল যে দুটো ভূতের ছানা পেটে ধরেছে সেই ক্রিস ও ড্যানি কোনও খেলনা ছুঁড়ে ফেলেছে। মেয়ের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ক্যাথি দৌড়ে এল ওপরে ছেলেদের খেলার ঘরে।

দোরগোড়ায় দাঁড়াতেই দেখল, ক্রিস আর ড্যানি একে অপরকে দু'হাতে জাপটে ধরে মেঝেতে গড়াচ্ছে, ফাঁক পেলেই কিল, চড়, লাথি, ঘুঁষি মারছে দু'জনে দু'জনকে।

"অ্যাই জানোয়ারের পাল!" রাগে চেঁচিয়ে উঠল ক্যাথি, "ওঠ! ভাল চাস ত ওঠ বলছি!" কিন্তু তার ধমক ছেলেদের কানে পৌঁছোল না। ভেতরে ঢুকে কান ধরে দুই ছেলেকে টেনে দাঁড় করাল ক্যাথি। মাথা ঠিক রাখতে না পেরে ঠাস ঠাস করে পরপর কয়েকটা চড় মারল দু'গালে। "কি হচ্ছে কি!" চেঁচিয়ে উঠল ক্যাথি, "কথা বলছি, একজনেরও শোনার নাম নেই! এত অসভ্য হয়েছিস তোরা!" "ঐ তোমার আদরের ড্যানিকে জিজ্ঞেস করো মার হাতে মার খেয়ে জল ঝরছে ক্রিসের চোখ থেকে," নাক টেনে ভাইকে দেখাল সে। "ফের মিছে কথা !" ক্রিসের গালে এক চড় মারল ড্যানি, "মার খেয়ে মিছে কথা বলতে লজ্জা করে না? নিজেই ত গায়ে পরে ঝামেলা বাধালি!"

"অ্যাই ড্যানি! কি হচ্ছে!" ড্যানির কান গায়ের জোরে পেঁচিয়ে দিল ক্যাথি," আমার সামনে ভাই-এর গায়ে হাত তুলতে তোর লজ্জা হচ্ছে না? সেদিন বাবার বেল্টের ঘা খাবার কথা এরই মধ্যে ভুলে গেলি? তোরা যে কুকুর বেড়ালেরও অধম হয়ে উঠছিস সে খেয়াল আছে? কি নিয়ে ঝগড়া করছিস তাই বল্! ঠিক আছে, ক্রিস মুখ বুঁজে থাক তোর মুখ থেকেই শুনি। তুই-ই বল্।'

এবার ড্যানিও চুপ, কি নিয়ে খানিক আগে তাদের অশান্তি বেধেছিল তা গুছিয়ে বলার ক্ষমতাটুকুই যেন হারিয়ে ফেলল সে।

"আমার হয়েছে যত জ্বালা!" ক্যাথি গলা চড়াল, মিসি পরী আর ভূতের ছানাদের সঙ্গে বিড়বিড় করে বকছে, আর এদিকে তোরা দু'জন কোনও কারণ ছাড়াই খুনোখুনি করছিস! এদিকে কাল বাদে পরশু বড়দিন! খানিক আগে তোদের দিদিমা ফোন করেছিল। বলছিল তোদের মামা কাল ক্রিসমাস ট্রি এনে বাড়িটা সাজাবে। উৎসবের আগে তোদের গায়ে হাত তুলতে কি আমার ভাল লাগে? আমার দুঃখ কি বুঝবি না তোরা? থাক, এসব কথা তোদের বলেই বা কি হবে। দু'জনেই শোন এই আমি নীচে চললুম, এখান থেকে আর কোনও আওয়াজ কানে গেলে আমি কিন্তু আর রক্ষা রাখব না। বাবার মন মেজাজ ভাল নেই। ওর কি রাগ তা ত

দেখেছিস, একবার কানে গেলে দু'জনকেই খুন করে ফেলবে! হুঁশিয়ার! বলে চটপট পা চালিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল সে। ফিরে এল নিজের শোবার ঘরে।

শোবার ঘরে পা দিয়েই থমকে দাঁড়াল ক্যাথি মুখ তুলে নাক ফুলিয়ে কয়েকবার জোরে নিঃশ্বাস নিল। একটা অদ্ভুত গন্ধ ভেসে আসছে কোণের দেয়াল আলমারিটার দিক থেকে। ঠিক দুর্গন্ধ নয়। তবে এ গন্ধ তার বড্ড অচেনা। ক্যাথি শুধু এ বিষয়ে নিশ্চিত যে এই অদ্ভুত অচেনা গন্ধের সঙ্গে এমনই কিছু অপ্রাকৃতিক শক্তির রেখা মিশে আছে যা এক কথায় অশুভ।

তবু সব জেনেশুনেও চুপ করে বসে থাকতে পারল না ক্যাথি, ঐ গন্ধই যেন বাড়িয়ে তুলল তার উদগ্র কৌতূহল, পায়ে পায়ে দেয়াল আলমারির দিকে এগোতে এগোতে ক্যাথি অনুভব করল এ-গন্ধের উৎস না জানা পর্যন্ত তার শান্তি নেই।

এগিয়ে এসে একবার থমকে দাঁড়াল ক্যাথি, সাহসে ভর করে হাতল টেনে দেয়াল আলমারির পাল্লাটা খুলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে—

সঙ্গে সঙ্গে ক্যাথির নজর পড়ল সামনের তাকে। বিয়েতে বান্ধবীর কাছ থেকে রূপোর ছোট একটা ক্রস পেয়েছিল ক্যাথি, আলমারির প্রথম তাকের দেয়ালে পেরেক এঁটে সেটা এতদিন ঝুলিয়ে রেখেছিল। অবাক হয়ে ক্যাথি দেখল কারও অদৃশ্য হাতের ছোঁয়ায় সেই ক্রস একই জায়গায় ঝুলছে উল্টো হয়ে। উল্টো ক্রস! মহা অমঙ্গলের সেই প্রতীক দেখে ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল ক্যাথি, পরমুহূর্তে তার নজরে পড়ল হাতখানেক লম্বা একটা অচেনা জানোয়ারের লাশ পড়ে আছে সেই ক্রসের নীচে। লাশের তলপেট ফেটে নাড়িফুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে, খানিক আগের গন্ধটা বেরোচ্ছে সেখান থেকে।

ক্যাথির গা মাথা ঘুলিয়ে উঠল। পাল্লাটা ঠেসে বন্ধ করে ছিটকে শোবার ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল সে। ঐ লাশ সাফ না করে ক্রস ছোঁবে না সে।

জর্জকে ডেকে এনে ব্যাখ্যার অতীত এই অপ্রাকৃতিক ঘটনা দেখাবে বলে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগল ক্যাথি।

জর্জ লুত্জের নতুন বাড়িতে স্বস্ত্যয়ন করে ফিরে আসার পাঁচদিন পরে ২৩ শে ডিসেম্বর রাতে ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়েছেন ফাদার মানকুসো। চব্বিশ ঘন্টা ধরে কখনও প্রচণ্ড উত্তাপে তাঁর সারা শরীর জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে, ঘামে ভিজে উঠছে গা, আবার কখনও অস্বাভাবিক ঠাণ্ডায় কাঁপছেন হি হি করে। চব্বিশ ঘন্টা বাদে থার্মোমিটার দিয়ে দেখলেন জ্বর দাঁড়িয়েছে একশো তিন ডিগ্রিতে। সামনে বড়দিন। এই সময় পাদ্রি হিসেবে তাঁর করণীয় অনেক কিছু আছে। তার মাঝেখানে এইভাবে রোগে ভুগলে মন এমনিতেই খারাপ হয়ে যায়। কমাতে পরপর কয়েকটা অ্যাসপিরিনের বড়ি খেলেন মানকুসো, কিন্তু তাতে কাজ হল না। সারারাত ঘুমের মধ্যে ছটফট করলেন। বড়দিনের আগের দিন তাঁর ঘুম ভাঙ্গল ভোর চারটেয়। জিভের নিচে থার্মোমিটার গুঁজে দেখলেন একশো চার ডিগ্রি। তার মানে জ্বর আরও এক ডিগ্রি বেড়েছে। বড় পাদ্রির সঙ্গে দেখা করে তিনি এবার ডাক্তারকে খবর দিতে বললেন। ফাদার মানকুসো দিব্যদৃষ্টি আর অলৌকিকে ঘোর বিশ্বাসী। নিয়মিত ব্যায়াম করলে যেমন পেশী পুষ্ট আর সবল হয় তেমনই সবসময় ঈশ্বর চিন্তায় একাত্ম হবার ফলে মাঝেমাঝে তাঁর দিব্যদর্শন

হয়। এমন অনেক অনুভূতি হয় যার কথা কাউকে বুঝিয়ে বলা যায় না। জর্জ লুত্জ-এর বাড়ি থেকে আসার পর থেকে তেমনই এক অনুভূতি থেকে থেকে তাঁর হচ্ছে, ঐ বাড়ির দোতলার একটি বিশেষ ঘরের ভেতরের চেহারা থেকে থেকে তাঁর মনে পড়ছে। জর্জের বাড়িতে ঢুকে জর্ডন নদীর পবিত্র জল ছেটানোর সময় সে ঘর তাঁর নজরে পড়েছিল গাদাগাদা মুখ বাঁধা কার্ডবোর্ডের বাক্স ছাড়া আর কিছু ওঘরে ছিল বলে তাঁর মনে পড়ছে না। তবে সে ঘরের জানালায় দাঁড়ালে দূরের বোট হাউস চোখে পড়ে এটুকু তাঁর মনে আছে। প্রচণ্ড জ্বরে আধো ঘুমের মধ্যে ক'টা দিন তাঁর কেটেছে। ঐ সময় 'অশুভ', অমঙ্গল, আর 'শয়তান', এই তিনটি শব্দ মুখ দিয়ে বেরিয়েছে তা তাঁর স্পষ্ট মনে আছে। জ্বরে শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যাবার ফলে বিকারজনিত কারণে মানুষ নানারকম ভুল বকে তা তাঁর অজানা নয়? তবু কেন কে জানে বাবার তিনি অনুভব করছেন জর্জের নতুন বাড়ির ঐ ঘরখানা বড্ড অপয়া, জর্জ, ক্যাথি আর তাদের ছেলেমেয়েরা কেউ যাতে ঐ ঘরে না ঢোকে সে কথা টেলিফোন করে তাদের বলে বিছানায় শুয়ে অস্বস্তিতে ছটফট করতে লাগলেন পাদ্রি মানকুসো। তিনি জানেন না জর্জের বৌ ক্যাথি বড় দিনে ক্রিসমাস ট্রি সাজানোর যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়ে রেখেছে দোতলার তার সেই সেলাইয়ের ঘরে। মা আর ভাই ক্রিসমাস ট্রি নিয়ে আসবে সেকথা ভেবে দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে পবিত্র গাছ সাজানোর সব উপকরণ সেই ঘর থেকে বের করে ঝেড়েপুঁছে সাজিয়ে রাখছে ক্যাথি। এসব উপকরণের সঙ্গে তার প্রথম স্বামীর কিছু স্মৃতিও জড়িয়ে আছে, ড্যানি আর ক্রিস জন্মানোর পরে তাদের প্রথম বড়দিনে পাওয়া সান্তা ক্লসের ছোট বড় কয়েকটা মূর্তি আর অন্যান্য খেলনা এখনও আস্ত আছে তাদের মধ্যে।

ডাক্তার এলেন বেলার দিকে। খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে যা বললেন তার সারমর্ম ফাদার মানকুসোর নাড়িতে জ্বর এখনও আছে, কম করে আরও চব্বিশ ঘন্টা তা থাকবে, এবং ঐ সময় তা বেড়ে যাওয়াও অস্বাভাবিক হবে না। জ্বর পুরোপুরি না ছাড়া পর্যন্ত তাঁর পক্ষে আরও দু'একটা দিন বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করাই ভাল। প্রয়োজনীয় ওষুধ আর পথ্যের নির্দেশ দিয়ে ডাক্তার খানিক বাদে চলে গেলেন।

ফাদার মানকুসো অন্য ধাতুতে গড়া মানুষ, ডাক্তার বললেও গির্জার কাজকর্ম আর মানুষের সেবা ফেলে বিশ্রাম নেয়া তাঁর ধাতে নেই। খাট থেকে নেমে কিছু হালকা খাবার নিজেই গরম করে খেলেন। তারপর ওষুধ খেয়ে হাত দিলেন পড়ে থাকা কাজ করতে। প্রবল ইচ্ছে থাকলেও একটানা বেশিক্ষণ কাজ করতে পারলেন না তিনি। বড় পাদ্রি তাঁকে কাজ করতে দেখেই বকাবকি শুরু করলেন, গলা চড়িয়ে বারবার নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ার কথা বলতে লাগলেন। মানকুসো নিজেও ভেতরে ভেতরে খুব দুর্বল বোধ করছিলেন তাই তাঁর কথার প্রতিবাদ না করে কাজ ছেড়ে উঠে পড়লেন। নিজের ঘরে ঢুকে রিসিভার তুলে লুত্জদের নতুন বাড়ির নম্বর ডায়াল করলেন। তখন বিকেল ঠিক পাঁচটা।

টেলিফোন ধরল ড্যানি, পাদ্রি মানকুসোর গলা শুনে খুশিখুশি গলায় বলল, "ফাদার, কেমন আছেন? সেই আঠারো তারিখে একবার এলেন, তারপর আপনার আর খোঁজখবর নেই। হেলো, ফাদার, আপনার শরীর ভাল আছে ত?"

"না ড্যানি উল্টোদিক থেকে ফাদার মানকুসো বললেন, ক'দিন থেকে বড্ড জ্বরে ভুগছি, ডাক্তার বলছে ফ্লু। ড্যানি জর্জকে আমার বিশেষ দরকার ওকে একবার ডেকে দাও।"

"দিচ্ছি, ফাদার।"

জর্জ যথারীতি আগুন পোয়াচ্ছিল ফায়ারপ্লেসের পাশে বসে, ফাদার মানকুসো অসুস্থ শরীরে ফোন করেছেন শুনে ছুটে ওপরে উঠে এল সে। "ড্যানির মুখে শুনলাম আপনার ফ্লু হয়েছে, ফাদার।"

"হেলো, ফাদার! ড্যানির মুখে এইমাত্র শুনলাম আপনার ফ্লু হয়েছে। শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। বলুন, ফাদার। আমার কিছু করার আছে?।"

"তুমি ত ডাক্তার নও জর্জ, হলে নয় ফ্লু সারানো উপদেশ চাইতাম!" পাদ্রির গম্ভীর গলায় রসিকতা ভেসে এল। "বিশেষ কারণেই তোমায় ফোন করেছি। তোমাদের বাড়ির দোতলায় ঠিক বোট হাউসের মুখোমুখি একটা ঘর আছে। যে ঘরের ভেতরে গাদাগাদা মুখ আঁটা কার্ডবোর্ডের বাক্স পরে আছে ঠিক বলেছি ত?"

"আছে, ফাদার। আপনি ঠিকই বলেছেন। ওটা হল ক্যাথির সেলাইয়ের ঘর, শুনেছি ওখানে বসে ও ধ্যানও করে। জানেন ফাদার। আপনি বলায় মনে পড়ে গেল। এর মাঝে একদিন ঐ ঘরে ঢুকেছিলাম দেখি জানালায় কাঁচের পাল্লায় কয়েক'শ মাছি-বসে আছে। এই শীতের মাঝমাঝি সময় মাছি, ভাবতে পারেন?"

"শোন জর্জ, আমার যা বলার তা ঐ ঘর নিয়েই। যেদিন তোমাদের বাড়ি গেলাম সেদিন ঐ ঘরটা আমার ভাল লাগে নি। তারপর থেকেই কথাটা তোমার বলার সুযোগ খুঁজছি। শোন, জর্জ, তুমি, ক্যাথি, আর ছেলেমেয়েরা কেউ ঐ ঘরে যেয়োনা এটাই আমার ইচ্ছে. কাজের জিনিসপত্র যা কিছু ভেতরে আছে সব বের করে বাইরে থেকে ঐ ঘরের দরজায় তালা এঁটে দাও।"

"কেন, ফাদার? কি আছে ঐ ঘরে? কি দেখেছেন ওখানে?"

"ক্র্যাক!" ফাদার মানকুসো জবাব দেবার আগেই রাইফেলের আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পেল জর্জ, সঙ্গে সঙ্গে লাইন গেল কেটে। উল্টোদিক থেকে অর্থহীন অদ্ভুত সব আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। "হেলো! ফাদার! ফাদার! জোরে বলুন! আপনার কথা কিছু বুঝতে পারছি না! হেলো! ফাদার! এ আবার কি হল লাইন খারাপ হল কেন?" আপনমনে বলে উঠল জর্জ।

রাইফেলের গুলির আওয়াজ উল্টোদিকে ফাদার মানকুসোও স্পষ্ট শুনেছেন। তারপর থেকে জর্জের গলা তিনিও শুনতে পাচ্ছেন না। হেলো হেলো করে অনেকক্ষণ চেঁচিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন তিনি। খানিক বাদে রিসিভার তুলে আবার জর্জের বাড়ির নম্বর ডায়াল করলেন। কিন্তু বৃথাই ডায়াল করা লাইন পেলেন না তিনি। পরপর দশবার ডায়াল করেও লাইন না পেয়ে হতাশ হয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন ফাদার মানকুসো।

জর্জেরও একই অবস্থা। ফাদার মানকুসোর গলা কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যেতে সেও অনেকবার রেক্টরির নম্বর ডায়াল করল। কিন্তু লাইন পেল না। আচমকা জর্জের মনে. পড়ল রেক্টরিতে ফাদার মানকুসোর ব্যক্তিগত একটা টেলিফোন লাইন আছে খুব দরকার পড়লে বিশেষ ঘনিষ্টদের সঙ্গে ঐ টেলিফোনে কথা বলেন তিনি। সেই বিশেষ নম্বরে পরপর

কয়েকবার ডায়াল করল জর্জ, কিন্তু রিসিভার তোলা দূরে থাক। উল্টোদিক থেকে টেলিফোন বাজার আওয়াজটুকুও তার কানে এল না। পাদ্রির ব্যক্তিগত নম্বরের লাইন ডেড!

রাত আটটা। জর্জ লুত্জের সঙ্গে টেলিফোনে আর যোগাযোগ করতে পারেন নি ফাদার মানুকুসো। স্থানীয় এক্সচেঞ্জের অপারেটরকে জর্জের ফোন নম্বর দেখতে এই নিয়ে তিন বার অনুরোধ করলেন তিনি, প্রত্যেকবারই অপারেটর জানাচ্ছে লাইন ঠিক আছে। কিন্তু ঠিক থাকা সত্ত্বেও অপারেটর নিজে চেষ্টা করেও যোগাযোগ করতে পারেনি ঐ নম্বরের। জর্জ নিজেও বা কেন তাঁকে টেলিফোন করছে না। তাহলে কি আবার কোনও বিপর্যয় ঘটল ওবাড়িতে? ওশিয়ান অ্যাভিনিউর ১১২ নম্বর বাড়ির ওপর কোনও ভরসা নেই। আধ্যাত্মিক দুনিয়ার মানুষ হিসেবে তিনি জানেন যে কোন মুহূর্তে চরম কিছু ঘটে যেতে পারে সেখানে।

অসুখ শরীরে চাপা উত্তেজনা ক্রমেই ছাড়িয়ে যাচ্ছে সহ্যের সীমা। আর থাকতে না পেরে ফাদার মানকুসো এক বিশেষ নম্বরে ফোন করলেন।

শেষ মুহূর্তে কাছাকাছি বাজার ঘুরে জর্জ আর ছেলে মেয়েদের জন্য ডিসকাউন্টে কিছু কাটপিস কিনে এনেছে ক্যাথি।

কাল বড়দিন, উৎসবের মুহূর্তে প্রিয়জনের হাতে উপহার তুলে না দিলেই নয়। কিন্তু উপহারের পরিমাণ এত কম হওয়ায় তার নিজেরই মন খারাপ লাগছে, আরও আগে তার বেরোনো উচিত ছিল বলে মনে মনে নিজেকে গালমন্দ করছে সে।

বাড়ি ফিরে ছেলেদের খেলার ঘরে পাঠিয়ে নিজের কাজকর্ম নিয়ে বসল ক্যাথি। আর তখন মেয়ে মিসির কথা তার মনে পড়ল। পরীর বাচ্চা আর ভূতের ছানারা কথা বলে কিনা জানতে চেয়েছিল মিসি। প্রশ্নের জবাব তার মাথায় আসে নি। বাবাকে জিজ্ঞেস করতে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল মেয়েকে। কিন্তু এমন এক কিম্ভূত প্রশ্ন মিসির মাথায় এল কেন তাই ভেবে পাচ্ছে না ক্যাথি। তার সেলাইয়ের ঘরে উঁকি দিয়েই বা কি দেখছিল মিসি? টেলিফোন করে জর্জ রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসার মুহূর্তে ক্যাথির চোখে তার চোখ পড়ল। জর্জের চোখে মুখে এক দুর্বোধ্য চাউনি, ক্যাথির মনে হল তার নজর এড়াতে চাইছে সে। ফাদার মানকুসো কি বলেছেন শোনার আশায় দাঁড়িয়ে রইল ক্যাথি কিন্তু জর্জ কিছুই বলল না। ঠিক তখনই কলিং বেল বেজে উঠল।

"নিশ্চয়ই মা এসেছে জিমকে নিয়ে," বলে উঠল ক্যাথি, "ওরা এসে গেছে এদিকে, খাবারদাবার কিছুই তৈরি হয় নি। যাও, দরজাটা খুলে দিয়ে এসো!"

ক্যাথির ভাই জিমি একটা মাঝারি আকারের ক্রিসমাস ট্রি নিয়ে এসেছে, সাজানো পাইন গাছ। জর্জকে দেখে থমকে গেল দু'জনেই, তার মুখে কম করে এক হপ্তার গোঁফদাড়ি। মাথার চুল এলোমেলো। দু'চোখে উদভ্রান্ত চাউনি। ক্যাথির মা জোয়ান কোনার্স জামাইয়ের চোখ মুখ দেখে ঘাবড়ে জানতে চাইলেন, "ক্যাথিও ছেলে মেয়েরা গেল কোথায়?"

"ও খাবার তৈরি করছে।" জর্জ বলল, "ছেলেমেয়েরা ওপরে খেলছে।"

জর্জের সঙ্গে ধরাধরি করে ক্যাথির ভাই জিমি বড় দিনের পবিত্র গাছটা নিয়ে এল লিভিং রুমে। ফায়ারপ্লেসের গনগনে আগুনের দিকে চোখ পড়তে জিমি বলে উঠল, "আরেব্বাস! কিছু আগুন জ্বালিয়েছো বটে, জর্জ?"

“না জ্বালিয়ে উপায় কি বলো,” জর্জ বলল, “যা বেমক্কা ঠাণ্ডা চারপাশে! এখানে আসার পর গত ছ'দিনে কম করে গোটা দশেক গাছের গুঁড়ি পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছি।”

“সেটা আমিও খেয়াল করেছি,” জিমি সায় দিল, তোমাদের এই নতুন বাড়িতে ঠাণ্ডাটা একটু বেশি হয়ত, তোমার তেলের বার্ণার নয়ত থার্মোস্ট্যাট দুটোর একটা ঠিকমত কাজ করছে না!”

“মোটেও না,” জর্জ প্রতিবাদ করল, “তেলের বার্ণার খুব ভাল কাজ করছে, আর থার্মোস্ট্যাটে আশি ডিগ্রি উঠে গেছে। বেসমেন্টে চলো নিজের চোখে দেখবে।” ভগ্নিপতির কথা শুনে জিমি আর কোনও প্রশ্ন করল না, ওপরে এসে বোনের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হাত লাগিয়ে ডালপাতা ছেঁটে বড়দিনের গাছ সাজাতে বসল। তার মা জোয়ান ঢুকলেন রান্নাঘরে। মেয়েকে রান্নার কাজে সাহায্য করার ফাঁকে জানতে চাইলেন, হ্যাঁরে বৌ, তোর বর এমন নোংরা হয়ে আছে কেন? কিছু বলতে পারিস না?”

“কি বলব বল,” ক্যাথি মার দিকে না তাকিয়েই জবাব দিল, “এ বাড়িতে আসার পর থেকে ঐ এক ঢং ধরেছে, চান করছে না। দাড়িও কামাচ্ছে না। অফিসে না গিয়ে দিনরাত বসে বসে আগুন পোয়ায়। আর যেখানে যত গাছের গুঁড়ি দেখে সব এনে গোঁজে ফায়ারপ্লেসের আগুনে, তারপরেও, ওঃ, কি ঠাণ্ডা, মরে গেলুম, বলে দিনরাত প্যানপ্যান করছে। হ্যাঁ আরেকটা কাজ ওর বেড়েছে, রোজ রাতে একবার বাইরে গিয়ে দেখে আসে বোট হাউসটা ঠিকঠাক আছে কিনা?

কোনার্স জানতে চাইলেন, “ওখানে কি দেখতে যায়?”

“ওই জানে!” হাত উল্টে তাচ্ছিল্যের গলায় বলল ক্যাথি, “জিজ্ঞেস করলে বলে ওখানকার দরজা জানালা আর নৌকোটা ঠিকঠাক আছে কিনা দেখতে যায়।”

“জর্জের ধাত ত আগে এমন দেখিনি,” মিসেস কোনার্স বললেন, “তবে তোদের এখানে ঠাণ্ডাটা একটু বেশি তা মানতেই হবে। ভেতরে ঢোকার পর থেকে দেখছি হাত পা কালিয়ে যাচ্ছে।”

মা আর মেয়ের কথার মাঝখানে জর্জ এসে হাজির। রান্নাঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বলল, “ক্যাথি, তুমি কি সেলাই-এর ঘরের জানালা খুলেছিলে?'

“কি বলছ?” ক্যাথি বলল, “আমি সারাদিন ওপরেই কাটিয়েছি।”

“তাহলে ত নিশ্চয়ই তোমাদের কাজ,” তিন ছেলেমেয়ের মুখের দিকে তাকাল জর্জ, কিন্তু তিনজনেই একইসঙ্গে ঘাড় নেড়ে অভিযোগ অস্বীকার করল।

“ব্যাপার কি জর্জ,” থাকতে না পেরে জানতে চাইল ক্যাথি, “কি হয়েছে তাই বলো।”

“ঐ ঘরের একটা জানালা দেখলাম খোলা, আর হতচ্ছাড়া মাছিগুলোও ফিরে এসেছে।”

“ঝন্! ঝন্” আওয়াজটা বাইরে থেকে ভেসে আসতেই কান খাড়া করল জর্জ। বোট হাউসের দরজাটা আবার খুলে পড়ল। আওয়াজ শুনেই বুঝেছি ঐ দরজার পাল্লার কব্জা ভেঙ্গে খসে পড়ল। না, বারবার এমন কাণ্ড ঘটলে কারও মাথার ঠিক থাকে?” জর্জের আক্ষেপ শেষ হতে না হতেই বোট হাউসের পাশ থেকে হ্যারির চেনা গলার গজরানি শোনা গেল “ভেউ! — ভেউ — ঔ!”

"তিনটের একটাকেও এখন বেরোতে দেবে না।" ইশারায় ছেলেমেয়েদের দেখিয়ে বৌকে বলল জর্জ, "আমি ওটা জোড়া দিয়েই আসছি!" বলে দেয়াল আলমারি খুলে নৌসেনার জ্যাকেটটা বের করে গায়ে চাপাল সে। তারপর বেরিয়ে গেল রান্নাঘরের দরজা দিয়ে। ক্যাথি জামার হাতার উল্টো পিঠে চোখের জল মুছতে লাগল।

"কি হল। ক্যাথি?" জানতে চাইলেন তার মা, "তুই আবার কাঁদছিস কেন? কেন?"

"জানি না মা, বিশ্বাস করো," মাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল সে, "এসবের কিছুই আমি বুঝতে পারছি না, কিছুই মাথায় ঢুকছে না!"

বাইরে বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটি গাঁট্টাগোট্টা চেহারার লোক একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল ১১২ নম্বর বাড়ির দিকে, জর্জকে ছুটে বেরিয়ে আসতে দেখে দৌড়ে বাড়ির পেছন দিকে চলে এল সে। এ বাড়িতে লোকটি আগেও একবার এসেছে তাই সে জানে এখানকার রান্নাঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরোনো যায়।

হাতঘড়ির দিকে তাকাল সে, রাত এগারোটা ত্রিশ। পকেট থেকে ওয়াকিটকি বের করে সে সুইচ টিপল, তারপব চাপা গলায় বলতে লাগল, "জামাতারো, ডিটেকটিভ সার্জেন্ট গিয়নফ্রিজো বলছি. তোমার বন্ধু ফাদার মানকুসোকে বলে দাও ভাবনাব কিছু নেই। ওশিয়ান অ্যাভিনিউর ১১২ নম্বর বাড়ির নতুন বাসিন্দারা ঠিকমতই আছে।"

বছব খানেক আগে ঐ বাড়িতে যেদিন বক্তগঙ্গা বযে গিয়েছিল সেদিনও ডিটেকটিভ সার্জেন্ট আল গিয়নফ্রিজো এই বাড়ির সামনে ডিউটিতে ছিল।

২৫ শে ডিসেম্বব। বড়দিনেও জর্জেব নিস্তার নেই, রোজের মতই রাত সোয়া তিনটেয় তার ঘুম গেছে ভেঙ্গে। বিছানায় উঠে বসতে জর্জ দেখল চাঁদেব আলোর শোবার ঘর ভয়ে গেছে, সেই আলোয জর্জ স্পষ্ট দেখল বালিশে মুখ গুঁজে তলপেটে ভর দিয়ে উপুড় হয়ে ঘুমোচ্ছে ক্যাথি।

মাথায় হাত বুলাতেই ক্যাথিব ঘুম গেল ভেঙ্গে, বালিশে মাথা রেখে চোখ বড় করে চাবপাশে তাকিয়ে কি যেন খুঁজতে লাগল সে। ক্যাথির চোখের চাউনিতে ভীতির ছাপ ফুটে উঠেছে তা জর্জের চোখ এড়াল না। "বৌটার মাথায় গুলি করেছে গো!" প্রাণপনে চেঁচিয়ে উঠল ক্যাথি, "বেচারি বৌটার মাথার গুলি লেগেছে! ঘুমিয়ে মাথার ভেতর খুলি ফাটার আওযাজ স্পষ্ট শুনতে পেলাম।"

জর্জের কানে অসংলগ্ন অর্থহীন ঠেকলেও ডিটেকটিভ সার্জেন্ট গিয়ফ্রিজো থাকলে ক্যাথির ভয় পেয়ে জেগেওটার কারণ ঠিক বুঝতে পারত। বছরখানেক আগে বাড়ির প্রত্যেকটি বাসিন্দা খুন হবাব পরে ডিটেকটিভ সার্জেন্ট গিয়নফ্রিজো প্রাথমিক তদন্তের রিপোর্টে উল্লেখ করেছিল ডেফো পবিবারের গৃহিনী লুইসা বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে ঘুমোচ্ছিল ঘুমন্ত অবস্থাতেই মাথায গুলি লেগে তার মৃত্যু ঘটে। পাশে তার স্বামীও ঐভাবেই শুয়েছিল, গুলি লেগেছিল তার গলার পেছনে। কিন্তু কোনও খবর ছেপে বেরোয়নি।

জর্জ দু'হাতে উত্তেজিত ক্যাথিকে ঝাঁকুনি দিতে লাগল। ঝাঁকুনি খেতে খেতে একসময় ক্যাথি শান্ত হয়ে এল, খানিক বাদে সে বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। আর তারপরেই

বোটহাউসে গিয়ে সব কিছু ঠিক আছে কিনা দেখার ইচ্ছেটা আবার জর্জকে পেয়ে বসল। পা টিপে টিপে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে। বোটহাউসের পাশে শুয়েছিল হ্যারি, গায়ে পা লাগতেই লাফিয়ে উঠল সে।

"শশ্‌ফ, হ্যারি!" উবু হয়ে কুকুরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল জর্জ, "সব ঠিক আছে, তুমি শোও."

জর্জের কথা হ্যারি বুঝতে পারল কিনা সেই জানে, কিন্তু জর্জ বোটহাউসের দরজার কাছে গিয়ে পেছন ফিরতেই দেখল কুকুরটা ওঁৎ পেতে তাকে লক্ষ করছে। বোটহাউসের দরজা ঠিকঠাক আছে দেখে পেছিয়ে এল জর্জ, আরেকবার হ্যারির গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "ঠিক আছে হ্যারি, নিশ্চিন্তে ঘুমোও। আমি একটু বাদে বাড়ি যাচ্ছি।" হ্যারির শুতে যাবার কোনও তাগিদ নেই. একইরকম ওঁৎ পেতে সে মনিবের দিকে তাকিয়ে রইল।

সুইমিং পুলের চারপাশে পাক খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল জর্জ, মুখ তুলে বাড়ির দিকে তাকিয়ে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল। আচমকা জর্জ দেখল দোতলায় শোবার ঘরে খাটের লাগোয়া জানালায় দাঁড়িয়ে আছে মিসি, হ্যারির মত সেও একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার দিকে। কিন্তু মিসির ঠিক পাশে কি ওটা? জর্জের কলজেটা বুকের ভেতর ধুকপুক করে প্রবল উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল। জর্জ দেখল মিসির পাশে একাট শুয়োরের মুখ। বাইরে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে জর্জ স্পষ্ট দেখল শুয়োরটার খুদে দু'চোখ জ্বলছে কয়লার মত, সে চোখের চাউনি তারই দিকে নিবদ্ধ!

"মিসি!" মেয়ের নাম ধরে চেঁচিয়ে উঠল জর্জ, কিন্তু এতদূর থেকে সে ডাক মেয়ের কানে গেল না। ভয় আর উত্তেজনার কাঁপতে কাঁপতে ছুটে এল জর্জ। শোবার ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলে দেখল খানিক আগে ক্যাথি যেভাবে শুয়েছিল হুবহু সেই ভঙ্গিতে বালিশে মুখ গুঁজে তলপেটে চাপ দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে তার মেয়ে। মেয়ের নাম ধরে ডাকল জর্জ কিন্তু তার ঘুম ভাঙ্গল না।

পেছনে ক্যাঁচ করে আওয়াজ হতে চমকে উঠল জর্জ, মুখ ফিরিয়ে দেখল মিসির রকিং চেয়ারটা আপনিই সামনে পেছনে দুলছে।

জর্জ আর ক্যাথি অনেক চেষ্টা করেও বড়দিনে টেলিফোনে ফাদার মানকুসোর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারল না। বড়দিনে নদী সমেত গোটা অ্যামিটিভিল অঞ্চল তুষারে চাপা পড়তে রেডিওতে আবহাওয়াবিদদের এই আশংকা ভুল প্রমাণিত হলেও হিমেল আবহাওয়া ঠিক বজায় রইল তুষারপাতের আগে যেমন থাকে। ফাদার মানকুসো অসুস্থ শরীরে গোটা বড় দিনটা বিক্ষুব্ধ মনে রেক্টরিতেই কাটালেন, তাঁর তাপমাত্রা সেদিন ছিল একশো তিন ডিগ্রি। ফ্লু-র মধ্যে তাঁর দু'হাতের পাতায় বড় বড় ফোস্‌কা পড়েছে। দু'হাতের পাতায় পোড়ার তীব্র যন্ত্রনা প্রতি মুহূর্তে অসহ্য ঠেকছে। আগুনের ধারে কাছে না গেলেও হাতের পাতায় ফোস্‌কা কি করে পড়ল তা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছেন না মানকুসো। ভেবে পাচ্ছেন না তাঁর ডাক্তারও। হাতের পাতা ডুবিয়ে রাখার জন্য একটা লোশন তিনি দিয়েছেন। তাতে হাত ডুবিয়ে রাখলে কিছুটা আরাম হয়, জ্বলুনিও কিছুটা কমে।

অন্যদিকে মেয়েকে নিয়ে ক্যাথির হয়েছে আরেক ঝামেলা। ক্যাথি লক্ষ করছে দিন-রাতে যখন তখন মিসি আপন মনে কার সঙ্গে যেন কথা বলে। কিন্তু যার সঙ্গে কথা বলে তাকে দেখা যায় না। নিজের কানে ক্যাথি মিসিকে বলতে শুনছে "তুষার পড়া শুরু হলে চারপাশের বাড়ি ঘর, গাছপালা সব ধপধপে সাদা হয়ে যাবে। ভারি সুন্দর দেখাবে, ঠিক ছবির মত, তাই নারে জোডি?" ঐ মেয়ের ঘরে উঁকি দিতে ক্যাথি দেখল রকিং চেয়ারে বসে দুলতে দুলতে খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে আপন মনে বসে যাচ্ছে মিসি। "কার সঙ্গে কথা বলছিস, মিসি?" দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে জানতে চাইল ক্যাথি, 'পরীর বাচ্চা, না ভূতের ছানা?'

'ওসব না', ঘাড় ফিরিয়ে যার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় জবাব দিল মিসি, "আমি জোডি-র সঙ্গে কথা বলছি।"

"জোডি?" মেঝেতে ছড়ানো গাদা গাদা পুতুল আর খেলনায় ইশারায় দেখিয়ে বলল ক্যাথি, "জোডি বুঝি তোর নতুন পুতুলের নাম।' "পুতুল নয় মা।" মিসি বলল, "জোডি হল একটা শুয়োর, ওর চোখ দুটো আঁধারে লাল পুঁতির মত জ্বলে। জ্যোডি আমার বন্ধু। আমি ছাড়া আর কাউকে ও দেখা দেয় না।"

মিসির কথা শুনে ভয়ে আঁতকে উঠল ক্যাথি। বড়দিনের আগে রান্নাঘরে অদৃশ্য হাতের ছোঁয়ার অনুভূতির ঘটনা বিদ্যুৎ চুম্বকের মত মনে পড়ল। জর্জ সেই ঘটনা বিশ্বাস করেনি। যেসব অস্তিত্ব চোখে দেখা যায় না মিসি কি তেমনই কোনও অস্তিত্বের কথা বলছে? কথাটা মনে হতে অজানা আশংকায় থরথর করে কেঁপে উঠল ক্যাথি। নিজের কপালে আর বুকে আঙ্গুল দিয়ে পবিত্র ক্রস চিহ্ন আঁকল সে। হাত জোড় করে করুণাময়ী মা মেরির কাছে প্রার্থনা করল যাতে কোনও অশুভ শক্তি তার প্রিয়জনদের ওপব প্রভাব ফেলতে না পারে।

বড়দিনের পরের দিন সকাল। রান্নাঘরে বাজারের কেনাকাটার ফর্দ করতে বসেছে ক্যাথি, এমন সময় স্পষ্ট অনুভব করল কেউ এসে দাঁড়িয়েছে তার খুব কাছে। চেয়ারের পেছনে প্রায় গা ঘেঁষে। মুখ তুলে ঘাড় ফেরাতে আগেও একবার যেমন হয়েছিল তেমনই আজও কাউকে দেখতে পেল না সে। আচমকা এক সুগন্ধের ঝাপ্টা এসে লাগল নাকে। গন্ধটা পেতে চমকে উঠল ক্যাথি, তার মনে পড়ল দিন চারেক আগে শোবার ঘরে ঠিক এই গন্ধই আচমকা বাতাসে বয়ে ভেসে এসেছিল। পরমুহূর্তে গন্ধটা আরও কাছে এসে পড়েছে বলে তার মনে হল সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য দু'টি হাতের ছোঁয়া টের পেল ক্যাথি, মেয়ে মানুষের হাত, অদৃশ্য দুটি হাত যেন.... মমতা ভরে বুকে জড়িয়ে ধরছে তাকে। অদৃশ্য বুকের স্তনের স্পর্শও অনুভব করল ক্যাথি। ভয় দেখাতে নয়, ক্যাথি অনুভব করল অদৃশ্য মমতাময়ী দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে যেন ভরসা দিতে চাইছে তাকে।

ক্যাথির ভাই জিমির সেদিন বিয়ে। বোন, ভগ্নিপতি আর তিন ভাগ্নে ভাগ্নিকে নিয়ে সে গির্জার দিকে রওনা হবে এমন সময় আচমকা জিমের মনে হল জ্যাকেটের ভেতরের পকেটটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে চমকে উঠল জিম, পার্স উধাও। সেই সঙ্গে উধাও নগদ দেড় হাজার ডলার। জিমি নিজে সামরিক বাহিনীর অফিসার। ব্যারাক থেকে গাড়ি চালিয়ে সবাইকে নিয়ে যাবে বলে সোজা চলে এসেছে বোনের বাড়িতে। মাঝখানে কোথাও থামেনি। কিছু কেনাকাটা করেনি। তাহলে এতগুলো টাকা ভর্তি পার্সটা গেল কোথায় তাই ভেবে পেল না সে।

বাড়ি ফেরার সময় আগের মালিক ডেফো পরিবারের ব্যবহৃত রেফ্রিজারেটর, ডিপ ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, পোর্সিলিনের বাসনপত্র এসবই জলের দরে পেয়েছিল জর্জ, সেসব এতদিন পড়েছিল সিঁড়ির নিচে বেসমেন্টের গুদামে। জিমি আর ক্যারিকে প্লেনে তুলে দিয়ে বাড়ি ফিরে কি খেয়াল চাপল তার মাথায়। ছেলে মেয়েদের শুইয়ে ক্যাথিকে নিয়ে বেসমেন্টের সেই গুদামে এসে ঢুকল সে। ঘর গরম করতে যত কাঠ পোড়ে সেসব ডাঁই করা থাকে এই গুদামেই। কাঠের দেয়ালের গায়ে ঠেশ দিয়ে সাজিয়ে রাখা কাঠের গুঁড়িগুলোর কাছে যেতে দু'জনেরই চোখে পড়ল দেয়ালের গায়ে অনেকটা জায়গা জুড়ে ফাটল ধরেছে আর সেই ফাটলের ওপাশে একটা ছোট কামরা দেখা যাচ্ছে।

দেয়ালের ওপাশে কি আছে দেখার আগ্রহ পেয়ে বসল দু'জনকে। কাঠের গুঁড়িগুলো সরিয়ে জোরে চাপ দিতেই আলগা কাঠের তক্তা জুড়ে তৈরি দেয়ালের খানিকটা সরে এল, টর্চ জ্বালিয়ে ভয়ে ভয়ে ওপাশে এসে দাঁড়াল জর্জ আর ক্যাথি। ভেতরে সুনসান চারদিক ফাঁকা।

"ঝোঁকের মাথায় এখানে চলে এলো" মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলল ক্যাথি, "একটা চোরা কুঠরি ছাড়া আর কিছু ত নয়" একটু চুপ করে নাক তুলে জোরে জোরে শ্বাস নিল সে। তারপর বলল, "কেমন এক অদ্ভুত ভ্যাপসা গন্ধ চারপাশে ছড়িয়ে আছে, তুমি পাচ্ছো?'

"পাচ্ছি বই কি।" জর্জ ভুরু কোঁচকাল, "এ হল রক্তের গন্ধ।"

"রক্তের গন্ধ!" চমকে উঠল ক্যাথি, "কি বলছ তুমি?"

"ঠিকই বলছি।" আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ গলায় বলল জর্জ। "যেকোনও কসাইখানায় বেশি রাতের দিকে ঢুকলেই এই গন্ধ পাবে তুমি। আর পাওয়া যায় যুদ্ধক্ষেত্রে, যেমন পেয়েছি আমি।"

"এসব কথা শুনতে আমার ভাল লাগছে না, জর্জ।" স্বামীর গা ঘেঁষে দাঁড়াল ক্যাথি। "দোহাই এবার ওপারে চলো।"

"ওপাশ থেকে আরেকটা ঘর দেখে ভাবলাম ভেতরে হয়ত গুপ্তধন লুকোনো আছে। হালকা গলায় বলল জর্জ, "সেই লোভেই ভেতরে ঢুকলাম। এসে দেখছি এটা নিছক এক পুরোনো কসাইখানা। তবে যাই বলো ক্যাথি, আমার বেশ মনে আছে বাড়ির ব্লু প্রিন্টে এই বাড়তি ঘরের কোনও উল্লেখ নেই। আগে যারা এ বাড়ির মালিক ছিল তারা নিজেদের প্রয়োজনে এই বাড়তি কামরা গুদামের ভেতর থেকেই জায়গা বের করে তৈরি করিয়েছিল।

ওপরে এসে কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ল দু'জনেই। ঘন্টাখানেক কেটেছে কি কাটেনি। তার মাঝে কখন ঘুমের অতলে তলিয়ে গেছে দু'জনে। আচমকা পোড়া গন্ধ নাকে আসতে জর্জের ঘুম গেল ভেঙ্গে। এক ঝটকায় বিছানায় উঠে বসল সে। আলতো ঠেলা দিয়ে ক্যাথিকেও জাগাল সে।

"কি হল, জর্জ?" ঘুম ভেঙ্গে আশঙ্কা ভরা গলায় জানতে চাইল ক্যাথি।

মুখে কিছু না বলে খাট থেকে লাফিয়ে নামল জর্জ, তার পেছন পেছন ক্যাথি। দৌড়ে বাইরে এসে সিঁড়ি দিয়ে দোতলার চাতালে নামতেই দেখল রাশি রাশি ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে বেরিয়ে আসছে মিসির ঘর থেকে। দৌড়ে দু'জনে ঢুকল মিসির ঘরে। দেখল তার খাটের চারপাশে নেচে বেড়াচ্ছে অদ্ভুত আগুনের শিখা। সে শিখা নিজেই রং পাল্টে লাল থেকে নীল

হয়ে যাচ্ছে। অথচ আশ্চর্য, আগুনের সামান্যতম আঁচ বিছানার কাপড়ে লাগছে না, চারপাশে আগুনের তাণ্ডবের মাঝখানে পরম নিশ্চিন্তে পাশ দিয়ে ঘুমোচ্ছে মিসি পাশে একটা বড়সড় পুতুল নিয়ে।

পুতুল? সত্যিই পুতুল? খাটের কাছে এসে দাঁড়াতে যেন ভোজবাজিতে সেই পুতুল এক শুয়োর ছানায় পরিণত হল। লাল পুঁতির মত বড় বড় চোখে সে তাকিয়ে রইল জর্জের দিকে। খানিক দূরে মিসির রকিং চেয়ার আপন খেয়ালে দোল খেয়েই চলেছে। দেখে মনে হয় কেউ যেন তাতে চেপে বসে আছে। সেই চেয়ার খাটের পাশে টেনে আনল জর্জ, তাতে পা রেখে আগুনের বেড়াজাল এড়িয়ে উঠে পড়ল খাটে। ঘুমন্ত মেয়েকে দু'হাতে জড়িয়ে চেয়ারে সাবধানে পা রেখে নেমে এল মেঝেতে।

"আজকের রাতটা ওকে তোমার পাশে শুইয়ে রাখো।" মিসিকে ক্যাথির কোলে তুলে দিয়ে বলল জর্জ, "ভাল করে আগলে রেখো। বলে ছুটে গিয়ে ঢুকল লাগোয়া বাথরুমে। সেখানে দেয়ালের গায়ে টাঙ্গানো আগুন নেভানোর যন্ত্র নিয়ে যখন ফিরে এল ততক্ষণে আগুনের শিখাগুলো ঢিমে হয়ে নেতিয়ে আসছে। মেঝেতে টিউব ঠুকে সিলিণ্ডার আগুনের দিকে তাক করতেই রাশি রাশি ফেনা বেরিয়ে এসে পড়ল সেই রহস্যময় আগুনের ওপর। মিনিট খানেক যেতে না যেতে আগুনের চিহ্নমাত্র রইল না।

শেষ রাতে তুষারপাত শুরু হল। ভোরবেলা উইণ্ডচিটার গায়ে জড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে কিছু দূর এগোতে চমকে গেল জর্জ। স্পষ্ট দেখল কাদা মাটির ওপর চারপেয়ে জানোয়ারের খণ্ডিত খুরের ছাপ পড়েছে। অনেক দূরে, প্রায় বোট হাউস পর্যন্ত গেছে সেই ছাপ। এই ছাপ যে শুয়োরের খুরের তা জর্জ জানে। এছাড়া আরও বিস্ময় তোলা ছিল তার জন্য। অনেকদিন পরে আজ অফিসে যাবে ভেবে বাড়ি থেকে বেরোল জর্জ। কিন্তু গ্যারাজের কাছে এসে দেখে লোহার পাল্লা দুটো উপড়ে বেরিয়ে এসেছে মজবুত কব্‌জা থেকে। ভেতরে গাড়ি অক্ষতই আছে। ফিরে এসে গ্যারাজের ভাঙ্গা দরজা মেরামত করবে ভেবে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল সে।

জর্জ বেরিয়ে যাবার পরে ঘরের কাজকর্মে হাত দিল ক্যাথি। আচমকা পেছন থেকে দুটি হাত তার কোমর জড়িয়ে ধরল। না, রান্নাঘরে যা অনুভব করেছিল এ-হাতের ছোঁয়া তেমন নরম আর মেয়েলি নয়। বরং অনেক কঠোর, পুরুষালি। ঘাড় ঘুরিয়ে কাউকে দেখতে না পেলেও বা অদৃশ্য অস্তিত্ব দু'হাতে তার কোমর জড়িয়ে ধরেছে সে যে পুরুষ সে বিষয়ে ক্যাথির মনে সন্দেহ রইল না। ছটফট করে উঠতেই সেই বলিষ্ঠ দু'টি অদৃশ্য হাত তাকে একপাক ঘুরিয়ে দিল। ক্যাথি অনুভব করল অদৃশ্য অস্তিত্ব এই মুহূর্তে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ঠিক তখুনি অন্য এক জোড়া অদৃশ্য হাত এসে ক্যাথিকে ধরে টেনে সরিয়ে আনতে চাইল। ক্যাথি টের পেল এ হাতের ছোঁয়া কোমল, নরম, তার চেনা। তাকে নিয়ে দু'জোড়া অদৃশ্য হাতের মধ্যে টানা হেঁচড়া শুরু হলো। শেষকালে কোমল মেয়েলি হাতেরই জয় হল। সেই পুরুষালি হাতের ছোঁয়া যেন আচমকাই উধাও হল।

সেদিন রাতে জর্জ আর ক্যাথি আরও রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা অর্জন করল। জর্জের চোখে অনেকক্ষণ ধরে ঘুম আসছে না। ঢিমে আলোয় চোখ বুঁজে নানা কথা ভাবছে সে। ক্যাথি ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ। .... ঘুমের ঘোরে অল্প নাকও ডাকছে। খানিকবাদে জর্জ চোখ মেলতে

নাইট ল্যাম্পের আলোয় দেখল ক্যাথির দেহটা পাশ ফেরা অবস্থায় ধীরে ধীরে ওপরে উঠে যাচ্ছে। চমকে উঠে জর্জ খামচে চেপে ধরল তার চুলের মুঠি, টেনে এনে বালিশে তার মাথাটা শুইয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাথির ঘুম গেল ভেঙ্গে, আর তার মুখের পানে চেয়ে চমকে উঠল জর্জ কোথায় ক্যাথি। ক্যাথির ধড়ের ওপর একটা বুড়ির মুখ বসানো। বয়সের ভারে যার চোখ মুখ গেছে কুঁচকে। গালে, কপালে অজস্র বলিরেখা। লালা ঝরে পড়ছে ঠোঁটের কোল বেয়ে। ক্যাথিকে পাঁজাকোলা করে বাথরুমে নিয়ে এল জর্জ, কিছু না বলে দাঁড় করিয়ে দিল আয়নার সামনে। আয়নায় নিজের মুখ দেখে চমকে উঠল ক্যাথি। কেঁদে ফেলল হাউ হাউ করে। সঙ্গে সঙ্গে আবার নিজের চেহারা ফিরে পেল সে।

এবার ভয় দেখা দিল জর্জের মনে। এ বাড়িতে আসার পরে ব্যাথায় অতীত যেসব অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে তাদের ভৌতিক বললে যে বেশি বলা হবে না এ সম্পর্কে এতদিনে নিশ্চিন্ত হল সে। ফাদার মানকুসোর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে সব ঘটনা সংক্ষেপে বলল সে। ফাদার মানকুসো তাকে ক'দিন অপেক্ষা করতে বললেন। তারপরে দেখা করলেন বড় পাদ্রির সঙ্গে, তাঁকে সব শোনালেন। সব শুনে পাদ্রি বললেন, "ও বাড়িতে যে ভূত প্রেত আর শয়তানের ডেরা হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। জর্জ লুত্জকে বলো যত শীগগিরি পারে ও যেন সপরিবারে ঐ বাড়ি ছেড়ে কিছুদিন অন্য জায়গায় ঠাঁই নেয়। ওদের অনুপস্থিতিতে স্বস্ত্যয়ন করলে ও বাড়ি হয়ত বসবাসের উপযোগী হতে পারে। বড় পাদ্রির উপদেশ জর্জকে শোনালেন ফাদার মানকুসো, জর্জের সামনে আর কোনও পথে খোলা ছিল না। মাত্র আঠাশ দিন কাটানোর পরে ১৯৭৬-এর ১৪ই জানুয়ারি জর্জ লুত্জ বৌ ছেলেমেয়ে নিয়ে নতুন বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় বাসা বাঁধল।

প্রেত প্রেয়সীর দেওয়া সোনার মোহর

ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার পরে এবার জ্যান্ত ভূতের বাড়ি আর তেনাদের কাজ কারবারের খোঁজে শেষপর্যন্ত ফিরে আসতেই হল স্বদেশে—ভারতে। কে না জানে ভারত এমনই এক দেশ যেখানে আর যা কিছুর অভাব বা ঘটাতি যতই হোক ভূতের অভাব ও ঘাটতি কখনোই হয় না। আর বঙ্গদেশ? সেখানকার মানুষ মাত্রেই ভূতের গল্পের নামে এক পায়ে খাড়া। বঙ্গদেশে যাদের জন্ম ছোটবেলায় বাড়িতে ঠাকর্দা ঠাকুরমার কাছে তারা শোনে মহা সঞ্জীবনী ভূতনাশন মহামন্ত্র "ভূত আমার পুত পেত্নি আমার ঝি, রামলক্ষণ বুকে আছেন করবি আমাব কি।" বাস্তবিক পক্ষে জল জমিয়া যেমন বরফ হয়, তেমনই অন্ধকার জমিয়া ক্রমে ভূত হয়, ভূততত্ত্বের এমন সহজ ব্যাখ্যা যার মাথা থেকে বেরিয়েছিল তিনি ভূতের গল্পের অন্যতম শক্তিমান লেখক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপ্যধ্যায়। নিঃসন্দেহে ত্রৈলোক্যনাথ দুনিয়ায় ভূতের গল্পের একমাত্র ব্যতিক্রমী লেখক যিনি ভূতের গল্প লিখতে গিয়ে এমন বিভীষিকা আমদানী করেন নি যাতে ভয়ে পাঠকের দাঁতকপাটি লাগে। উল্টে তাঁর কথা না শুনলে ধরে ধরে খবরের কাগজের সম্পাদকের চাকরিতে বহাল করবেন বলে ভূতেদেরই তিনি আজীবন ভয় দেখিয়েছেন, এমনকি ভূত ধরে ঘানিতে জুড়ে, তাকে নিংড়ে তেল পর্যন্ত বের করে শিশিতে ভরেছেন।

কিন্তু ত্রৈলোকনাথ মজলিসি ভূতের গপপো লিখেই খালাস আমাদের কারবার আগেই যা বলেছি, সত্যিকারের জ্যান্ত ভূতের বাড়ি আর তেনাদের কাজকর্ম নিয়ে। বিদেশী ভূতের মতই স্বদেশী ভূতের বেলাতেও সেই ট্রাডিশন অক্ষুণ্ন রাখব এ-আশ্বাস আগেভাগেই দিয়ে রাখছি।

এলাহাবাদের জর্জ টাউনের চিন্তামণি রোডে থাকেন ডঃ ভবনাথ ঝা, নামী চিকিৎসক হিসেবেই এলাকার মানুষ চেনে তাঁকে।

তারিখটা ছিল ১৯৪৮ সালের ২৫ শে জুলাই। সকাল থেকে অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি ঝরছে, সেইসঙ্গে বইছে ঝোড়ো হাওয়া। খারাপ আবহাওয়ার জন্য স্থানীয় ব্যবসায়ীরা সকাল সকাল দোকান পাট বন্ধ করেছে অফিস বাবুরাও বাড়ি ফিরেছেন অনেক আগে ডঃ ঝা কিন্তু খারাপ আবহাওয়া নিয়ে চিন্তিত নন, ঝড় বৃষ্টির রাতেও রোগী আসাতে পারে ভেবে ঠিক সময় মতই তিনি চেম্বারে এসেছেন।

ডঃ ঝার চেম্বারের পাশেই ওষুধের দোকান ঝা ক্লিনিক। কম্পাউণ্ডার ছোকরাটির বাড়ি দূরে তাই রোগী নেই দেখে তাকে অনেকক্ষণ আগেই ছুটি দিয়েছে ডঃ ঝা। চেম্বারের বাইরে তাঁর বয়স্ক কাজের লোক নন্দলাল টুলে বসে ঢুলছে। নন্দলালের সামনের ছোট টুলের ওপর কলম আর সাদা প্যাড, রোগী এলে তাদের নাম সেই প্যাডের কাগজে লিখে ভেতরে ডাক্তার সাহেবের সামনে রেখে আসে সে।

চেম্বার খোলার পরে প্রায় দুঘন্টা একভাবে কেটে গেছে, এর মধ্যে একজন রোগীও আসেনি, ভেতরে বসে মেডিক্যাল জার্নাল আর বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানির লিটারেচার পড়তে ডঃ-ঝার একঘেয়ে লাগছে এমনসময় তাঁর কানে এল বাইরে নন্দলাল যেন কথা বলছে কার

সঙ্গে। কান খাড়া করতে ডঃ ঝা শুনলেন নন্দলাল বলছে "এই ঝড়বৃষ্টির রাতে ডাক্তার সাব কল-এ যাবেন কি করে। প্রেসক্রিপশন থাকলে দাও, ডাক্তারসাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিচ্ছি।"

"আমার নতুন কেস," বাইরের লোকটির গলা পেলেন ডঃ ঝা, "আমার মনিবের বড্ড বাড়াবাড়ি অসুখ। মহল্লায় অনেক বড় বড় ডাক্তার ওঁকে দেখেছেন কিন্তু কেউ সারাতে পারেন নি। এখন বাকি আছেন শুধু এই ডাক্তারসাব, ডঃ ঝা। আমার মনিবের গিন্নি বলেছেন উনি ছাড়া আর কোন ডাক্তার ওঁরে স্বামীকে সুস্থ করতে পারবেন না, তাই জোর করে আমায় পাঠিয়েছেন ওঁকে নিয়ে যেতে। আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি রোগী দেখার পরে ডাক্তারসাবকে গাড়িতে চাপিয়ে আবার এখানে পৌঁছে দিয়ে যাব। ডাক্তারসাব যদি চান ত আমার মনিবের গিন্নি ডবল ফি দেবেন।"

কাজের লোক নন্দলালের সঙ্গে অচেনা লোকটির কথা ডঃ ঝার কৌতূহল বাড়িয়ে দিল, তিনি তখনই চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলেন। ডঃ ঝা দেখলেন নন্দলাল যার সঙ্গে কথা বলছে সেই লোকটির বয়স যথেষ্ট হয়েছে। তার পরনে লুঙ্গি গায়ে জড়ানো হাফহাতা পাঞ্জাবির ওপর চাদর, মুখে ঘন দাড়ি গোঁফের জঙ্গল।

"সেলাম ডাক্তারসাব," ডঃ ঝাকে দেখে লোকটি সেলাম করল, "আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি, রোগী দেখা হলে আবার গাড়িতে চাপিয়ে আপনাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।"

"ঠিক আছে চলো' বলে নন্দলালকে চেম্বার বন্ধ করতে বলে ব্যাগ হাতে বাইরে দাঁড় করানো ঘোড়ায় গাড়িতে উঠে বসলেন ডঃ ঝা। লোকটি গাড়োয়ানের আসনে বসেই চাবুক মারল ঘোড়ার পিঠে। পিঠে চাবুক পড়তেই ঘোড়া দুটো ছুটল জোর কদমে।

অনেকক্ষণ পরে গাড়ি এসে থামল এক পুরোনো প্রাসাদের গাড়ি বারান্দার সামনে। গাড়োয়ান নেমে এসে দরজা খুলে দিতে ডঃ ঝা ব্যাগ হাতে নেমে এলেন। তাঁর হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে লোকটি ঢুকে পড়ল সেই প্রাসাদের ভেতর। ডঃ ঝা তার পেছন পেছন এগোতে লাগলেন। টর্চের আলোয় দেখলেন প্রাসাদের অবস্থা জীর্ণ, দেয়ালের চুনবালি খসে ভেতরের ইঁট বেরিয়ে পড়েছে, যে দিকে তাকানো যায় খালি ঝুল আর মাকড়সার জাল ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না।

গাড়োয়ানের পেছন পেছন কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন ডঃ ঝা, তাঁদের চলাফেরায় ভাঙ্গা দেয়ালের গায়ে বাসা বাঁধা চামচিকের পালের ঘুম গেল ভেঙ্গে। উড়ে এসে বারবার তারা ডানায় ঝাপটা মারতে লাগল তাঁদের চোখে মুখে। সামনের দিকে তাকাতে তাঁর মনে হল পথপ্রদর্শক গাড়োয়ানের বয়স হলেও দম আছে প্রচুর, তাঁকে পেছনে ফেলে ঝড়ের গতিতে উড়ে যাবার মত হাঁটছে সে হাঁটার গতি বাড়িয়েও তার নাগাল পাচ্ছেন না তিনি।

অনেকক্ষণ পরে লোকটি তাঁকে নিয়ে এল দোতলার বারান্দায়, সামনে বিশাল কামরায় দরজায় ঝুলছে বড় পর্দা সেই পর্দার বাইরে দাঁড়িয়ে গলা চড়িয়ে ডাক্তার সাব এসে গেছেন বলতেই পর্দার ওপাশ থেকে মিহিগলার কে যেন সাড়া দিল। শুনে গাড়োয়ান পর্দার একপাশ সরিয়ে বলল, যান ডাক্তারসাব, ভেতরে যান, আপনার রোগী ভেতরে আছেন। যাকে আপনি দেখতে এসেছেন তিনি আমার মনিব, এই প্রাসাদের মালিক।"

গাড়োয়ানের হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে ডঃ ঝা ভেতরে ঢুকলেন। ঢুকতেই একটা চাপা ভ্যাপসা গন্ধ তাঁর নাকে এল, ঠিক দুর্গন্ধ নয়, এ গন্ধ অস্বাভাবিক, বা অপ্রাকৃতিক। ডঃ ঝা দেখলেন বিশাল ঘরের ভেতর জ্বলছে দুটি বড় কেরোসিনের ল্যাম্প। ঘরের মেঝেতে পাতা মখমলের নরম গালিচা, এককোণে সুদৃশ্য কাজকরা সাবেকি আমলের মেহগনি কাঠের খাট, সেই খাটে চোখ বুঁজে শুয়ে আছেন এক কংকালসার পুরুষ। তাঁর চামড়ার রং ফ্যাকাশে হলদে। তাঁর পায়ের কাছে বসে দামি সবুজ রংয়ের বেনাবসী পরা এক ভদ্রমহিলা, মাথায় ঘোমটা অনেকটা টেনে নামানোর দরুন তাঁর মুখখানা দেখা যাচ্ছে না। ভদ্রমহিলার দু'হাতে আর বাহুতে হীরে বসানো সোনার বালা ল্যাম্পের ম্লান আলোর চকচক কবছে।

"রানিজী, ডাক্তার সাব এসেছেন," বাইরে থেকে গাড়োয়ানের গলা ভেসে এল। শুনেই সেই মহিলা চটপট থেকে খাট থেকে নেমে একপাশে সরে দাঁড়ালেন। ডঃ ঝা এগিয়ে এসে হাতের ব্যাগ খাটের ধারে রাখলেন। তারপর অভ্যস্ত হাতে রোগীর নাড়ি দেখলেন। কয়েকটি মুহূর্ত। রোগীর কংকালসার হাতখানা নামিয়ে রেখে পকেট থেকে পেনসিল টর্চ বের কবলেন তিনি। রোগীর চোখের পাতা উল্টে টর্চের আলো ফেললেন চোখেব মণিতে। তারপর টর্চ নিভিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন ভদ্রমহিলার দিকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডঃ ঝা বললেন, "আমি দুঃখিত অনেকক্ষণ আগেই এর মৃত্যু হয়েছে ইনি আর বেঁচে নেই?"

"বেঁচে নেই?" চাপাগলায় আর্তনাদ করে উঠলেন ভদ্রমহিলা, মৃত পুরুষের বুকের ওপর আছড়ে পড়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

ডঃ ঝা টর্চ পকেটে রাখলেন। ব্যাগখানা তুলে নিয়ে এগোতে যাবেন এমন সময় পেছন থেকে ভদ্রমহিলা ভেজা গলায় বললেন, "ডাক্তারসাব আপনার ফি নিয়ে যান।"

"ফি!" ডঃ ঝা বললেন, "আমি ত এঁর চিকিৎসা করিনি, তাহলে শুধু শুধু ফি নেব কেন?" বলে এগোতেই যাবেন, তার আগেই সেই ভদ্রমহিলা তাঁর পথ রুখে দাঁড়ালেন। দড়ি দিয়ে মুখবাঁধা একটা ছোট রঙিন থলে তাঁর হাতে দিয়ে বললেন। "ঝড় জলের রাতে এতদূর থেকে কষ্ট করে এসেছেন, ফি আপনাকে নিতেই হবে, ডাক্তারসাব।" অপ্রস্তুত হয়ে ডঃ ঝা সেই থলি নিজের ব্যাগে রাখতেই মহিলা মাথায় ঘোমটা খুলে বললেন, "ভবনাথ, আমায় চিনতে পারছো? আমি অঞ্জলি।"

"কে?" দারুণ চমকে ডঃ ঝা তাকালেন ভদ্রমহিলার দিকে, কেরোসিনের ম্লান আলোয় মহিলাকে চিনতে তাঁর কষ্ট হল না। ডঃ ঝা দেখলেন সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর মেডিক্যাল কলেজের পুরোনো সহপাঠিনী ও একদা প্রেমিকা অঞ্জলি। তার কানে, নাকে গলায় জ্বলজ্বল করছে হীরের গয়না। কিন্তু একি করে সম্ভব? অঞ্জলির মৃতদেহ তিনি নিজের চোখে দেখেছেন। যে দৃশ্য মনে করতেই আতংকে তাঁর গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল, পায়ের তলায় মাটি ভূমিকম্পের মত কেঁপে উঠল। "অঞ্জলি! অঞ্জু!" বলে চিৎকার করে উঠেই জ্ঞান হারালেন তিনি।

জ্ঞান ফিরে আসতে ডঃ ঝা দেখলেন তিনি নিজের বাড়িতে শুয়ে আছেন, খোলা জানালা দিয়ে। সকালের রোদ ঘরে ঢুকছে। শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে তাঁর স্ত্রী মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন আর তাঁর কাজের লোক নন্দলাল গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে পায়ের কাছে, তাঁকে চোখ মেলতে দেখে তার মুখে স্বস্তির হাসি ফুটল। সঙ্গে সঙ্গে গতরাতের ঘটনা ডঃ ভবনাথ ঝার মনে পড়ে গেল তিনি জানতে চাইলেন। আমার বাড়িতে কে ফিরিয়ে নিয়ে এল?"

"ডাক্তারসাব, আপনি ভূতের খপ্পরে পড়েছিলেন," "নন্দলাল জোড়া হাত ভক্তিভরে কপালে ঠেকাল।" রামজীর অশেষ কৃপাতেই প্রাণে বেঁচেছেন। আজ ভোর বেলা এখান থেকে বহুদূরে গঙ্গার ওপারে এক ভাঙা জমিদার বাড়ির ইঁট কাঠের স্তূপে স্থানীয় লোকেরা আপনাকে বেহুঁশ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দেয়। থানায় লোকেরা আপনাকে চিনতে পেরে গাড়িতে করে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে দু'ঘন্টা আগে, রামজীর কৃপায় আপনি ভূতের হাত থেকে বেঁচেছেন!"

"কিন্তু সেই আধবুড়ো গাড়োয়ান?" ডঃ ঝা বললেন, "যে আমার তার ঘোড়ার গাড়িতে তুলে বাড়ি পৌঁছে দেবে বলেছিল?"

"হুজুর, ঐ বাড়িতে কেউ বেঁচে নেই," নন্দলাল বলল, "দারোয়ান ঝি চাকর সব মরে গেছে. যে গাড়োয়ান আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছিল সে মানুষ নয় হুজুর ভূত।"

"বেহুঁশ অবস্থায় তুমি অঞ্জলি বলে কাউকে ডাকছিলে," ডঃ ঝার স্ত্রী এতক্ষণে কথা বললেন, "অঞ্জলি কার নাম?"

"যে জমিদার বাড়িতে আমি গিয়েছিলাম সেখানকার বৌরাণির নাম অঞ্জলি," ডঃ ঝা বললেন "সে তা বহুদিন আগেই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। অ্যাই নন্দলাল, যা, একটু গরম কফি করে নিয়ে আয়।" নন্দলাল সরে যেতে স্ত্রী এসে বসলেন তাঁর পাশে, তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ডঃ ঝা বললেন, " অঞ্জলি ছিল কানপুরের এক বড় ব্যবসায়ীর মেয়ে, মেডিক্যাল কলেজে ও ছিল আমার ব্যাচ মেট। বলতে বাধা নেই, অঞ্জলির সঙ্গে একসময় আমার ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল, আমরা বিয়ে করার জন্য মানসিক ভাবে তৈরি হচ্ছিলাম। কিন্তু ব্যাপারটা জানতে পেরে তার বাবা বেঁকে বসেন। মেয়েকে কলেজ থেকে ছাড়িয়ে এক জমিদারের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেন। কিন্তু শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে অঞ্জলি শান্তিতে সংসার করতে পারে নি কারণ তার স্বামী ছিল মদ্যপ দুশ্চরিত্র এবং পুরুষত্বহীন। বৌকে বাড়িতে রেখে রাতের পর রাত সে বেশ্যাবাড়িতে পড়ে থাকত। বিয়ের পরেও অঞ্জলি আমায় নিয়মিত চিঠি লিখত, তার চিঠি পড়েই এসব জেনেছি। পুরোনো সম্পর্ক নতুন করে গড়ে তোলার অনুরোধ সব চিঠিতেই করত অঞ্জলি। অপদার্থ স্বামীকে ছেড়ে আমার সঙ্গে নতুন করে ঘর বাঁধতে চাইত। কিন্তু ব্যাপারটা আমাদের দেশে অত সহজ নয় তা আমি চিঠিতে ওকে বোঝানোর চেষ্ট করতাম, কাজকর্মের মধ্যে নিজেকে সবসময় ব্যস্ত রাখার কথাও বলতাম। বহুবার চিঠিতে ওর স্বামীর অক্ষমতার চিকিৎসা করানোর কথাও লিখেছি কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। কিছুদিন পরে অঞ্জলি লুকিয়ে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে জানাল শ্বশুর বাড়িতে স্বামীর অবহেলা আর অত্যাচার অসহ্য হয়ে উঠেছে তার কাছে তাকে নিয়ে কোথাও পালিয়ে যাবার জন্য সে মিনতি করল। তখনও তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি। আমি তাকে বোঝালাম যে চাইলেই এমন কাজ করা যায় না জীবনটা সিনেমা নয়। শুনে সে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে গেল, সে-রাতেই বিষ খেয়ে জীবনের জ্বালা জুড়োল। আমি তখন সরকারি হাসপাতালে কাজ করতাম। অঞ্জলির মৃতদেহ আমি নিজের চোখে দেখেছি, শ্মশানে নিজের চোখে তার মৃতদেহ চিতার আগুনে ছাই হতে দেখেছি। অঞ্জলি মারা যাবার বছরখানেক বাদে তার স্বামীর মৃত্যু সংবাদও আমার কানে

এসেছিল। ততদিনে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেছে। কিন্তু এতদিন পরে হঠাৎ ওর আত্মা কেন আমার দেখা দিল তা আমি ভেবে পাচ্ছিনা।"

"ঝড় জলের রাতে চেম্বারে পেশেন্ট ছিল না তাই পুরোনো প্রেমিকার হয়ত তেনাকে নিয়ে রসিকতা করার সাধ হয়েছিল", ডঃ ঝার স্ত্রী হালকা গলায় জবাব দিলেন। নন্দলাল গরম কফির কাপ দিয়ে গেল, তাতে চুমুক দিয়ে ডঃ ঝা বললেন, "আমার ব্যাগটা নিয়ে এসো ত।"

তাঁর স্ত্রী ব্যাগ নিয়ে এলো ডঃ ঝা সেটা তাঁর সামনে খুললেন। ভেতরে হাত ঢোকাতে হাতে ঠেকল নরম কাপড়। ডঃ ঝা এবার ব্যাগের ভেতর থেকে একাট ছোট রঙিন কাপড়ের থলে বের করলেন। থলের মুখের দড়ির ফাঁস খুলে উপুড় করতেই ভেতর থেকে পাঁচটা সোনার মোহর পড়ল বিছানায়। মোহরগুলো সযত্নে তিনি থলেতে পুড়ে আগের মত দড়ি দিয়ে মুখ বেঁধে ব্যাগে রাখলেন।

সিমলার বাংলোয় যুবতীর প্রেতাত্মা

"কি বললেন, ভূতের বাড়ি?" সিমলার সরকারি আবাসন দপ্তরের মাঝবয়সী হেড ক্লার্ক রমেশ শর্মা উর্দিপরা যুবকের মুখের পানে তাকালেন, "এই বিংশ শতাব্দীতেও আপনার মত এক সুশিক্ষিত ক্লাস ওয়ান গেজেটেড অফিসার ভূত বিশ্বাস করেন এত আমি ভাবতেই পারছিনা! জানেন, সিমলার সেরা সরকারি বাংলোটিই আপনাকে থাকার জন্য দেয়া হয়েছে?"

"সে আপনি যাই বলুন আমার পক্ষে আর ঐ ভূত বালোয় একরাতেও কাটানো সম্ভব নয়।" কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশের ৪র্থ ব্যাটালিয়নের ডেপুটি কম্যাণ্ডাণ্ট সুদর্শন সিং বললেন "বিংশ শতাব্দী বা ত্রিংশ শতাব্দী যাই হোক না কেন, ভগবান যতদিন থাকবেন ভূতেরাও ততদিন থাকবে এ আমি জানি দু'জনের কারও অস্থিত্ব সহজে দেখা যায় না, অনুভব করা যায়। সরকারি বাংলো আমায় দিয়েছেন সেখানেও ভূতের অস্তিত্ব অনুভব করেছি।"

"আপনার অনুভূতির অন্তত একটা উদাহরণ শোনাবেন?"

"নিশ্চয়ই" সুদর্শন সিং বললেন, যতক্ষণ বাংলোয় থাকি ততক্ষণ অদৃশ্য কোনও কিছু সবসময় আমার পেছন পেছন ঘোরাফেরা করে। সারাদিন আমার ফৌজের জওয়ানদের সঙ্গে ড্রিল করে আর পাহাড়ি পথে দু-মাইল মার্চ করে ফিরে এসে ক্লান্ত শরীরে শোবার পরে শুনতে পাই বাথরুমের ভেতর মেয়েমানুষের কান্নার আওয়াজ। সারারাত চলে সেই কান্না। পরশু থেকে শুরু হয়েছে নতুন উৎপাত। কান্নার আওয়াজে অতিষ্ট হয়ে আলো জ্বেলে বসে আছি এমন সময় স্পষ্ট শুনলাম যুবতীর গলা। আমায় বাঁচাও সাহেব, তুমি পুলিশের লোক, অন্যায়ের প্রতিকার করো। তাকিয়েও কাউকে চোখে পড়ল না। মনটা অন্য দিকে ঘোরাতে রাত ভর ড্রিংক করেছি, পরশু একটা কাল একটা। দুরাতে দু'বোতল রাম একা শেষ করেছি। শেষরাতে আর জেগে থাকতে পরিনি, ড্রয়িংরুমের কৌচেই ঘুমিয়ে পড়েছি। সেই আওয়াজ তখনও কানে আসছে, পুলিশ সাব মুঝে বাঁচাইয়ে! এভাবে দিনের পর দিন ড্রিংক করে রাত কাটানো সম্ভব? না মশাই ঢের হয়েছে, আর নয় যদি পারেন তা আমায় ভাল বাংলো দিন। আর নাহলে বেসরকারি বাড়ি ভাড়া করেই আমার থাকতে হবে যতদিন না পর্যন্ত আপনি আমার থাকার সুবন্দোবস্ত করছেন।

"চাইলেই ত আপনাকে নতুন বাংলো দিতে পারব না।" অসহায়ভাবে বললেন হেডক্লার্ক, "কোন অফিসার কবে রিটায়ার করে বাংলো ছাড়ছেন সে খোঁজ রাখতে হবে। তাতে কত সময় লাগবে তাও এক্ষুনি বলতে পারছিনা।"

"থাকবার উপযুক্ত জায়গা একান্তই না পেলে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাব" সুদর্শন সিং বললেন, "আগে কলেজে পড়াতাম। এখনও আমার ছাত্রের অভাব হবে না। আবার কলেজের চাকরিতে ঢুকব সেই ফাঁকে কাগজে আর্টিকল ছাপাব, লিখব। সিমলায় সরকারি আবাসন বিভাগ যেসব বাংলো কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসারদের থাকার জন্য অ্যালট করছে তাদের সবকটায় আছে ভূতের উৎপাত। এই খবর কাগজে ছেপে বেরোলে দেখব আপনি শান্তিতে কিভাবে চাকরি করেন।"

"আপনি মিছিমিছি রাগ করছেন।" চোখেমুখে অসহায় ভাব ফুটিয়ে বললেন হেডক্লার্ক শর্মা, "আপনার পছন্দমত বাংলো দেব না একথা আমি একবারও বলি নি। তবে এই মুহূর্তে আমার হাতে আপনাকে দেবার মত একটি বাংলোও খালি নেই। তাছাড়া কোন বাংলোয় ভূত এসে উৎপাত করে তা আমি কি করে জানব? এখন কিছুদিন তাহলে বেসরকারি বাড়ি ভাড়া করেই থাকুন, সরকারি বাংলো খালি হলেই আপনার নামে অ্যালট করব কথা দিচ্ছি।"

"তাহলেই আমি কৃতার্থ হব", বললেন ডেপুটি কম্যাণ্ডাণ্ট, "আচ্ছা তাহলে আমি এবার চলি। বাড়ি খোঁজার জন্য দুটো দিন ছুটি নিতে বাধ্য হলাম। কি করব ভূতের সঙ্গে আর লড়াই করা যাবে না।" বলতে বলতে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

"কি হল শর্মাজী," বলতে বলতে লাগোয়া পার্টিশন দেয়া একফালি দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন তাঁর ওপরয়ালা হাউজিং সুপারিনটেনডেন্ট পরেশনাথ কাশ্যপ। "আবার সেই ভুতুড়ে বাংলোর সমস্যা? ভূতের ভয়ে ইনিও পালালেন? এঁকে নিয়ে ক'জন হল বলতে পারেন?"

"তা স্যর আট ন'জন বটেই," শর্মাজী মুখ টিপে হাসলেন, "ঐ বাংলোয় যে ভূত আছে তা কি আমি জানি না? ভাল করেই জানি। কিন্তু কি করব সেন্ট্রাল থেকে একেক অফিসার বদলি হয়ে এসে সরকারি বাংলোর জন্য এমন ঝুলোঝুলি লাগিয়ে দেন তখন করার কিছুই থাকে না। বাংলো বানানোর কাজ সি পি ডব্লিউ ডি-র, আমার কাজ শুধু অ্যালট করে হাতে চাবি ধরিয়ে দেয়া। ওরাই যদি বছরে দুটো বড়জোর তিনটে বাংলো বানায় ত আমি অ্যালয়ট করব কি করে বলতে পারেন? কতবার পি ডব্লিউ ডিকে বলেছি ঐ বাংলোয় ওদের গুদাম নয়ত অফিস বানাতে। কিন্তু ওরা সেকথা কানেই তোলে না। ওখানে কেউ না থাকলে ভূতের কোনও ঝামেলাই হবে না বলে আমি মনে করি।"

"খুবই দুখের কথা" কাশ্যপ বললেন, "কিন্তু এদিকে যে আমি মুশকিলে পড়েছি।"

"আপনার মুশকিল?" শর্মাজী বললেন, "ব্যাপার কি স্যার যদি খুলে বলেন ত আমি সাধ্যমত সাহায্যের চেষ্টা করি।"

"আজই সকালে আবাসন মন্ত্রি আমার বাড়িতে ফোন করেছিলেন" পরেশনাথ কাশ্যপ বললেন, "ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের একজন সুপারিণটেনডেন্ট আজই দিল্লি থেকে আসছেন। ভদ্রলোকের নাম আফজল বেগ, ওঁর থাকার জন্য ভাল বাংলোর ব্যবস্থা ইমডিয়েটলি করতে হবে, শর্মাজী, অ্যাণ্ড দ্যাটস অ্যান অর্ডার।"

"আমি হুকুমের গোলাম স্যর," শর্মাজী অসহায় গলার বললেন, তবে এই মুহূর্তে থাকার মত বাংলো একটিই আছে, আর সে হল ঐ হন্টেড ইয়ে ভুতুড়ে বাংলো। সি আর পি-র ডেপুটি কম্যাণ্ডান্ট বাংলোর চাবি আমায় দিয়ে গেলেই আমি সেটা ঐ অফিসারের হাতে দিতে পারব। ততক্ষণ ওঁকে কষ্ট করে হোটেল বা অন্য কোথাও থেকে যেতেই হচ্ছে, স্যার।"

"তাহলে ঐ বাংলো অ্যালট করার জন্য আপনি তৈরি শর্মাজী?" কাশ্যপের কথা শেষ হতে না হতে তাঁর কামরার টেলিফোন বেজে উঠল পড়ি কি মরি করে তিনি ভেতরে গিয়ে রিসিভার তুললেন। খানিক বাদে ফিরে এসে বললেন, "দ্যাট জেন্টেলম্যান, আই মিন মিঃ বেগ এসে গেছেন। "হাউজিং। মিনিস্টারের পি এ বললেন, "উনি ওবেরায় সিমলাতে উঠেছেন, বাংলো খালি না হওয়া পর্যন্ত ওখানেই থাকবেন। এবার তাহলে সি আর পি ব্যারাকে একবার ফোন করুন, শর্মাজী ডেপুটি কম্যাণ্ডান্ট সুদর্শন সিং-এর সঙ্গে কথা বলুন, দেখুন উনি আজ লেটেস্ট আগামিকালের মধ্যে বাংলো ছেড়ে দিতে পারবেন কিনা! মিনিস্টারের পি এ বললেন, "যে ভাবেই হোক মিঃ বেগের থাকার ব্যবস্থা জলদি করে দিতেই হবে।"

রাত সাড়ে এগারোটা। আইবি-র স্পেশ্যাল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আফজল বেগ লিখতে লিখতে কলম নামিয়ে রাখলেন। বর্ডারে স্মাগলিং ও গুপ্তচর বৃত্তি দমন করার এক বিশেষ ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক তাঁকে সিমলায় পাঠিয়েছে। তিনদিন হল তিনি এসেছেন এখানে। পরশুদিন দুপুরে মালপত্র নিয়ে উঠেছেন এই বাংলোয়। রাজ্যের মন্ত্রির একান্ত সচিবের মুখ থেকে শুনেছেন এই বাংলো নাকি হন্টেড। আগে এখানে যারা ছিলেন তাঁরা সবাই ভূতের উৎপাতে পালিয়েছেন। ভূতের উৎপাত বলতে যা বোঝায় তিনি এখানে আসার পর তা অবশ্য এখনও শুরু হয় নি। তবে পরপর গত দু'রাত বাথরুমের দিক থেকে যুবতীর গলায় কান্নার আওয়াজ তাঁর কানে এসেছে। শুধু তাই নয় খেয়ে দেয়ে রাতে শোবার পরে বারবার তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেছে কারও গলায় আওয়াজে। কে যেন শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে তাঁকে বারবার বলছে, সাব মুঝে থোড়া মদত কিজিয়ে। যুবতীর গলায় সেই আওয়াজে বারবার তাঁর ঘুম গেছে ভেঙে। ঘুম চোখে যতবার ঘাড় তুলে তাকিয়েছেন ততবারই মনে হয়েছে শিয়রের কাছে কিছু একটা দাঁড়িয়ে। না মানুষ নয়, ছায়ার মত কোনও অস্তিত্ব। বালিশের নিচে গুলিভরা রিভলভার নিয়ে শোয়া তাঁর বরাবরের অভ্যাস কিন্তু ক্লান্ত হাত বালিশের নিচে ঢোকানোর আগেই ঘুমের অতলে তলিয়ে গেছেন তিনি।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে আফজল বেগ অনুভব করছেন ঘরের ভেতর তিনি একা নন। আরও কেউ আছে আশেপাশে যার অস্তিত্ব অনুভব করা গেলেও দেখা যাচ্ছেনা।

টেবলল্যাম্পের তেল কমে এসেছে, আর খুব বেশিক্ষণ জ্বলবে বলে মনে হচ্ছে না। কাছেই একটা বড় ট্রান্সফর্মার বসানো হচ্ছে তাই আশেপাশের বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে সাময়িকভাবে।

"সাব মুঝে থোড়া মদত কিজিয়ে।' আচমকা গলাটা কানে যেতে চমকে উঠলেন আফজল বেগ। সেই এক গলা, এক বক্তব্য পরপর গত দু'রাত যা তাঁর কানে এসেছে। গত দু'দিনই পুলিস ক্লাবে সামান্য মদ্যপান করেছিলেন তাই নেশার ঘোরে হয়ত কিছু কল্পনা করে থাকতে

পারেন। কিন্তু আজ? আজ ত একফোঁটা অ্যালকোহলও খাননি তিনি, অফিস থেকে সোজা বাংলোয় ফিরেছেন। ফেরার পথে রাতের খাবার কিনে এনেছেন হোটেলে থেকে। লেখাটা শেষ করে আর খানিক বাদেই খাবার গরম করে খেয়ে শুয়ে পড়বেন। কাল সকাল সাড়ে সাতটা নগাদ বি এস এফ-এর জিপ আসবে তাঁকে নিতে, বর্ডারে পৌঁছে ব্রেকফাস্ট করবেন। সকাল পাঁচটা নাগাদ উঠে মর্ণিং টি তৈরি করতে হবে তাই আজ বেশি রাত পর্যন্ত জাগলে চলবেনা।

"......মুঝে থোড়া মদত কিজিয়ে পুলিশ সাব," আবার যুবতীর কণ্ঠে সেই আকুতি স্পষ্ট শুনতে পেলেন আফজল বেগ, আবছা আলো আঁধারিতে একা৮ ছায়াময় অস্তিত্ব দেখলো, ওপাশে তাঁর চোখে পড়ল। লোডেড রিভলভার চামড়ার খাপে ভরে ওপরের ড্রয়ারে রেখেছেন আফজল বেগ, দিল্লিতে হেডকোয়ার্টারে নিজের চেম্বারে বসে কাজ করার সময়েও তাই থাকে। টেনে ড্রয়ার খুলতেই কানে এল খিলখিল হাসি।

"এত বড় পুলিশ অফিসার হয়ে আপনি আমার মত এক হতভাগিনীর প্রেতাত্মার ওপর গুলি চালাবেন বেগ সাব?" হাসির ফাঁকে ছুঁড়ে দেয়া কথাগুলো ধারালো ফলার মত আঘাত হানল তাঁর অহমিকায়। "তবে যে শুনেছিলাম আপনি ইণ্ডিয়ার এক সেরা ডিকেটটিভ? আপনি ডিপার্টমেন্টের গৌরব? আমি শুধু বিচার চাইতে এসেছি। আপনার আগে আরও কত বড় বড় নামী পুলিশ অফিসার এসেছেন এখানে তাঁদের কাছেও একই ভিক্ষে চেয়েছি। কিন্তু তাঁরা আমার কথা শুনে ভয় পেয়েছেন। রাতাবাতি বাংলো ছেড়ে পালিয়েছেন।"

লজ্জায় পড়লেন দুঁদে আই বি অফিসার। সত্যিই ত, একটি যুবতীর প্রেতাত্মার দিকে কোন যুক্তিতে গুলি ছুঁড়তে যাচ্ছিলেন তিনি? ড্রয়ার থেকে হাত উঠিয়ে স্থির হয়ে বসলেন আফজল বেগ, কিছুক্ষণ একদৃষ্টে সেই ছায়াময়ীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেশ, আমি শুনব তোমার কথা। কিন্তু আগে তোমার পরিচয় দাও, বেঁচে থাকতে কি নাম তোমার ছিল, বলো। আর কি মদত তুমি চাও আমার কাছে তাও বলো।'

'আমার নাম ছিল গৌরি। সার, শুধু গৌরি। ধৈর্য ধরে আমার কাহিনী আগে শুনুন, তাহলেই বুঝবেন আমি কি মদত চাইতে ছুটে এসেছি আপনার কাছে।'

সামনে রাখা সাদা প্যাডে পেনসিল দিয়ে আফজল বেগ প্রেতাত্মার নাম লিখলেন গৌরি, জানতে চাইলেন, 'তোমার বাবার নাম কি ছিল?'

'বাবার নাম জানি না, সাব,' প্রেতাত্মা বলল, 'আমার মা গুলাবি ছিল সিমলার এক খানদানি পতিতা, আমি বেশ্যামায়ের একমাত্র মেয়ে।'

কাগজে মায়ের নাম লিখলেন আফজন বেগ ; গুলাবি, তারপর বললেন, 'এবার বলো তোমার কাহিণী।'

'নিশ্চয়ই বলব বেগ সাব' গৌরির প্রেতাত্মা বলল, 'কিন্তু রাত অনেক হয়েছে, আপনি এবার খেয়ে নিন। আমি ততক্ষণ এখানেই অপেক্ষা করছি।'

চশমা খুলে রেখে আফজল বেগ চেয়ার ছেড়ে উঠলেন, স্টাডি থেকে বেরিয়ে ঢুকলেন কিচেনে। দোকান থেকে কেনা খাবার তখনও গরম ছিল। চটপট তাই খেয়ে ফিরে এলেন স্টাডিতে। ল্যাম্পটা নিয়ে আবার ফিরে গেলেন কিচেনে, কেরোসিন ভরে ফিরে এলেন। ইচ্ছে করেই আলো অনেকটা কমিয়ে দিলেন। ঘরের ভেতর আলো আঁধারি তৈরি হতে ডাকলেন, 'গৌরি!'

'জি সাব।'

'আমি খেয়ে এসেছি, এবার শুরু করো তোমার বক্তব্য। 'আচ্ছা, তোমার মা তোমায় লেখাপড়া কিছু শিখিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, সাব,' টেবলের ওপাশ থেকে যুবতীর গলা ভেসে এল, ' নিজের কাছে রাখলে পাছে স্বভাব খারাপ হয় এই ভেবে মা আমায় খুব ছোটবেলায় সিমলার এক কনভেন্টে ভর্তি করেছিলেন। মাসে একবার মা আমায় দেখতে যেতেন। সেখানে গিয়ে হোস্টেলের খরচ দিয়ে আসতেন। ঐ হোস্টেলে থেকে আমি সিনিয়র কেমব্রিজ পাশ করেছিলাম।'

'তারপর কলেজে ভর্তি হও নি?'

'নেহি সাব, আমার মা আমায় মেডিক্যাল কলেজে পড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সে আশা আমি পূর্ণ করতে পারি নি। পরে বুঝেছি সেদিন মার ইচ্ছে মতন ডাক্তারি পড়লে আমার পরিণতি এত দুর্ভাগ্যজনক হত না।'

ছায়াময়ীর বক্তব্যের প্রত্যেকটি শব্দ লিখে নিচ্ছেন আফজল বেগ, প্রত্যেকটি শব্দ স্পষ্ট ভেসে আসছে কানে। টেবলের একপাশ পুঞ্জ পুঞ্জ আধার জমে তৈরি হয়েছে এক আবছা রহস্যে-মোড়া অবয়ব, কথাগুলো ভেসে আসছে সেখান থেকে।

'সিনিয়র কেমব্রিজ পাশ করার পরে কনভেন্ট ছেড়ে চলে এলাম মার কাছে। মায়ের যৌবন তখনও যায় নি। এখানকার সরকারি মহলের অনেক মন্ত্রি আর পলিটিক্যাল লিডার নিয়মিত আসা যাওয়া করত মার কাছে। ওঁদের ধরাধরি করে এখানকার একটা ছোট মিশনারি স্কুলে মা আমায় একটা চাকরি জুটিয়ে দিলেন। শিক্ষিকা নয়, স্কুলের অফিসে কেরাণির কাজ। তারপরেই শোনালেন তাঁর নিষ্ঠুর আদেশ, গৌরি, তোমার হোস্টেলে থাকতে হবে, এখানে বাইরের লোক যারা আসে আমি চাই না তাদের নজর তোমার ওপর পড়ুক।'

"কিন্তু মা", আমি বললাম, "ছোটবেলা থেকেই ত দূরে রেখে আমায় মানুষ করেছো। এবার তোমার কাছে আমায় থাকতে দাও।"

"বোকার মত কথা বোল না!" মা এক ধমকে আমায় থামিয়ে দিলেন, "আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে একবার তাকিয়েছো?"

"তোমার বয়সে আমায় যেমন দেখতে ছিল অবিকল তেমনই দেখতে হয়েছো তুমি। তোমায় দেখে আমার ভয় হয়। এখানে আমার কাছে রাখলে ক্ষমতালোভী পিশাচদের হাত থেকে তোমায় বাঁচাতে পারব না। তাই তোমায় হোস্টেলে থাকতে বলছি। তুমি ভেবো না তোমার হোস্টেলের খরচ আমিই জোগাব। এতদিন যা কিছু রোজগার করেছি সব তু তোমারই জন্য তোলা থাকবে। এরপর আমি বেঁচে থাকতে থাকতে তোমার বিয়ের ব্যবস্থাও করতে হবে। তুমি ভদ্রলোকের ছেলেকে বিয়ে করে ঘর সংসার করছ দেখলে আমি শান্তিতে মরতে পারব।"

"আমায় চাকরিতে ঢুকিয়ে দ্বিতীয়বার মা আমায় নিজের কাছ থেকে তাড়ালেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ধারে কাছে মেয়েদের কোনও হোস্টেল পেলাম না। শেষকালে মা এই বাড়িতে আমার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। সিমলার এক ধনী আপেল ব্যবসায়ী এ-বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন। তিনি মার কাছে এক সময় নিয়মিত যাওয়া আসা করতেন। অনেক টাকা উজাড় করে দিয়েছেন তিনি আমার মায়ের পায়ে, গড়িয়ে দিয়েছেন অনেক গয়না। এ বাড়িও তিনিই মাকে উপহার দিয়েছিলেন।

মার কাছ থেকে আলাদা হয়ে এই বাড়িতে জীবন কাটাতে লাগলাম। সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে স্কুলে যাই, দুপুরে বাইরেই খাই। সন্ধের পরে বাড়ি ফিরে রান্না করি।

নিজেকে নিয়ে ঘর সংসার মন্দ চলছিল না। কিন্তু এভাবে কোনও নারী বা পুরুষের দিন কাটে না। এক ছুটির দিনে রেসকোর্সে ঘোড়দৌড় দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে ফিলিপ চৌহান নামে এক দেশি ক্রিশ্চান যুবক গায়ে পড়ে আলাপ করল আমার সঙ্গে। চেহারা, কথাবার্তা, সব দিক থেকেই তাকে ভদ্র মনে হল। শুনলাম সে সিমলায় সরকারি চাকরি করে। ফিলিপের মুখ থেকে জানলাম তার বাবা ব্যবসায়ী, তিনি বোম্বেতে থাকেন। ফিলিপ নিজেও আগে তার বাবার ব্যবসার কাজকর্ম দেখাশোনা করত কিন্তু ব্যবসা চালানোর ব্যাপারে মতভেদ হওয়ায় সে সরকারি চাকরি নিয়ে চলে এসেছে সিমলায়। কেন জানি না, ফিলিপকে আমারও খুব মনে ধরল। নিজের অজান্তেই তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা শুরু করলাম। ছোটবেলা থেকে একা একভাবে কাটানো নিঃসঙ্গ জীবন ততদিনে আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। বলতে লজ্জা নেই, একজন পুরুষসঙ্গির জন্য আমি তখন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছি। মোটামুটি ভাল রোজগার কবি তাই বিয়ে করে সংসার পাতার রঙিণ স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়ি মাঝে মাঝে।

বিয়ের ইচ্ছা হাবেভাবে আমি ফিলিপকে বুঝিয়ে দিতাম। সে শুনে শুধু মুখ টিপে হাসত। পরিচয় হবার পাঁচ ছ'মাস পরে ফিলিপ একদিন বলল আমার বিয়ে করার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সে বাড়িতে চিঠি লিখেছিল। কিন্তু তার বাবা উত্তরে জানিয়েছেন এ বিয়েতে তাঁর মত নেই। মত না থাকার কারণ ফিলিপ আমায় না বললেও সেটা যে ধর্মীয় বাধা তা বুঝতে বাকি রইল না। আমি তখনই জানতে চাইলাম বাবার আপত্তি সত্ত্বেও সে আমার বিয়ে করতে রাজি আছে কিনা। রাজি থাকলে বিয়ের জন্য মানসিক ভাবে তৈরি হোক, নয়ত এভাবে তার সঙ্গে আমি আর মেলমেশা করতে পারব না। আমাব কথা শুনে ফিলিপ স্পেশ্যাল ম্যারেজের একটা ছাপানো ফর্ম বের করে দেখাল। বলল ধর্মীয় বিভেদ থাকায় স্পেশ্যাল ম্যারেজ আইনে আমাদের বিয়ে হতে পারে। তবে বিয়েটা হবে দিল্লিতে।

'ফিলিপের সঙ্গে মেলমেশার কথা তোমার মা জানতেন?' আফজল বেগ প্রশ্ন করলেন।

'জানতেন' গৌরির প্রেতাত্মা জানাল, 'বোম্বের জাভেরি বাজারে ফিলিপের বাবা অ্যালবার্ট চৌহানের ইমিটেশন জুয়েলারি আর নিকেল প্লেটিং-এর কারবার আছে জেনে মা খুব খুশি হয়েছিলেন। অ্যালবার্ট চৌহান কোটি কোটি টাকার মালিক তা মা খোঁজ নিয়ে জেনেছিলেন। ফিলিপের সঙ্গে দেখা হলেই মা বলতেন। হেলথ ডিপার্টমেন্টের কেরাণির চাকরি করে জীবনে কি করতে পারবে? আমি বলি তুমি গৌরিকে বিয়ে করে চাকরিতে ইস্তফা দাও তারপর বোম্বেতে ফিরে গিয়ে বাবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজেদের কারবারে নতুন করে নামো।' বেশ বুঝতে পারতাম চৌহান পরিবারের ঐশ্বর্যের খনিতে মা আমায় ঢোকাতে চাইছেন। কিন্তু চৌহান পরিবারের ঐশ্বর্যের সেই খনিতে যে মা আমায় জন্য কবরও খুঁড়ে চলেছেন তা তখনও টের পাইনি, পেলাম আরও কিছু দিন পরে।'

'এক মিনিট,' আফজল বেগ প্যাডে লিখলেন, 'ফিলিপ চৌহান এখানকার হেলথ ডিপার্টমেন্টে কেরাণি ছিল, তাই না?'

'জি, সাব,' গৌরির প্রেতাত্মা বলতে লাগল, 'এরপর কিছুদিন ফিলিপের খোঁজখবর পেলাম না। খোঁজ নিয়ে জানলাম সে অফিসেও যাচ্ছে না। শরীর খারাপ হয়েছে ভেবে একদিন সন্ধ্যের পর নিজেই গেলাম তার ভাড়া বাড়িতে। গিয়ে দেখি ফিলিপ বিছানায় শুয়ে আপন মনে কি ভাবছে, তার কপালে ফুটে উঠেছে দুশ্চিন্তার রেখা।'

'কি হল তোমার,' জানতে চাইলাম, 'খোঁজখবর নেই, অফিসেও যাচ্ছ না শুনলাম।'

'বাবার টেলিগ্রাম পেয়েছি তিন চারদিন আগে,' ফিলিপ বলল, 'বাবা লিখেছেন শরীর ভীষণ খারাপ এক্ষুণি এসে দেখা করো। তুমি বসো গৌরি, আমি স্নান সেরে আসছি,' বলে আমায় বসিয়ে বাথরুমে ঢুকল সে।

ওর কথা শুনে সন্দেহ হল, বাবার শরীর সত্যিই খুব খারাপ হলে টেলিগ্রাম পাবার তিন চারদিন পরেও ত তাঁকে দেখতে যায় নি কেন। একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকত ফিলিপ। খাওয়াদাওয়া করত হোটেলে। টেলিগ্রামখানা খুঁজতে আমি ওর ঘরের কাগজপত্র হাতড়াতে লাগলাম। হঠাৎ চোখ পড়ল বিছানার দিকে। দেখলাম মাথার বালিশের নিচ থেকে একখানি কাগজ বেরিয়ে আছে, টেনে আনতে বেরোল একখানা টেলিগ্রাম, পাঠিয়েছেন অ্যালবার্ট চৌহান তাঁর ছেলে ফিলিপকে। টেলিগ্রামের বয়ান এরকম—'তোমার ছেলের বড্ড বাড়াবাড়ি অসুখ, শীগগির চলে এসো। বাবা।

টেলিগ্রামের বয়ান পরে আমি ত অবাক। ঠিক তখনই স্নান সেরে ফিরে এল ফিলিপ, আমার হাতে ধরা কাগজখানার দিকে চোখ পড়তে বলল, 'যাক, খুঁজে খুঁজে বের করেছো? কি লেখা আছে তাও নিশ্চয়ই এতক্ষণে পড়ে ফেলেছো।'

'তা জেনেছি ঠিকই,' আমি বললাম, 'কিন্তু তুমি যে বিবাহিত বাড়িতে তোমার বৌ বাচ্চা আছে তা আমার কাছে এতদিন চেপে রেখেছিলে কেন? কেন মিথ্যে প্রেম ভালবাসার অভিনয় করে আমার জীবন নষ্ট করলে? এর পরে জেনেশুনে ত তোমায় বিয়ে করতে পারব না। এখন আমি কি করব তাই বলো।

'মানছি আমি যা করেছি তা সমাজের চোখে অন্যায়,' ফিলিপ বলল, 'কিন্তু বিশ্বাস করো গৌরি, বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও আমি আজও তোমায় ভালবাসি। প্রথম যেদিন পরিচয় হয়েছিল সেদিন ভালবাসার যে চোখে তোমার দেখেছিলাম সে চোখে আজও দেখছি। কথা দিচ্ছি আমি তোমায় কোনদিনও ত্যাগ করব না, তুমি কুকুরের মত দূর দূর করে আমার তাড়িয়ে দিলেও আমি বারবার ঘুরে ফিরে আসব তোমারই কাছে।' কাল সকালের ট্রেনে আমি বোম্বে যাচ্ছি ফিরে এসে স্কুলে তোমার ফোন করব। আমার ফোন পেলে তুমি আগের মত কথা বলবে ত গৌরি না কি ঘেন্নায় রিসিভার নামিয়ে রাখবে?"

"ফিলিপ," সব হারিয়েও আমি সেই বিশ্বসঘাতকটাকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরলাম, তার কানের কাছে মুখ এনে বললাম, 'যে সর্বনাশ তুমি আমার করেছো কোন কিছুতেই তার প্রতিবিধান হয় না, তবু আজও আমি তোমায় ভালবাসি। বলো তুমি আমার ভুলবে না ত?'

"নাগো।" আমার ঠোঁটে ঠোঁট রেখে ফিলিপ বলল, "আমি মরে গেলও তোমায় ভুলতে পারব না।"

কথামত ফিলিপ পরদিন ট্রেনে চেপে বোম্বে রওনা হল। তিন মাস বাদে আমার স্কুলে একদিন লাঞ্চের পরে ফোন করল সে। রিসিভার তুলতেই শুনলাম তার গলা, "হেলো, গৌরি, আমি ফিলিপ বলছি. গতকাল রাতে ফিরেছি তোমার বিশেষ দরকার অনেক কথা বলার আছে।"

"তোমার বেটা বাচ্চা, এরা সবাই ভাল আছে ত?" খোঁচা দেবার লোভটা সামলাতে পারলাম না। "সবাই ভাল আছে গৌরি। এক কাজ করো আজ সন্ধ্যের পরে আমার ওখানে চলে এসো। আমি অফিস থেকে সোজা বাড়ি চলে যাব। বলো আসবে ত?"

'যাকে একদিন না দেখলে অস্থির হতাম টানা তিন মাস তাকে না দেখলে মনের অবস্থা কি হয় আশা করি বুঝবেন। অনেক কথা বলার সাধ ছিল। কিন্তু মন যেখানে ভেঙ্গে গেছে সেখানে ওসব কথা হাজার চেষ্টা করলেও মুখে আসে না। সংক্ষেপে আসব বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলাম। ফিলিপের সঙ্গে দেখা করা তখন বিশেষ দরকার কারণ আমার সততার সুযোগ নিয়ে আগেই সে আমার কৌমার্য হরণ করেছিল, তার ফল ততদিনে ফলতে শুরু করেছে, আমার দেহে আসন্ন মাতৃত্বের লক্ষণ ফুটে উঠেছে।

'ফিলিপ, আমার সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নিলে জানতে পারি।' সন্ধ্যের পরে তার বাড়িতে গিয়ে প্রথমেই এই প্রশ্ন করলাম।

'সিদ্ধান্ত আর নতুন করে কি নেবার আছে,' ফিলিপ বলল, 'এবার বোম্বে যেতে বাবা বললেন তিনি আমাদের মেলামেশার কথা সব জানেন, এমন কি আমরা যে বিয়ে করতে যাচ্ছি তাও। বাবা সোজা বললেন, তোমার সঙ্গে সব সম্পর্ক আমায় ত্যাগ করতে হবে, নয়ত কোটি টাকার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি থেকে তিনি আমার বঞ্চিত করবেন, আমায় ত্যাজ্যপুত্র করেছেন বলে সব খবরের কাগজে নোটিস ছাপিয়ে দেবেন। আমার প্রাপ্য যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি লিখে দেবেন আমার বৌ বাচ্চার নামে। বুঝতেই পারছো এরপর তোমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা আমার পক্ষে হবে নিদারুণ বোকামি।'

'বা ঃ! চমৎকার পিতৃভক্তি!' আমি বললাম, "আর আমার যে চরম সর্বনাশ করলে তার ক্ষতিপূরণ কে দেবে? তোমার বাচ্চা এসেছে আমার পেটে তার কি হবে?"

"পেটের বাচ্চার জন্য একা আমায় দাবি করলে ত মানব না, গৌরি," ফিলিপ বলল, "তোমার নিজের সায় না থাকলে এই কাজ আমার একার পক্ষে করা কখনও সম্ভব হত না। পেটে বাচ্চা এসেছে তা নিয়ে এত ভাবনার কি আছে? আমার চেনাশোনা ক্লিনিকে তোমায় নিয়ে যাব সেখানে ডাক্তার তোমার অপারেশন করিয়ে দেবেন। কোনও ঝুঁকি নেই সামান্য অপারেশন, একদিন ছুটি নিলেই হবে, পরদিন খালি পেটে বাড়ি ফিরতে পারবে। অপকম্মো যখন করেছি, তখন তা খসানোর সব খরচ আমিই দেব। মন স্থির করে যে দিন বলবে সে দিনই তোমায় ঐ ক্লিনিকে নিয়ে যাব।"

"না!" গলার জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম, "আমার বাচ্চার অ্যাবরশন করাতে দেব না!"

"বোকার মত কথা বল না।" ফিলিপ ঠাণ্ডা গালার বলল, "বেশ ত, অ্যাবরশন করাতে না চাও কর না কিন্তু আমার কাছ থেকে কিছু টাকা ত নিতে পার। আমি তোমার ক্ষতিপূরণ বাবদ পঞ্চাশ হাজার টাকা দেব।' বলে চেকবই বের করে পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক লিখল ফিলিপ।

'টাকা পয়সার কথা পরে হবে ফিলিপ,' আমি বললাম, "কিন্তু আমাদের মেলামেশার কথা তোমার বাবা জানলেন কি করে ; কে ওঁর কানে এসব তুলল?"

"জানতে চাও?" আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসল ফিলিপ। "দুঃখ পাবে জেনেও বলছি, এসব খবর আমার বাবাকে জানিয়েছেন তোমার মা গুলাবি দেবী।"

"আমার মা!" ফিলিপের কথা শুনে চমকে উঠলাম, সঙ্গে সঙ্গে রুখে দাঁড়িয়ে বললাম, "তুমি যে মিথ্যে বলছ না তার প্রমাণ কি? নিজের বৌ বাচ্চা থাকতেও যে সেকথা চেপে গিয়ে আমার সঙ্গে এতদিন প্রেমের খেলা খেলেছে সে যে আমার মায়ের নামে মিথ্যে বদনাম দিচ্ছে না তা বিশ্বাস করব কি করে?"

"প্রমাণ আমি সঙ্গে নিয়েই এসেছি," বলতে বলতে ফিলিপ পকেট থেকে দুটো ইনল্যাণ্ড লেটার বের করে আমায় দেখাল। তার ঘাড়ের ওপর থেকে ঝুঁকে চিঠি দুটো দেখলাম, মা-র হাতের লেখা চিনতে কষ্ট হল না। দুটো চিঠির একটা লেখা ফিলিপের বাবা অ্যালবার্ট চৌহানকে, অন্যটা ফিলিপের স্ত্রী ললিতা চৌহানকে। দুটো চিঠিতেই ফিলিপের বাবার ঝাভেরি বাজারের দোকানের ঠিকানা, চিঠি দুটোর বিষয়বস্তু পড়ে আমার মাথা গরম হয়ে উঠল। তাঁর ছেলে আমার প্রেমে পড়েছে, তার বিস্তারিত বিবরণ মা লিখেছেন ফিলিপের বাবাকে। ফিলিপের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে আপত্তি নেই তাও উল্লেখ করেছেন আমার মা। ফিলিপের স্ত্রী এবং একটি ছেলে আছে জেনেও তিনি তাকে জামাই করতে চান তাও উল্লেখ করেছেন। অবশেষে নির্লজ্জের মত কিছু দাবি করেছেন তাঁর কাছে যা তাঁর ভাষায় কন্যা পণ। দ্বিতীয় চিঠিতে ফিলিপের স্ত্রী ললিতাকে মা লিখেছেন সে যেন তার সতীন হিসেবে আমায় হাসি মুখে মেনে নেয়। দেশের আইনকানুন যতই পাল্টাক, পুরুষ মানুষ ইচ্ছে করলে দুটো কেন, দশটা বিয়েও করতে পারে তা ফিলিপের স্ত্রীকে মা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন ইনিয়ে বিনিয়ে। পড়ে আমার পায়ের নিচের মাটি সরে গেল।

কি হল গৌরি, নিজের মায়ের হাতের লেখা চিনতে নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে না?' ফিলিপ বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বলল, 'স্বীকার করছি নিজের বৌ-বাচ্চার কথা লুকিয়ে আমি তোমার সঙ্গে দিনের পর দিন প্রেম ভালবাসার অভিনয় করেছি, কিন্তু তোমার মা একি করল? গৌরি, তোমার মা তওয়াইফ, পতিতা, তা জেনেও আমি তোমায় বিয়ে করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তোমার মা আমার বাবার কাছে কন্যাপণ বাবদ টাকা চাইতে গেলেন কেন? এতে কি ওঁর সম্মান বাড়ল? তোমার মা'র পেশা কি, আমার বাবা কিন্তু ঠিক খুঁজে বের করেছেন, আর ওঁর আসল আপত্তি সেখানেই। যাক, যা হবার হয়েছে, হয়ত এসব ভালর জন্যই হয়েছে. আমার কথা শোন, পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক দিচ্ছি, ওটা ভাঙ্গিয়ে টাকাটা ব্যাংক থেকে তুলে নাও, তারপর পেট খালাশ করিয়ে নিশ্চিন্ত হও। তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না। আমি চাকরিতে জবাব দিয়ে শীগগিরই বোম্বে ফিরে যাচ্ছি, বেশ বুঝতে পারছি বাঁচতে গেলে বাবার ব্যবসায়ে যোগ দেয়া ছাড়া অন্য উপায় খোলা নেই আমার সামনে!' বলে চেকখানা ছিঁড়ে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল ফিলিপ।

'এতদিন মেলামেশা করেও তুমি দেখছি আমায় চিনতে পারো নি, ফিলিপ চৌহান,' বলে চেকটা নিয়ে তার সামনেই ছিঁড়ে কুটিকুটি করলাম, 'আমি তোমার টাকা চাইনা, কারণ আমার পেটের সন্তানকে জেনেশুনে কখনোই ডাক্তার দিয়ে খুন করাব না!'

'তাহলে কি করবে শুনি?'

'আমি তোমার অফিসে ঘর, তোমার ওপরওয়ালার সঙ্গে দেখা করে জানাব ভালবাসার নামে কত বড় সর্বনাশ আমার করেছো, তারপর পুলিশে খবর দেব। দেখব তুমি কিভাবে আমায় বাধা দাও! আমার আগে আরও কত নিরপরাধের সর্বনাশ করেছো কে জানে, হয়ত ভবিষ্যতে আরও করবে। আমি তাই সবার সামনে তোমার আসল চেহারা ফাঁস করে দেব। তোমার এমন শিক্ষা দেব যা চিরকাল মনে থাকবে।" আমার মাথার ভেতর তখন আগুন জ্বলছে, পরিণতির কথা একবারও মনে আসে নি।

'সে সুযোগ তোমায় আমি দেব না, গৌরি।' বলে আচমকা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ফিলিপ, দু'হতে শক্ত করে গলা টিপে ধরল। আমার দম বন্ধ হয়ে এল, খানিক বাদে ছটফট করতে করতে মারা গেলাম।'

'বলো! বলো! প্রবল উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠলেন আফজল বেগ, 'তারপর কি হল খুলে বলো, গৌরি! তোমার লাশ শয়তানটা লুকোল কোথায়?'

'বলছি, সাব,' গৌরির প্রেতাত্মা বলতে লাগল, 'আমি মারা যেতে ফিলিপ কিছুক্ষণ আমার লাশের দিকে একভাবে তাকিয়ে রইল, তারপর একটা খালি বস্তায় পুরে বেশি রাতে নিয়ে এল এই বাড়িতেই। সদর দরজার তালার চাবি থাকত আমার হাত ব্যাগে তা জানত সে। সেই চাবি দিয়ে দরজা খুলে আমার লাশ নিয়ে এ বাড়িতে ঢুকল ফিলিপ। বাথরুমের বাইরে যে একফালি জমি আছে, সেখানকার মাটি খুঁড়ে বস্তা সমেত আমার লাশ পুঁতে মাটি চাপা দিল সে। এর কিছুদিন বাদে সত্যিই এখানকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে সে ফিরে গেল বোম্বেতে। নিজে'ত বাঁচল। কিন্তু আমার আত্মার শান্তি হল না। প্রতিশোধ নেবার জ্বালায় আজও আমি পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি, সাব। আপনি আমার বাবার বয়সী পুলিশ অফিসার, আপনার কাছে আমি বিচার চাইছি। অন্যায় ফিলিপ চৌহান আমার সঙ্গে করেছে, আপনি তার প্রতিবিধান করুন। তাকে ধরে এমন সাজা দিন যাতে আর কেউ কোনও নিরপরাধ মেয়ের এমন ক্ষতি করার সাহস না পায়!' বলতে বলতে কেঁদে ফেলল গৌরির প্রেতাত্মা।

'কথা দিচ্ছি আমি যথাসাধ্য করব,' আফজল বেগ পেনসিল এগিয়ে দিলেন, 'তোমার বিবৃতি আমি লিখে নিয়েছি, এর নিচে তুমি নিজের নাম সই করো।' অবাক হয়ে দেখলেন অদৃশ্য হাতের মুঠোয় সেই পেনসিল কাগজের ওপর খসখস করে নাম সই করল, গৌরি দেবী।

'আমি এখানকার ল্যানসডাউন মিশনারি গার্লস স্কুলে কাজ করাতম সাব,' গৌরির প্রেতাত্মা বলল, 'ওখানে খোঁজ করলে আমার স্বাক্ষরের নমুনা পাবেন। ভবিষ্যতে দরকার হলে সেই স্বাক্ষরের সঙ্গে এই সই মিলিয়ে নিতে পারেন।

'এটা খুব ভাল বুদ্ধি বাতলেছো,' স্কুলের নামটা লিখে নিয়ে আফজল বেগ বললেন, 'ফিলিপ চৌহান কি এখনও বোম্বেতেই আছে?'

'হ্যাঁ সাব, বাবা মারা যাবার পরে তাঁর যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি, ব্যবসা সবকিছুর মালিকানা এসেছে তার হাতে। সে এখন কোটি কোটি টাকার মালিক।'

'ফিলিপ চৌহানের এখনকার ঠিকানা তুমি জানো?'

'জানি সাব আমি লিখে দিচ্ছি।' বলার সঙ্গে সঙ্গে পেনসিল দিয়ে কাগজে ঠিকানা লিখে দিল গৌরির প্রেতাত্মা।

আই বি অফিসার আফজল বেগ কিন্তু থেমে বইলেন না। পরদিন স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাংলোর বাথরুমের লাগোয়া একফালি জমি খোঁড়ার ব্যবস্থা করলেন। অল্প খানিকটা খুঁড়তেই বস্তাবন্দি যুবতীয় গলিত লাশের হদিশ মিলল, সেই লাশ পোস্ট মর্টেম করে জানা গেল গলা টিপে দমবন্ধ করে তার মৃত্যু ঘটানো হয়েছিল। সেই গলিত লাশের জরায়ুতে একটি মৃত ভ্রূণও পাওয়া গেল। এরপর সেই পোস্ট মর্টেম রিপোর্টকে এফ আই আর হিসেবে গ্রহণ করে আদালতে খুনেব মামলা দায়ের করলেন আফজল বেগ। গৌরির প্রেতাত্মার সই করা বিবৃতি আদালতে পেশ করলেন তিনি, ভারতীয় সংবিধান ও কোরাণ ছুঁয়ে জানালেন বিবৃতির প্রত্যেকটি কথা সত্যিই। ল্যানসডাউন গার্লস স্কুলে গিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে খোঁজখবর নিয়ে আফজল বেগ জানতে পারলেন বছর পনেরো আগে গৌরি দেবী নামে একটি মেয়ে স্কুলের অফিসে সত্যিই কাজ কবত। আচমকা সে নিখোঁজ হয়েছিল, তার সম্পর্কে কেউ খোঁজ খবর নেয়নি। স্কুলের খাতাপত্র ঘেঁটে গৌরির পুরোনো স্বাক্ষর জোগাড় করলেন আফজল বেগ, বিবৃতির নিচে তার সই-এর সঙ্গে তা মিলে গেল। এরপরে আফজল বেগ এলেন স্থানীয় স্বাস্থ্য দপ্তরে। সেখানকার পুরোনো কর্মচারি ফিলিপ চৌহানের বোম্বের ঠিকানা জোগাড় করতেও তাঁকে বেগ পেতে হল না। গৌরির মা গুলাবি আগেই মাবা গিয়েছিল। তার বাড়িতেও আফজল বেগ স্থানীয় পুলিশের সহায়তার খানাতল্লাশি চালালেন। খানাতল্লাশির চালিযে ফিলিপের বাবা অ্যালবার্ট চৌহানের লেখা একটি চিঠি তাঁর হাতে এল। চিঠিতে উল্লেখ করা ছিল গুলাবি দেবীর দাবি অনুযায়ী ত্রিশহাজার টাকার একটি চেক তিনি আলাদাভাবে তাঁকে পাঠিয়েছেন রেজিস্ট্রি ডাকযোগে। সেটা হাতে এলে গুলাবি দেবী যেন নিজের মেয়ের সঙ্গে তাঁর ছেলের সম্বন্ধ ভেঙ্গে দেন নযত জমা জল বহুদূর গড়াবে। ঐ চিঠিখানাও আদালতে সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসেবে আফজল বেগ পেশ করলেন এবং ফিলিপ চৌহানকে গ্রেপ্তার করার অনুমতি চাইলেন। আদালত অনুমতি দিলে তিনি নিজে গেলেন বোম্বেতে। আদালতের আদেশ দেখিয়ে সেখানকার পুলিশের সাহায্যে ফিলিপ চৌহানকে গ্রেপ্তার কবে ফিরে এলেন সিমলায়! আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়াল ফিলিপ চৌহান, গৌরি দেবীকে খুন করার অপরাধে পনেরো বছর বাদে তার বিরুদ্ধে মামলা শুরু হল।

এতবছর বাদে গৌরির প্রেতাত্মা এভাবে তার অন্যায়ের প্রতিশোদ নেবে তা ফিলিপ স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। আফজল বেগকে গৌরির প্রেতাত্মা বিবৃতি দিয়েছিল সেসব একে একে আদালতে তুলে ধরা হল। সরকারি উকিল বোম্বে থেকে ফিলিপের স্ত্রী ললিতাকেও নিয়ে এসে তুললেন আসামির কাঠগড়ায়। গৌরিকে সতীন হিসেবে মেনে নিতে গুলাবি দেবী যে পনেরো বছর আগে তাকে চিঠি লিখেছিল সাক্ষ্য দিতে গিয়ে সরকারি উকিলের জেরায় তা স্বীকার করল ললিতা চৌহান। বোম্বে পুলিশের সহায়তার ললিতার বাড়িতে থানাতল্লাশি চালিয়ে সে চিঠি পাওয়া গেল, ফিলিপের বাবার কাছে টাকা চেয়ে গুলাবি দেবী যে চিঠি লিখেছিল তাও পুলিশ খুঁজে পেল।

অতীতের সব সাক্ষ্যপ্রমাণ তার বিরুদ্ধে যেতে একসময় ভেঙ্গে পড়ল ফিলিপ, গোড়ায় অস্বীকার করলেও শেষকালে গৌরিকে খুন করার কথা স্বীকার করল সে।

জুরিদের সঙ্গে একমত হয়ে বিচারক ফিলিপ চৌহানকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। শুধু প্রেতাত্মার বিবৃতির ভিত্তিতে খুনের মামলা রুজু করা এবং আসামির যথোচিত শাস্তি বিধানের এই নজির গোটা দুনিয়ায় এক ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

ফিলিপ চৌহানের ফাঁসির পরে সিমলার সেই বাংলোর সব ভৌতিক উপদ্রব থেমে গিয়েছিল।

(বিশেষ কারণে পাত্রপাত্রীর আসল নাম পাল্টে দেয়া হয়েছে।)

কলকাতার ভূতের বাড়ি ঃ হেস্টিংস হাউস

রাত একটা থেকে দেড়টার ভেতর একটি ঘোড়ার গাড়িকে ঘন্টা বাজিয়ে ঢুকতে দেখা যায় জজকোর্টের লাগোয়া এই বাড়ির প্রাঙ্গনে। গাড়োয়ানের সহকারি নেমে এসে দরজা খুলে সসম্ভ্রমে একপাশে সরে দাঁড়ালে ভেতর থেকে সুশ্রী টাকমাথা যে কমবয়সী সাহেবকে নেমে আসতে দেখা যায় তিনি আর কেউ নন, সাবেক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অন্যতম কাউন্সিলর তথা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার একদা ভাগ্যবিধাতা মহামহিম ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রেতাত্মা। মহারাজ নন্দকুমাবের মত লোককে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে তিনি উচিত বা অনুচিত কাজ করেছিলেন কিনা সে বিতর্কে যাব না। কিন্তু অনেকেই জানে না এই দোর্দণ্ড প্রতাপ সাহেবটি কলকাতা পুলিশের জন্ম দিয়েছিলেন। হেস্টিংসের ভূত গাড়ি থেকে নেমে আজও সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে ওঠেন, তারপর খানিক বাদে আবার নেমে এসে অদৃশ্য হন। হেস্টিংসের ভূতের ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়াতে পারে না বলে বহুদিন ঐ বাড়িতে রাতের বেলা পাহারা দেবার উপযুক্ত নাইটগার্ড পাওয়া যায় নি।

জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যে গভীরভাবে ভূত বিশ্বাস করতেন এবং বাড়িতে পরলোক চর্চার আসর বসাতেন তা আজ আর রবীন্দ্রপ্রেয়সী বাঙালির জানতে বাকি নেই। কবিগুরুর দেহত্যাগের বেশ কিছুকাল পরেও তাঁর বংশজাত অনেকের বিদেহী আত্মাকে ঐ বাড়িতে আবির্ভূত হতে দেখা গেছে। এঁদের মধ্যে যার নাম মনে পড়ছে তিনি কবিগুরুর বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথ অর্থাৎ দ্বিজু ঠাকুরের ছেলে নীতিন্দ্রনাথ। কবিগুরুর আরেক প্রিয় ভাইপো শিল্পচার্য অবনীন্দ্রনাথ একবার গুরুতর অসুস্থ হন, সেইসময় তাঁর মায়ের বিদেহী আত্মা আবির্ভূত হয়েছিলন এবং অসুস্থ চেলেকে সেবা করে সুস্থ করে তোলেন একথা অনেকের মুখে শোনা যায়।

অল ইণ্ডিয়া রেডিওর পুরোনো বাড়ি

আজকের আকাশবাণী ভবন তখনও গড়ে ওঠেনি, অল ইণ্ডিয়া রেডিও-র অফিস সে সময় এক নম্বর গারস্টিন প্লেসে। সেখানে একসময় গানের প্রোগ্রাম করেছেন এমন অনেক জনপ্রিয়

শিল্পী বেঁচে আছেন। রেডিও অফিসের পুরোনো বাড়িতে ভূত আছে একথা তাঁদের অনেকের মুখে শোনা যায়। তবে তাঁদের বেশির ভাগই সাহেব ভূত। বেঁচে থাকতে যারা ছিলেন নিয়মিত যন্ত্রশিল্পী। মৃত্যুর পরেও তাঁরা সুরের জগতের মায়া কাটাতে পারেন নি তাই কোনও 'লাইভ' প্রোগ্রাম ঐ বাড়ির পুরোনো স্টুডিওতে রেকর্ড করার পর্ব শেষ হবার পরে তাঁরা সুরসৃষ্টিতে মেতে উঠতেন। বেঁচে থাকতে যে বাজনা আজীবন বাজিয়ে গেছেন সেই বাজনার গৎ আচমকা সেখানে বেজে উঠত। শুধু কানে শোনা নয়, এসব সাহেব বাজিয়ের প্রেতাত্মাদের স্টুডিও বসে তন্ময় হয়ে বাজাতে দেখেন এমন লোক এখনও কলকাতায় বেঁচে আছেন।